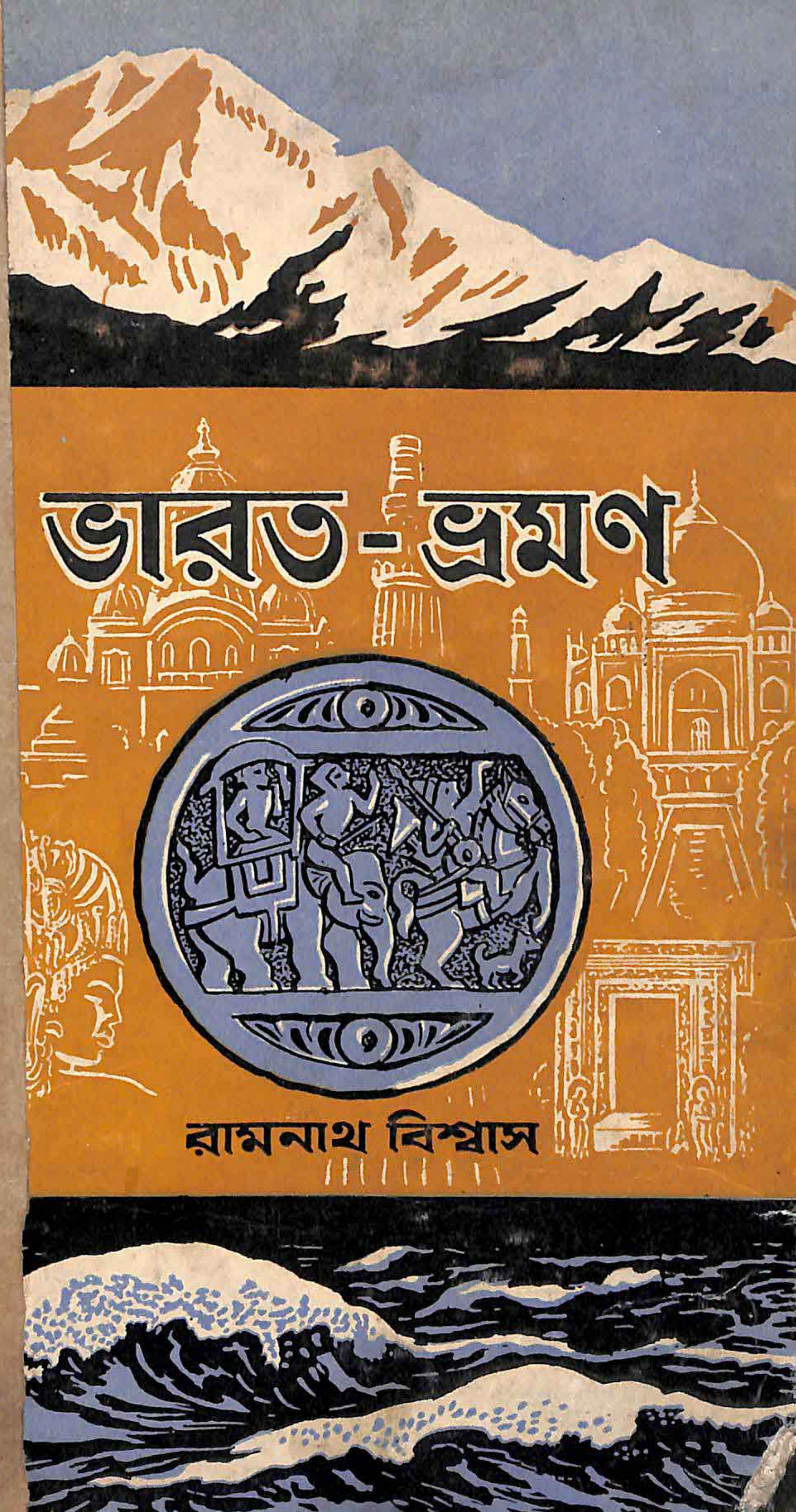

ভারত-ভ্রমণ
রামনাথ বিশ্বাস

ভারত-ভ্রমণ

রামনাথ বিশ্বাস

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

নূতন সংস্করণ :
ডিসেম্বর : ১৯৬৪

প্রচ্ছদমুদ্রণ :
মোহন প্রেস
২ করিস চার্চ লেন
কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস
১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা ৬

দাম : ৮·০০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রন্থকারের পরিচয়	৭
মণিপুর	১৫
[পেলেল, ইম্ফল, মাউ, কোহিমা]	
দিমাপুর হইতে সদিয়া	৪৫
আসাম ঃ এক	৫২
আসাম ঃ দুই	৫৯
[তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, জোড়হাট]	
আসাম ঃ তিন	৬৮
[নওগাঁ, কামরূপ-কামাখ্যা, গৌহাটি]	
শিলং	৮০
ঢাকার পথে	৮৯
ঢাকা	৯৩
নারায়ণগঞ্জ	১০৮
জামালপুর	১১০
জয়দেবপুর	১১৩
রাজসাহী	১১৪
মুর্শিদাবাদ	১১৬
বহরমপুর	১১৯
কৃষ্ণনগর	১২০
নবদ্বীপ	১২২
পার্বতীপুর	১২৪
বালুরঘাট	১৩৩
কুচবিহারের পথে	১৩৫
কুচবিহার	১৪০

বিষয়			পৃষ্ঠা
পার্বত্য অঞ্চল	...	...	১৪৩
[শিলিগুড়ি, কার্শিয়াং, ঘুম্, দারজিলিং]			
কলিকাতার পথে	...	...	১৪৯
কলিকাতা	...	...	১৫২
শ্রীরামপুর	...	...	১৬২
চুঁচুড়া	...	...	১৬৩
বর্ধমান	...	...	১৬৭
আসানসোল	...	...	১৭৪
ধানবাদ	...	...	১৭৭
বিদায় ধানবাদ !	...	...	১৮৩
[অপূর্ব অভিজ্ঞতা, স্বামী শঙ্করানন্দ]			
পরেশনাথ	...	...	১৯১
বাগ্‌দা	...	...	১৯৫
হাজারীবাগ	....	...	১৯৮
গয়ার পথে	...	...	২০০
গয়া	...	...	২০২
পাটনা	...	...	২১০
কাশীধামের পথে	...	...	২১৫
কাশীধাম বা বারাণসী	...	...	২১৮
এলাহাবাদ	...	...	২২৯
কানপুর	...	...	২৩৩
লক্ষ্ণৌ	...	...	২৩৫
কাল্‌পী	...	...	২৩৮
আগ্রা	...	...	২৪০
দিল্লীর দিকে	...	...	২৪৩
মথুরা-বৃন্দাবন	...	...	২৪৪

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা
মুরাদাবাদ	...	...	২৪৯
দিল্লী	...	...	২৫২
পাণিপথ	...	...	২৫৯
জলন্ধর	...	...	২৬৪
অমৃতসহর	...	...	২৬৬
লাহোর	...	...	২৭০
লাহোরের পথে	...	...	২৭৭
গুজরানওয়ালা	...	...	২৭৮
ওয়াজিরাবাদ	...	...	২৮০
গুজরাত, ঝিলাম	....	...	২৮১
গুজরখাঁন—রাওলপিণ্ডি	...	...	২৮৭
তক্ষশীলা ও নিকটবর্তী স্থান	...	...	২৯৪
[হরাপ্পা, হাসান আব্দেল, আটক, নৌসেরা]			

ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের পরিচয়

পৃথিবীর মানুষ একে অন্যের পরিচয় গ্রহণ করে, জানতে চায় তার পরিচিতি ; কিন্তু পৃথিবীর পরিচিতি জানতে চায় ক'জনা ? যাঁরা তা চান, ভ্রমণের নেশা তাঁদের পাগল করে তোলে। রামনাথ বিশ্বাস ছিলেন তাঁদেরই একজন।

তাঁর ভ্রমণের নেশা ও বিশ্বকে জানার অপরিসীম আগ্রহ ছিল বরাবরই। দেশভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীদের জীবনযাত্রা এবং ধনী-গরীবের বৈষম্য তিনি দেখেছেন বহু দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি লিখেছেন তাদের বিচিত্র জীবনকথা সহজ ও সরল ভাষায়। অকপট স্পষ্টবক্তা হিসাবে তিনি মুগ্ধ করেছেন দেশের লোককে। নানাবিধ দুঃখ, দুর্দশা, অপমান ও অবহেলা তাঁর চলার পথে যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল, তার বিনিময়ে তিনি লাভ করেছিলেন প্রচুর সম্মান ও অজস্র প্রশংসা। কিন্তু রামনাথ বিশ্বাস তার কাঙাল ছিলেন না, বৈচিত্র্যময় জীবনই ছিল তাঁর কাম্য।

শ্রীহট্ট জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম বানিয়াচঙ্গ। লোকবসতি চল্লিশ হাজারের উপরে। সেই গ্রামের বিখ্যাত কাত্যায়ন-বংশে বাংলা ১৩০০ সালের ২৩শে পৌষ তারিখে রামনাথ বিশ্বাসের জন্ম হয়। পিতা স্বর্গত বিরজানাথ বিশ্বাস ছিলেন একজন সরকারী কর্মচারী ; কিন্তু সরকারী কর্মচারী হলেও বিরজানাথ প্রকৃত তেজস্বী ও স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। একবার শুধু বিদেশী ইউনিফর্ম পরে কাজ করতে হবে শুনে তখনই সেই কাজে তিনি ইস্তফা দেন।

তাঁর তেজস্বিতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা পুত্র রামনাথও পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে জননী গুণময়ী দেবীর নম্র স্বভাব ও পরকে আপন করার শক্তিও তিনি প্রভূতভাবে লাভ করেছিলেন। রামনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃপানাথ ছিলেন একজন হৃদয়বান খ্যাতনামা চিকিৎসক।

কৈশোরে উপর্যুপরি টাইফয়েড ও কলেরায় আক্রান্ত হওয়ায়

রামনাথের পড়াশুনা আরম্ভ করতে দেরী হয়। তাহলেও পরবর্তী কালে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পড়াশুনায় উন্নতিলাভ করেন। অতি অল্প বয়সেই স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনায় তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। তারপর তাঁর অন্যতম সহকর্মী বানিয়াচঙ্গের সুশীলকুমার সেনের সহযোগিতায় তিনি অনুশীলন সমিতির উন্নতি-সাধন করেন।

সেই সময়ে সরকার তাঁর গ্রামে পতিত জমির উপর একটা কর ধার্য করেন। সরকারের এই ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে এক প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। রামনাথ এই খাজনা ও মূল খাজনা বন্ধ করার জন্য এক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং কৃতকার্য হন। তার ফলে আজও সে গ্রামের লোক সেই অতীত নিয়মানুযায়ী খাজনা দেয় না।

কখনও কোন অন্যায় সহ্য করা বা কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া ছিল রামনাথের স্বভাববিরুদ্ধ। খাজনার গোলমাল মিটে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁদের স্কুলে যে ছাত্র-ধর্মঘট হয়, তিনি তাঁরও নেতৃত্ব করেছিলেন। কয়েকটি ছাত্রের প্রতি কর্তৃপক্ষের অন্যায় জুলুমবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সেই ধর্মঘট পরিচালিত হয়েছিল। রামনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের অবিচলিত দৃঢ়তায় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অবশেষে তাঁদের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হন।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরই বাঙ্গালী পল্টন ও লেবারকোর বা শ্রমিক সংগ্রহ করা হয় এবং তিনি তাতে যোগদান করেন। কিন্তু কাজ আরম্ভ করার কয়েকমাস পরেই তাঁর শরীরের ওজন অতি অস্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পাওয়ায় তিনি 'ডিস্‌চার্জড্' হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। কিছুদিন বিশ্রাম করার পর তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯১৭ সালের শেষভাগে কমিটির অফিসার ও শিক্ষিত কেরানী-রূপে যোগদান করেন।

সেখানেই তাঁর পল্টনী জীবনের আরম্ভ এবং সেই সূত্রে ক্রমে

তিনি বৃটিশ বেলুচিস্থান হয়ে আফগানিস্থানে ও পারস্যে গমন করেন। এই দেশভ্রমণই তাঁর পরবর্তী জীবনে বিশ্বভ্রমণের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

১৯২৪ সালে তাঁর পল্টনী জীবনের অবসান হলে তিনি কেরানীর কাজ নিয়ে মালয়ে যান। এইভাবে স্থান হতে স্থানান্তরে গমনাগমনের ফলে তখনই বিশ্বভ্রমণের নেশা তাঁর অদম্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অতি আকস্মিক ভাবে এই সময় এক বাধা উপস্থিত হয়। তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র কেদারনাথ অতি অকালে এই সময় পরলোকে চলে গেল। নিদারুণ শোকে রামনাথ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং সংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্যের উদয় হয়।

মালয়ে অবস্থানকালে সিঙ্গাপুরের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সরকার জানতে পারেন। তার ফলে ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে তিনি তাঁর চাকুরী হতে অপসৃত হন। ঈশ্বর যেন তাঁকে মুক্তির সন্ধান দিয়ে দিলেন! এর অব্যবহিত পরে—১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই তারিখে রামনাথ একটি মাত্র সাইকেল সম্বল করে তাঁর বহু-আকাঙ্ক্ষিত পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। তদবধি নিত্য-নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধান ও জননী বসুন্ধরার পরিচয়লাভ এই হলো তাঁর কামনার বস্তু।

রামনাথ তাঁর বিশ্বভ্রমণের প্রথম পর্বে সমগ্র মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে কোরিয়াতে যান ও তারপর যান জাপানে। এই ভ্রমণকালে মালয়ের দুর্গম অরণ্যাঞ্চলে তাঁকে বহু বিষধর সর্প ও হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কোন বিপদকেই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। চীন দেশে তাঁর সাহস নির্ণয়ের জন্য এক বিচিত্র পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যার পর চীনের কোন এক অখ্যাত গ্রামে তিনি উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর রাত্রিবাসের জন্য একটি খোলাঘরে বাঁশের মাচার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি রাত্রিতে যথারীতি শুয়ে

পড়েন। সকাল বেলা দেখতে পান যে, মাচার এক ধার নুয়ে পড়েছে। কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পান, অনেকগুলি সারিবদ্ধ মৃতদেহের ওপর তাঁর বিছানা করে দেওয়া হয়েছে। (চীনের কোন কোন অঞ্চলে মৃতদেহগুলি পূর্ণিমা প্রভৃতি কোন কোন বিশেষ তিথিতে সৎকার করার জন্য জড় করে রাখা হয়।)

রামনাথ অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেন, এক বিরাট কৌতূহলী জনতার ভীড় হয়েছে তিনি বেঁচে আছেন কিনা দেখবার জন্য! এই অভাবনীয় ঘটনায় তাঁর সাহস আরও বেড়ে গেল এবং তিনি নূতন উদ্যমে আবার যাত্রা করলেন।

প্রথম পর্বে জাপানভ্রমণ শেষ করে তিনি যান ক্যানাডায়। ক্যানাডা সরকার তাঁকে উনত্রিশ দিন এক জেলে আট্‌কে রেখে দেয়। তারপর জাপানী জাহাজ 'হিয়েমারুতে' তুলে দিয়ে বলে দেয়, 'যথা ইচ্ছা তথা যাও।'

জাপানে এসে চারদিন থাকার পর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সাংহাই বন্দরে। সেখান থেকে তিনি প্রথমে যান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, তারপর বালীদ্বীপে। বালীদ্বীপে মাসখানেক অতিবাহিত করে তিনি যাভা দ্বীপের সুরবায়াতে যান; কিন্তু সেখান থেকে ডাচ্ সরকার তাঁকে বন্দী করে পাঠিয়ে দেয় সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুরে মাস দুই বিশ্রাম করার পর তিনি আবার পৃথিবীভ্রমণে বের হন।

বিশ্বভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বে তিনি সিঙ্গাপুর থেকে রেলযোগে পিনাং পৌঁছেন এবং সেখান থেকে জাহাজে করে ব্রহ্মদেশের মারগুই বন্দরে উপস্থিত হন। সমগ্র ব্রহ্মদেশে মাস ছয়েক পরিভ্রমণ করে দুর্গম পার্বত্য পথে তিনি মণিপুরে আসেন। তারপর তিনি অবিভক্ত সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করেন। সেই বিচিত্র কাহিনী এই 'ভারত-ভ্রমণ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে; আর বলা প্রয়োজন যে, এই 'ভারত-ভ্রমণ গ্রন্থই তাঁর জীবনের সর্বশেষ গ্রন্থ।

ভারত-পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে তিনি পর্যটন করেন—আফগানিস্থান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও লেবানন। তারপর তুরস্ক হয়ে তিনি ইউরোপে আসেন।

ইউরোপের অন্তর্গত বুলগেরিয়া, যুগশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স হয়ে তিনি ইংলণ্ডে উপনীত হন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি আর কোথাও অগ্রসর হতে পারেন নাই। কাজেই তাঁকে বোম্বাই বন্দরে ভারতে ফিরে আসতে হয়। প্রায় ছ'মাস এখানে পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার পর তিনি আবার পৃথিবীভ্রমণে যাত্রা করেন।

ভ্রমণের তৃতীয় পর্বে বোম্বাই থেকে জাহাজে করে তিনি পাড়ি দেন আফ্রিকা মহাদেশে—মোম্বাসায়। তারপর কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিয়াকা, ন্যাসাল্যাণ্ড, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়া ভ্রমণ সমাপ্ত করে তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান। সেখানে ট্রান্সভাল, নাটাল, কেপ প্রভিন্স প্রভৃতি ভ্রমণ করে জাহাজ-যোগে আবার লণ্ডনে ফিরে যান ও সেখান থেকে যান আমেরিকায়। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ শেষ করে আবার তিনি ক্যানাডায় পৌঁছেন। সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কলকাতায় পৌঁছেন। এই পর্বে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল তাঁর পরিভ্রমণ করা হয়।

ভ্রমণকালে বিভিন্ন দেশ ও জাতি সম্পর্কে তিনি যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, যে বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ তিনি লক্ষ্য করেছেন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সে-সব বিচার-বিবেচনা করেছেন। তারপর পূর্ণ মানবতার মাধ্যমে তিনি তা সমগ্রভাবে পাঠক-সমাজে উপস্থাপিত করেছেন।

তিনি মহাচীন ও এশিয়ার কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছিলেন, তা পরবর্তী কালে যথাযথ-ভাবে কার্যকরী হয়। এতে তাঁর দূরদৃষ্টির গভীরতা সম্বন্ধে সম্যক

অবহিত হওয়া যায়। তিনি ধনীর চেয়ে গরীবদের সঙ্গেই মিশতেন বেশি। তিনি ভালবাসতেন তাদের এবং এই ভালবাসার বদলেই জেনেছেন তাদের আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি ও তাদের সমাজ-জীবনের অনেক কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার। তিনি তাঁর স্বভাব-সারল্যে দেশবাসীদের মুগ্ধ করেছেন। তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই তাঁকে ঠকিয়েছে বটে, কিন্তু রামনাথের উদার দৃষ্টিভঙ্গী তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সাধারণ জীবনে তাঁর দ্বার উন্মুক্ত ছিল সর্বসাধারণের জন্য; কোন অভুক্ত, আশ্রয় বা সাহায্যপ্রার্থী কোনদিন তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে যায়নি। অভুক্ত কেউ তাঁর কাছে গেলে তিনি পাঠিয়ে দিতেন হোটেলে, যেখানে তাঁর নামে শুধু অভুক্তদের খাওয়াবার জন্যই এক পৃথক একাউন্ট ছিল।

ব্যবহারিক জীবনেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি সারা জীবন অবিবাহিত থেকে মুখ্যত জনসেবাই করে গেছেন। শেষের দিকে রক্তচাপ-বৃদ্ধিজনিত রোগে তাঁকে অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়। পারিবারিক জীবনে তাঁর উপর নানা দিক থেকে আঘাতের পর আঘাত এসেছিল। পর পর দু'জন ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু-শোক তাঁর পক্ষে এত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যে, তার মাত্র কুড়িদিন পরে—১৯৫৫ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে তিনিও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর এক মহান্ পর্যটকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্ধপথেই সমাপ্ত হয়ে গেল।

আমরা স্কট্, ম্যালোরী, নান্‌সেন, কুকের নাম বুকে নিয়ে গৌরব বোধ করে থাকি; কিন্তু আমাদের অতি নিজস্ব রামনাথ বিশ্বাসের সন্ধান রাখি ক'জনা? কোনো সম্রাট্ বা রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার তাঁর সাহায্যে নিয়োজিত হয় নাই; অগণিত যান-বাহন বা লোক-জনের সাহায্য তিনি লাভ করেন নাই; শুধু একটি দ্বিচক্র-যান—

সাইকেল মাত্র অবলম্বন করে তিনি সমগ্র পৃথিবী যেভাবে পর্যটন করে এসেছিলেন—তা একটু চিন্তা করলেই বিশ্ব-জনতার উন্নত শির তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

কলিকাতা
জানুয়ারী : ১৯৫৮

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

মণিপুর

১

জাহাজ হতে নেমে আমাদের গন্তব্য স্থান ছিল পেলেল (Palel), মাত্র উনত্রিশ মাইল দূর। ভাবছিলাম এক দিনেই এই দূরত্বটুকু চলে যেতে পারব। সকালেই রওয়ানা হলাম।

এক-পেয়ে পাহাড়ী পথ। আমার হাতে শুধু সাইকেল। ভাবছিলাম এটাকে ঘাড়ে করে নিতে আর কত কি পরিশ্রম হবে! আমার সামনে দিয়ে সকলেই চলে গেল, আমিই পেছনে পড়ে রইলাম। হাঁকডাক না দিয়ে একাই চলছিলাম। সবাই অদৃশ্য হয়েছিল। শৈলেন ছিল সকলের সম্মুখে। ঘণ্টাখানেক চলার পর দেখলাম শৈলেন দাঁড়িয়ে আছে, আর তার কাছেই উত্তর-প্রদেশের মুসলমান লোকটি চিন্তিত মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমাকে দেখামাত্র সে বললে, "আপনি আগে যান, তবুও বয়সে বড়! পথ যেন ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে!"

নিরক্ষর উত্তর-প্রদেশের দাড়িওয়ালা মুসলমানটিকে সর্বপ্রথমেই মৌলানা সাহেব বলে সম্বোধন করলাম। দুষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বাক্যের সমাবেশ! পাঞ্জাবে পাচককে হিন্দুরা পণ্ডিত বলে। আমি যদি লোকটিকে পাচকের কাজে নিযুক্ত করি এবং মৌলানা সাহেব সম্বোধন করি তবে দোষ হবে কি? এরই মধ্যে বুঝতে পেরেছিলাম উনত্রিশ মাইল পথ চলতে বেশ বেগ পেতে হবে।

মৌলানা সাহেবের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি তাকে বললাম, "মৌলানা সাহেব, জলের সন্ধান পেলেই বিশ্রাম করব; তুমি কিন্তু ভাই সঙ্গে যে মোরগ আছে তার ঝোল ও দুটি ভাত করে দেবে।"

"আলবৎ! এটাই ত আমার কাজ", এই বলেই মৌলানা সাহেব আমার দিকে তাকালো।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলকে পেছনে রেখে আমিই আগে আগে চললাম। ডাইনে উঁচু পাহাড়, আর বাঁয়ে গভীর খাদ। পড়লেই মৃত্যু। সকলকে সাবধান করে দিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম।

পথটা ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছিল। সামান্য সূর্যালোক মণিমুক্তার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। অতি কষ্টে দশটার সময় একটু প্রশস্ত স্থানে বিশ্রাম করতে বসলাম। চার-পাঁচজনের ভাত ধরে সে রকম একটা ডেক্‌চি কিনেছিলাম। মৌলানা সাহেব মোরগ কাটতে চলে গেল।

সঙ্গী পর্যটকদের মধ্যে একজনের বয়স বেশি ছিল, তাকে চাউল ধুয়ে আনতে বললাম। শৈলেন কাঠ জোগাড় করল এবং আগুন জ্বেলে চায়ের জল বসিয়ে দিল। পোস্ট-বিভাগের লোকেরা শুধু জল-ভাত খেল। আমাদের রান্না হতে এগারটা বাজল। ঠিক বারটার সময় রওয়ানা হলাম। অষ্টম মাইল পেরিয়ে ডাক-বাংলোয় রাত কাটাব মনস্থ করলাম। কোথাও বিশ্রাম না করে চারটা পর্যন্ত চলার পর শৈলেন ফিরে এসে বলল—"পথে ভয়ের কারণ আছে।"

ডাক-বিভাগের লোকেরা আর অগ্রসর হতে নিষেধ করল। সকলের কথা উপেক্ষা করে মন্থর গতিতে সাইকেলটা ঘাড়ে করে চললাম। সাইকেলই আমার একমাত্র অস্ত্র। বাঘ আসুক, ভালুক আসুক, সর্বপ্রথমেই সাইকেলটা আক্রমণকারীর উপর ফেলতে পারব এই ছিল ভরসা। শৈলেন পেছনেই ছিল, সে বললে, "খাটাসের গন্ধ পাচ্ছেন না?" 'খাটাস' বাঘের সঙ্গেই থাকে। আমার কিন্তু একটুও ভয় হল না। সন্ধ্যার পূর্বেই আট মাইল পথ অতিক্রম করে ডাক-বাংলোয় পৌঁছলাম।

ডাক-বাংলো মানে একখানা কুঁড়ে ঘর। দশ হাত লম্বা এবং ছয় হাত চওড়া। সামনে সামান্য একটু সমতল ভূমি। ঘরটা খুঁটির

উপরে তৈরী, নীচটা কমের পক্ষে পাঁচ-ছয় হাত ফাঁকা। মই বেয়ে উপরে উঠতে হয়। হিংস্র জীব যাতে লাফিয়ে পড়ে গৃহবাসীর নাগাল না পায়, এরূপভাবে ঘর তৈরী করা হয়েছে।

রাত আটটার পূর্বেই সকলের খাওয়া হয়ে গেল। চারখানা বাইসাইকেল ঘরের নীচেই থাকল। ঘরে পাহারার বন্দোবস্ত করলাম। তু'ঘণ্টা করে তু'জন সজাগ থাকবে এই হল আমাদের বন্দোবস্ত।

রাত তিনটার সময় আমার পাহারা পড়ল। সঙ্গের লোকটিকে শুতে বললাম, সে শুল না। ধব্‌ধবে চন্দ্রালোকে বনের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঘর থেকে নেমে পরিষ্কার স্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। পূবদিকে মেঘমালা ছিল আমাদের নীচের লেভেলে; সেজন্য মেঘের চলাফেরা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমরা যেন পৃথিবী হতে অনেক উঁচুতে রয়েছি! কিছুক্ষণ পর সহসা একটি স্ত্রীলোকের কান্না শুনতে পেলাম।

স্ত্রীলোকের কান্না কি বাসের ঘর্ষণ, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। স্ত্রীলোকের কান্না পুরুষকে যেমন উত্তেজিত করতে পারে, তেমন আর কিছুতেই উত্তেজিত করতে পারে না। উত্তেজিত হয়েছিলাম বটে কিন্তু কোন্‌দিকে যেতে হবে? যদি নাগারা আক্রমণ করে তবে অস্ত্র কোথায়? একা কি করে যাই? নানা চিন্তায় ঘুমের নেশা কেটে গিয়েছিল। সকাল পর্যন্ত কাউকে ডাকিনি। ভোর হবার পর চা তৈরী করে খেয়ে সকলকে ডাকলাম। না খেয়ে রওয়ানা হওয়া মহা অন্যায়। মৌলানা সাহেব রান্না করল, আমরা পথ ধরলাম; উদ্দেশ্য, আট মাইল দূরের ডাক-বাংলোতে রাত কাটানো।

পথের কষ্ট ক্রমেই যেন বেড়ে চলল! বাঁ দিকের খাড়ি গভীর হতে চলছিল। আমরা উপরে উঠছিলাম, কাজেই খাড়ি গভীর হবে, ইহা স্বাভাবিক। ঘন বাঁশবনের ভেতর দিয়ে চলছিলাম।

কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছিল না। ঘণ্টায় আধ মাইলের বেশি চলতে পারছিলাম না। এক-পেয়ে পথ ক্রমেই ছোট হতে সুরু করলো। আমরা ক্রমেই খাড়ির পাশ দিয়ে চলছিলাম। কাউকে কোন উপদেশ দিতে হল না। সকলেই হাতে প্রাণ রেখে পা টিপে টিপে চলছিল। অবশেষে ঘণ্টায় আধ মাইল যাওয়াও সম্ভব হচ্ছিল না। অন্য দু'জন পর্যটক নিয়েই মহাবিপদে পড়েছিলাম। এদের পাহাড়ে চড়া অভ্যাস না থাকায় পা কাঁপছিল। ভয়ে তারা ঈশ্বরের নাম করছিল।

প্রায় দু'ঘণ্টা পথ চলে আমরা এই বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে একটু ফাঁকা জায়গায় বসে পড়লাম। মৌলানা সাহেব 'ইয়া আল্লা' বলেই মাটিতে শুয়ে পড়ল। কতক্ষণ পর দু'হাত তুলে আল্লার করুণা ভিক্ষা করল। বোধহয় লজ্জায় অন্য দু'জন মুসলমান পর্যটক, মৌলানার মত কিছুই করল না বটে কিন্তু এরূপ পথে চলার জন্য দুঃখিত হল। তাদের পক্ষে ফিরে যাওয়ারও কোন উপায় ছিল না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সকলেই চাঙ্গা হল, শুধু আমিই শুয়ে রইলাম। শেষ রাত্রে না ঘুমানোর জন্য শরীর দুর্বল হয়েছিল। রান্না হয়ে গেলে খেয়ে আবার রওয়ানা হলাম। কিন্তু কোনমতেই আশা করতে পারিনে যে ডাক-বাংলোয় সন্ধ্যার পূর্বেই পৌঁছে যাব। সুখের বিষয়, পথটা বেশ চওড়া ; তাই সকলেই তাড়াতাড়ি চলতে পারছিলাম। একজন পর্যটক সাইকেল চালাতে সক্ষম হয়েছিল। সে ভাবছিল, সেদিনই পেলেল পৌঁছনো যাবে। কতক্ষণ যেয়ে সে ফিরে এসে সংবাদ দিলে, পথে নাগা দাঁড়িয়ে আছে। নাগার ভয়ে সকলেই ভীত। আমাকেই এগিয়ে যেতে হল। নাগা ছিল সজ্জন। তার বাড়ি কাছেই ছিল। সকলকে পথে রেখে তার বাড়িতে গেলাম। দেখলাম, একটি জংলী শূয়র সবেমাত্র হত্যা করে এনেছে। জংলীশূয়র আমার

প্রিয় খাদ্য, কিন্তু সঙ্গে মুসলমান থাকায় মাংস কিনলাম না, চাউল কিনে আনলাম। শূয়রের কথা কারো কাছে বললাম না।

নাগার শরীর ধূসর বর্ণের। নাক মুখ চোখ, এমন কি পায়ের গোছা পর্যন্ত মোংগল ধরণের। নাগা যে খাঁটি ব্রাউন মোংগলিয়ান তাতে আর সন্দেহ থাকল না। বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাউন মোংগলিয়ানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। শুধু কয়েকটি জেলাতে ব্রাউন মোংগলিয়ানের সংখ্যা কম, নতুবা সর্বত্রই সংখ্যায় অনেক। নাগার শরীরের গঠন নিয়েই অনেকক্ষণ চিন্তা করতে হল। এতে সময় কাটছিল। পথ চলার কষ্ট মোটেই হচ্ছিল না। দ্বিপ্রহরে আমরা বিশ্রাম এবং আহার করার জন্য একটি বেশ পরিষ্কার স্থানে বসলাম। নিকটেই জল পাওয়ায় রান্নার কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

আবার পথ চলতে আরম্ভ করলাম। এবার পথ অনেকটা সঙ্গীন হতে লাগল। অবশেষে একপেয়ে পথ এত ছোট হল যে কিছুটা চলে একস্থানে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। উদ্দেশ্য, সাথীরা এই দুর্গম পথ অতিক্রম করার পর আমি রওয়ানা হব। সঙ্গের মুটিয়া হতে পোষ্টাফিসের কেরাণী পর্যন্ত চলে যাবার পর অতি সন্তর্পণে সামান্য পথটুকু অতিক্রম করলাম। মনে হল, একেই বলে ভ্রমণ! অন্য কেউ হলে এই পথের কথা অন্তত পাঁচ পৃষ্ঠায় পূর্ণ করত। ফেনিয়ে লেখার অভ্যাস নেই, সেজন্যেই সংক্ষেপে কথার শেষ করতে হল।

আরও একটু চলে সবাই দাঁড়াল এবং পাশের উন্মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইল। কাছে গিয়ে দেখি, এমন দৃশ্য যে-কোনও মানুষের মন আকর্ষণ করে। সামনেই একটি সমুদ্র। সমুদ্রের জলরাশি ক্রমাগত সরছে, নূতন জল সমুদ্র পূরণ করছে। এসব হল মেঘের খেলা। আমরা তখন প্রায় চার হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছি। নীচে চিন্দুইন-ভ্যালী। চিন্দুইন-ভ্যালী মেঘাচ্ছন্ন। বোধহয় বৃষ্টি

হচ্ছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সময় নষ্ট করা চলে না।

[illegible]দুনে পোনার নাচ নামে এক রকম নৃত্যের প্রচলন আছে। নৃত্যকারী, মণিপুরী বালিকা। তারা ফুলের এবং আকাশের ভাসমান মেঘমালা নিয়েই বাংলাভাষায় গান রচনা করে এবং সেই গান বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে গেয়ে বেড়ায়। সবাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা দিয়ে পদ্যের ছন্দ পূরণ করত। পোনার নৃত্য একদিন মাত্র দেখেছিলাম। এমন সুন্দর করে প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনা করা যেতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। আজ সেই প্রাকৃতিক বর্ণনার গানের সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবিকল মিল রয়েছে দেখে পোনার গান যাঁরা তৈরী করেছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য হলাম। আনাম রাজ্যের থান্‌হোয়া নামক স্থানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের যে দৃশ্য দেখা যায়, এখানেও প্রায় সেরূপ দৃশ্যই আবহমানকাল দেখতে পাওয়া যাবে।

আমরা যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথে দু'খানা মোটর গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দৌলতে তেমন প্রশস্ত রাস্তা তৈরী হয়েছে। হবে না কেন? বৃটিশের দরকার হয়েছিল তারা পথ তৈরী করেছে, কিন্তু এই পথ আর বন্ধ হবার উপায় নাই। এই পথ বড়ই দুর্গম। ষ্টিলওয়েল রোড যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, খাইবার পাসের মধ্য দিয়ে যে পথ এসেছে—সেই পথ যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এই পথও তেমনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বর্তমানের ইণ্ডিয়া সরকার এই পথের প্রতি সুবিচার করছেন না মোটেই। পথটা বন্ধ হয়ে গেলেই যেন ভাল হয়! কিন্তু সেদিন চলে গেছে বন্ধু! লক্ষ আমেরিকান চেষ্টা করুক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নতির পথে বাধা দিতে পারবে না। একটি পদাঘাতে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ লোপ হবে। টামো-পেলেল রোড অক্ষয় হয়ে থাকবে। আজ বৃটিশ

সাম্রাজ্যবাদীরা কোথায়? এক মাইল, তুই মাইল নয়; সাত শত মাইল প্রশস্ত গভীর জঙ্গল দিয়ে ভারতের পূর্বদিক সমাচ্ছন্ন। বেহার প্রদেশের মত তিনটা উর্বর প্রদেশ খালি পড়ে আছে, মানুষ সেই এলাকাতে নাই বললেই চলে। অথচ সর্বত্র খাদ্যের অভাব হবে বলে মিথ্যাবাদীরাই চিৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। টামো-পেলেল রোডের প্রতি অবহেলা করে লাভ হবে না।

সকলের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা হয়ে যাবার পর আমরা আবার চললাম। পথের তু'দিকে সাপের চলাফেরা অনুভব হল। মনে হল, কোথাও হাজার হাজার সাপ লুকিয়ে আছে। শৈলেনই সর্বপ্রথম টের পায়, আমাকে সাপের কথা বলেনি। কারণ, সে জানত, এই জীবকে যতটুকু ঘৃণা করি ততটুকু ভয় করি। সাপের ঔষধ লাঠি, আমাদের কারো কাছে লাঠি ছিল না। সাপ-বসতিপূর্ণ স্থান অতিক্রম করে এলাম বটে কিন্তু সাপ দেখতে পেলাম না। পরের দিন তুটো সাপকে শৈলেন মেরেছিল। তুটো সাপই ছিল বিষাক্ত।

ঠিক বারটার সময় আমরা রান্নার আয়োজন করলাম। সকলের খাওয়া হয়ে গেলে উঠব ভাবছি এমনি সময় একটি ঈগল পাখী গা ঝাড়া দেওয়াতে সকলেই ভীত হয়ে পড়ল। ঈগল পাখীর অনেক নাম আছে। এ অঞ্চলের লোক ঈগল পাখীকে 'হাওয়াল' বলে। এই পাখী ঘণ্টায় ঘণ্টায় শব্দ করে। যারা ঘড়ি ব্যবহার করে না, তারা হাওয়ালের ডাক শুনে ঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারে।

সামান্য বিষয়ে সকলকেই চমকে উঠতে দেখে অনেক কথাই চিন্তা করতে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এসব বোধহয় বনের রীতি। চমকে উঠতে হয় সব কিছুতেই। বনে ভ্রমণ করা অভ্যাস ছিল বলেই চমকে উঠলাম না। ঈগল পাখীর ভয় চলে যাবার পর আবার পথ চলতে আরম্ভ করলাম। এবার পথটা খুবই খাড়ি। সাইকেল ঘাড়ে করে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল। সকলেই আস্তে

চলছিল। এমন পথে সাইকেল হাতে করে অথবা ঘাড়ে করে নেওয়া বড়ই বিপজ্জনক। ঘণ্টা তুই চেষ্টা করার পর আমরা একটু সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম। সকলেই পরিশ্রান্ত। আট মাইল পথ, আর কয় ঘণ্টা চললে বিশ্রাম-গৃহের দেখা পাওয়া যাবে ডাকবাহকদের সকলেই তা জিজ্ঞাসা করছিল। অনেকেই টেলিগ্রাফ-লাইনের থাম গুনত, কিন্তু এসব গোনার কোনো মানে হয় না। সবগুলি থাম আমাদের পাশ দিয়ে ছিল না। কোনও থাম পর্বতের উপরে আর কোনও থাম পথের পাশে। সকলেই সব সময় থাম গুনতে পারছিল না। পথের কাঠিন্য থামের কথা ভুলিয়ে দিচ্ছিল। অনেকেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিল, কিন্তু ফিরে যাবার উপায় ছিল না, সেজন্য অধৈর্য হওয়ারও কোনো মানে ছিল না।

সন্ধ্যা হয়ে গেল, ডাক-বাংলোর দেখা পেলাম না। মনে হল যেন ঘরটা ফেলে এসেছি! এটা আমার ভুল। পথের পাশেই ডাক-বাংলো থাকে, ফেলে আসার উপায় ছিল না। রাত আটটার সময় আমাদের সেদিনের ভ্রমণ শেষ হল। ক্রমাগত তের ঘণ্টা হেঁটে আট মাইল পথ উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলাম। রান্না করার মত শক্তি কারও ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে চায়ের জল বসিয়ে দিলাম। চা হয়ে গেলে সকলকেই চা খেতে ডাকলাম। চা খেয়ে অনেকের শক্তি ফিরে এল। সকলেই রান্নায় মন দিল।

স্নান করে বিশ্রাম করছিলাম। চাঁদের আলো বনের সর্বত্র নূতন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করছিল। অভাব ছিল না, চাঁদের আলোতে বনের সৌন্দর্য অনুভব করার মত মন ছিল। খেয়ে ঘুমোলাম না। সাথীদের উৎসাহিত করার জন্য বলছিলাম, "আর তু'দিন, তারপরই আমরা পেলেল পৌঁছব, সেখান থেকে মণিপুর মাত্র আটাশ মাইল। সুন্দর পথে চলতে একটুও কষ্ট হবে না।

যেদিন পেলেল পৌঁছব সেদিনই ইম্ফল রওয়ানা হব।" এই রকমের কথা বলে অনেকের মনেই সাহস ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলাম। রাত্রের পাহারার জন্য কাউকে অনুরোধ করলাম না। দরজার সামনে শুয়ে রইলাম। অন্যান্য সকলেই ভেতরে শুল।

রাত বোধহয় একটা হবে। হঠাৎ একজন পর্যটক চিৎকার করে বললে, ঘরে ভূত আছে। কেউ ভূতের সন্ধান করল না। চন্দ্রের আলো ঘরে প্রবেশ করছিল এবং যেখানে আমাদের গাঠুরী রাখা হয়েছিল সেখানে চাঁদের আলো পড়ে মানুষের মত দেখাচ্ছিল। রাত নির্বিঘ্নে কাটল। সকাল হতেই নূতন শক্তি নিয়ে পুনরায় রওয়ানা হলাম। এদিকে পথ প্রশস্ত, সেজন্য খাড়িতে পড়ে যাবার ভয় ছিল না। নয় মাইল পথ চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কিন্তু তত কষ্টবোধ হচ্ছিল না।

আজকের ডাক-বাংলো বেশ বড়, চারিচালা একখানা বড় ঘর। মাটির মেঝে গোবর দিয়ে লেপা। দরজা ছিল না, দ্বারওয়ানও ছিল না। জল কাছেই ছিল। সকলেই আনন্দের সঙ্গে রান্না করল। পোষ্ট-অফিসের কর্মচারীরা এখান থেকে ভিন্ন পথ ধরল। যাবার সময় বলে গেল, রাতে যেন সাবধানে থাকি। পাহারার বন্দোবস্ত হল।

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ শৈলেন ডাকল। উঠে দেখি, একটি নাগা স্ত্রীলোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রীলোকটিকে অন্ধকার হতে প্রাঙ্গণে আসতে বললাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না গভীর রাতে স্ত্রীলোক কেন বেরিয়ে আসছে! তার যে কোনও বদ মতলব ছিল, তাও বুঝতে পারলাম না। অবশেষে চলে যেতে বললাম। স্ত্রীলোকটি চলে গেল বটে কিন্তু ঘুম হল না।

চতুর্থ দিন সকালবেলা রান্না করা হল না। ঠিক হল, দুপুরে রান্না করা হবে। সকাল হতে হেঁটে চার মাইল পথ চলার পর আর চলতে পারলাম না, তখন বেলা একটা। সকলেই রান্নাতে

নিযুক্ত হল। রান্না হয়ে গেলে আমরা বেশিক্ষণ বিশ্রামের জন্য কাটাতে পারলাম না। আজই আমরা পেলেল পৌঁছতে পারব মনে করলাম। সম্ভবও হল। বাইসাইকেল চালাতে পারলাম। তিনটার পূর্বেই আমরা পেলেল পৌঁছলাম।

পেলেল সমতল ভূমিতে অবস্থিত। মস্ত বড় গ্রাম। গ্রামের যা কিছু দেখার সবই দেখলাম! একটি বাড়ির সামনে বিশ্রাম করার সময় একটি সাপ চলে যেতে দেখে শৈলেন সাপকে আক্রমণ করে হত্যা করল। সাপটাকে দূরে ফেলে দিতে বললাম।

গ্রামেরা বাসিন্দা মণিপুরী। মণিপুরী এবং অন্যান্য মোংগল জাতের মধ্যে পার্থক্য অনেক। এদের রক্ত শতকরা ত্রিশ ভাগ টিবটো-বর্মন এবং সত্তর ভাগ ব্রাউন মোংগলিয়ান। তাই বেঁটে এবং তেমন ফরসা নয়; কিন্তু যখনই মণিপুরী রক্ত অ-মোংগলিয়ান রক্তের সঙ্গে মেশে তখনই নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য দেখা যায়। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলাতে মণিপুরী রক্তের সংমিশ্রণে যাদের শরীরের গঠন, তাদের শরীর খুবই সুন্দর। নাক, মুখ, চুল, শরীরের গঠন, অনেক সময় নরডিকদের হার মানিয়ে দেয়। আমার অনেক আত্মীয় আছেন যাদের সঙ্গে মণিপুরী রক্তের সংমিশ্রণ থাকায় শরীরের গঠন ইন্দো-এরিয়ানদের চেয়েও ভাল দেখায়।

মণিপুরীরা পুরাতন জাত। মহাভারতে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। মহাভারতের সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন, মহাভারতের যুগ ছিল চার হতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। তখন হয়ত চিন্দুইন-ভ্যালী জলাবৃত ছিল। হয়ত মণিপুরীরা জলপথে টামো হয়ে ইম্ফলে পৌঁছেছিল। ইম্ফল শব্দের সঙ্গে হাইনান্ দ্বীপের শব্দের মিল রয়েছে কিন্তু কতকগুলি কারণে সেই মিলনের কোনও মূল্য থাকে না। এখনই সেকথা বলছি।

পেলেলে থাকা হল না। বিদায়ের পূর্বে কতকগুলি পুরাতন বিল্ডিং দেখলাম। বিল্ডিং সবই চতুষ্কোণ এবং গড়নে ক্ষুদ্রাকৃতি। আনাম ধরণে ঘর তৈরী। আনাম জাতটাই হল চতুষ্কোণী। ত্রিভুজ তাদের অভিধানে নাই। আমরা যেমন মন্দিরের উপর দিকটা সরু ও উঁচু করি, আনাম জাত সেরূপ করে না। মেঝে যেমন ফ্ল্যাট, ছাদও তেমনি ফ্ল্যাট। পুরাতন বিল্ডিংগুলির ইঁট পরীক্ষা করে দেখলাম, এসব দু'শত বৎসরের বেশি পুরাতন নয়।

আমরা রওয়ানা হলাম পেলেল ছেড়ে। রাত ন'টার সময় এক মণিপুরী মুসলমান গ্রামে পোঁছলাম। গ্রামবাসী আমাদের আমন্ত্রণ করল, আমরা নিমন্ত্রণের আয়োজন করলাম। মাংস-ভাতের বন্দোবস্ত হল। রাত কাটাব মনে করে সকলেই শুয়ে রইলাম কিন্তু চোখের পাতা বুজতে না পেরে পথ চলাই সকলে পছন্দ করল। আমরা চারজন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইকেল চালালাম।

তখন রাত তিনটা। করতাল, খোল ও মন্দিরা বাজানোর শব্দ শুনছিলাম কিন্তু গান শুনতে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমরা কীর্ত্তনের আসরে পোঁছলাম। সকলেই আমাদের সমাদর করে বসাল। মন দিয়ে গান শুনছিলাম। পুরুষের গান—একজনও স্ত্রীলোক ছিল না। গানের সুর অনুধাবন করাই ছিল আমার লক্ষ্য। এত জোরে এরা গান গাইতে চেষ্টা করছিল যে, স্বর সরু হয়ে অবশেষে অশ্রুত হয়ে আসছিল। সবগুলি গানেই কালোয়াতী ছিল। কালোয়াতী নিশ্চয়ই ইন্দো-এরিয়ান অথবা দ্রাবিড়। কালোয়াতীতে দ্রাবিড় স্বভাব ফুটে উঠছিল। এরা কোথা হতে দ্রাবিড়ের কালোয়াতী পেল, তাই ছিল সমস্যার বিষয়। গান গাইছিল বাংলায়; বাংলা গান যদি তামিল সুরে গাওয়া যায় তবে অনেকটা অশ্রাব্য বলেই মনে হয়।

যতগুলি গায়ক উপস্থিত ছিল তাদের দেখে প্রশান্ত মহাসাগরীয়

শ্রেণীর লোক বলেই মনে হয়েছিল। গান বাংলা, সুর তামিল, পরিচ্ছদ খাঁটি আসামী বা বাঙ্গালী। গানের আসরে বসেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, মণিপুরীরা যে জাতের লোকই হউক না কেন, যে সভ্যতা তারা পালন করে, তা হল মিশ্র সভ্যতা।

মণিপুরের পেলেলের কাছে মুসলমান গ্রাম দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। এরা কেমন করে মুসলমান হল জানতে ইচ্ছা হয়েছিল। কি করে গ্রামের লোক মুসলমান হয়েছিল কেউ বলতে পারল না, কিন্তু এদের সামাজিক অবস্থা দেখে দুঃখ হয়েছিল। ভারতীয় মুসলমানেরা হিন্দুর প্রতি যে কেন বীতশ্রদ্ধ? সম্ভবতঃ সামাজিকতার অত্যাচারই তার একমাত্র কারণ।

কীর্তন সমাপন দেখে আমরা আবার রওয়ানা হলাম। এবার কোথাও না থেমে একেবারে ইম্ফল পৌঁছলাম।

২

মণিপুরের পেলেল গ্রামে ইসলাম মতবাদের প্রচলন দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। অবশ্য এসম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা না করলে চলবে না; কিন্তু পেলেল পেরিয়ে এসে সামনে যে ভূখণ্ড দেখতে পেলাম তা দেখে আরও আশ্চর্য অনুভব করেছিলাম। চলার সময় চারজন একত্রে চলছিলাম সেজন্য ভূমিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করার অথবা মাটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করার সময় ছিল না। মনে হচ্ছিল, পেলেল হতে আরম্ভ করে ইম্ফল পর্যন্ত ভূভাগ যে কোনও সময় তলিয়ে যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা চূনা পাথরের পচা মাটি মাত্র। "ইভারপোরেট্" করে মাটি হয়েছে। ইম্ফলে পৌঁছে মনে হ'ল, শহরটা মোটেই পুরাতন নয়, অতি আধুনিক অর্থাৎ এই শহর চার-পাঁচ শত বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল।

মহাভারত কাব্যগ্রন্থ। এটাকে মাইথোলজীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কাব্যগ্রন্থে অনেক সময় বাস্তবের গন্ধ থাকে। মহাভারতের

যুগে আর্যরা এদিকে এসেছিল, সে কথা মহাভারতে বলা হয়েছে। আমার মনে হয়, মহাভারতের যুগে বর্তমান ইম্ফল ছিল হয় জলমগ্ন, নয় তো খাড়ি। পেলেল ছিল তখনকার দিনের আবাদী ভূমি। মহাভারতের যুগে পেলেলের সৌন্দর্য ছিল অসীম। একদিকে বর্তমান চিন্দুইন-ভ্যালী তখন নিশ্চয়ই জলমগ্ন ছিল, অন্যদিকে ছিল ইম্ফল-ভ্যালী যা হয়ত জলমগ্ন, নয়ত খাড়ি ছিল। এমন স্থানের বাসিন্দা বর্তমান মণিপুরীরা ছিল না, ছিল কাছাড়ী অর্থাৎ দ্রাবিড় জাতের লোক। কাছাড়ী, কোচ্ এবং ত্রিপুরার রাজবংশ সবাই ছিলেন দ্রাবিড়। সেজন্য রাক্ষস আখ্যা দেওয়া হয়। আর্যরা সব সময়ই কালো লোককে হীন মনে করত। ইম্ফলে পৌঁছে দ্রাবিড় জাতের লোকের অন্বেষণে ছিলাম। কয়েকটি গ্রামে দ্রাবিড়ের দেখাও পেয়েছিলাম। যাদের দেখা পেয়েছিলাম, তাদের কারো উপাধি বর্মন অথবা দেববর্মন ছিল না। দেব, দত্ত, দে এবং মুসলমানী নাম—এসবই দেখেছি। মুসলমানদের মধ্যে হু'একজন প্রকৃত দ্রাবিড় দেখেছি ; কিন্তু তাদের ভাষা এতই সংস্কৃত-বহুল ছিল যে, তাদের হয় বাঙ্গালী, নয় আসামের বাসিন্দা ব্যতিরেকে আর কিছুই বলা চলে না।

খুব বেশি রাজদ্রোহী ছিলাম বলে ভারতীয় কোনও রাজার সঙ্গে দেখা করতাম না ; কিন্তু মণিপুরের রাজবংশের রক্তের পরিচয় পাওয়া চাই, সে উদ্দেশ্যে রাজবংশের কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা করি। সর্বত্র একাকার অর্থাৎ মিশ্র রক্ত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। নিরাশার কারণ ছিল না। একটি মণিপুরী বিদ্যালয়ে যেয়ে অনেক ছাত্র দেখতে পেলাম যারা বাস্তবিকই টিকেন্দ্রজিতের বংশধর বলে দাবি করতে পারে। টিবটো-বর্মনদের যুদ্ধপ্রথা "পলায়ন এবং হয়রান করা" নিয়ম প্রচলন ছিল। টিবটো-বর্মনরা শুধু নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করার সময় শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করত। উত্তরবাসী এবং দক্ষিণবাসীরা স্বদেশী

বিদেশী নির্বিশেষে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করত এবং এখনও করে। চেঙ্গিস্ খাঁন্, কুবলাই খাঁন্ এবং অন্যান্য মোংগল জাতের লোকের মধ্যে আক্রমণ-প্রথা দেখা যায় কিন্তু সে আক্রমণকে আক্রমণ বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে তা লুঠতরাজের সামিল। প্রিমিটিভ, মোংগল ও পিগ্‌মী, হটেন্‌টটদের মধ্যেই গরিলা-যুদ্ধের প্রচলন ছিল। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ও মনে রাখা দরকার। কৃষ্টি মিনিটে পরিবর্তন হয়।

মণিপুরীদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম, এমন কি ইসলাম ধর্মেরও প্রচলন আছে এবং এই দুটি ধর্মই বিশেষভাবে এদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যান্য মোংগল জাত অবতারবাদকে যেমন পায়ের জুতোর মত মনে করে, এরা ঠিক তেমন মনে করতে পারে না, এমন কি সেরূপ চিন্তাও করতে পারে না। এর সঠিক কারণ হল দ্রাবিড় রক্তের সঙ্গে মোংগল রক্তের সংমিশ্রণ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে দ্রাবিড় সভ্যতাই বুঝতে হবে। আপাতত আর্য এবং আর্য সভ্যতা নিয়ে সমালোচনার অবসর নাই।

মণিপুরের অন্তস্থলে রায় সাহেব পরিচালিত একটি হোষ্টেল ছিল। তাতেই চারজন আশ্রয় নিয়েছিলাম। প্রথমত দৈনিক আড়াই টাকা হারে চার্জ করা হয়েছিল, পরে আমাদের পরিচয় পেয়ে সবটাই মকুব করেছিলেন। থাকা-খাওয়ার খরচ দেবার মত আমাদের সংস্থান ছিল। কিছুই দেওয়া হয়নি বলে শৈলেন দুঃখিত হয়েছিল, আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। উভয়ের মানসিক বৃত্তি এক ছিল না। তখনকার দিনে যারা সরকারী উপাধি পেতেন, তাঁরা সবাই যে দেশের উপকার অথবা মঙ্গল করে উপাধি পেতেন তা নয়, অমঙ্গল এবং অনাচার করেই বেশির ভাগ লোক উপাধির অধিকারী হতেন। অত্যাচারী এবং দুষ্টকে ধনতন্ত্রবাদী

ভালবাসে, কমিউনিষ্টরা দয়া করে। এদের কারও মতের সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না, সেজন্য নির্বিকার ছিলাম।

মণিপুরীদের মধ্যে চিঁড়ে, আখের গুড় ও দইএর প্রচলন অত্যধিক। কলার প্রচলনও বেশ রয়েছে। শাকসব্জীর মধ্যে মণিপুরী "লাইপাতা" বিখ্যাত। মণিপুরী লাইপাতা পশ্চিমবঙ্গে অল্পই জন্মায়। অনেকে মণিপুরী লাইএর নিকৃষ্ট শ্রেণীর লাই-পাতাকে শস্যপাতা বলে। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ইত্যাদি অঞ্চলের কোথাও লাইপাতার গাছ দেখেছি বলে মনে হয় না। অতএব লাইপাতা, লাইপাতারূপেই রইলো। অভিধান খুঁজে প্রতিশব্দ বের করতে হলে সময় নষ্ট করা হবে মাত্র।

লাইপাতার প্রচলন মোংগলিয়ান জাত-অধ্যুষিত প্রায় সকল দেশেই রয়েছে। সাধারণতঃ মণিপুরীরা ভাতের সঙ্গে মূলা, লাই-পাতা এবং এই শ্রেণীর সব্জী বেশি ব্যবহার করে। বাজারে মোরগ, হাঁস, পায়রা, শুকনো মাছ, দুধ, দই, এসবও পাওয়া যায়। বৈষ্ণবরা শুকনো মাছ খায়; হাঁস, পায়রা, মোরগ এসব খায় না। মণিপুরীদের মধ্যে সকলেই বৈষ্ণব নয়। অবতারবাদে অবিশ্বাসীর সংখ্যাও বেশ রয়েছে; তারাই হাঁস, পায়রা, মোরগ এবং আরও অনেক রকমের মাংস খায়। একজন অবতারবাদে অবিশ্বাসীর সঙ্গে দ্বিতীয় দিনই দেখা হয়। তার হাতে ছিল একটি মোরগ। আমি ভেবেছিলাম লোকটি মুসলমান। সে পরিষ্কার বাংলা বলছিল। সে বলছিল, "তোমাদের দেশে যতগুলি অবতার আছে, আমাদের দেশে তাদের কারো প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি দেখানো হয় না।"

লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম—সে এমনই একটি স্থানের লোক যেখানে মণিপুরের প্রতাপান্বিত টিকেন্দ্রজিতেরও প্রাধান্য বিস্তার লাভ ঘটেনি। সেই এলাকা এতই পর্বতসঙ্কুল যে, শুধু নাগা ও মণিপুরের আদিম অধিবাসীরা বাস করে।

জাপভো পর্বতের পূর্বদিকে এমন কতকগুলি গ্রাম আছে যেখানে হয়ত তখন পর্যন্ত বৃটিশ প্রাধান্য মোটেই প্রসারিত হয়নি। বর্তমানে নিশ্চয়ই সেখানে সভ্যতার প্রসারণ হয়েছে, সেই সঙ্গে অবতারবাদেরও হয়ত বিস্তার লাভ ঘটেছে।

সেই লোকটির কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম। সে বৈষ্ণব অথবা মুসলমান মণিপুরীদের গোলাম বলত। তুঃখের সহিত বলছি, খাস্ ইম্ফলেও কয়েকজন মুসলমান মণিপুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারা সকলেই সমাজ হতে বহিষ্কৃত হয়েছিল; কাজেই এতই হিন্দুবিদ্বেষী যে, যে-কোনও প্রকারে হিন্দুর ক্ষতি করতে পারলে আনন্দ পেত। অবশ্যি এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাদের চিন্তার মোড় ফেরাবার ভার মণিপুরী প্রগতিশীলদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। মণিপুরে তখন সবেমাত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রবেশ করেছিল। ভারতের কোথাও প্রগতিশীল চিন্তার নাম-গন্ধও ছিল না, অথচ মণিপুরে কি করে উন্নত চিন্তার গন্ধ পৌঁছল, বাস্তবিকই তা চিন্তার বিষয়। চিন্তা করতে হবে না। কয়েকজন বাঙ্গালী মণিপুরে প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিস্তার করছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে পরে বলা হবে।

"ব্লাডি হেল্! মণিপুরী নৃত্য আবার কি রে? শুয়ে থাক্। এসব দেখে সময় নষ্ট করা কোন মতেই তোমার পক্ষে ভাল দেখায় না", এই বলে শৈলেনকে শাসিয়েছিলাম, কিন্তু জানতাম না সে আমার পথে চলছিল না। দেশ স্বাধীন করা যার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাকে মণিপুরী নৃত্য দেখতে হয়ই। আমিও গেলাম সেই নৃত্য দেখতে। এখানে খাঁটি কীর্তন হচ্ছিল। তুটি মণিপুরী পুরুষ নবদ্বীপের অনুকরণে খোল বাজাচ্ছিল। তাদের লম্ফ-ঝম্প বেশ লাগছিল, তিনটি যুবতী গান গাইছিল। তাদের গানের সুর-তাল যদিও কীর্তনের ছিল, তবুও মাঝে মাঝে "রে" উচ্চারণ বেশি হওয়ায় শুধু আমার মনেই বোধহয় চিন্তার সৃষ্টি করছিল। বাউল,

কীর্তন, রামপ্রসাদী, এই তিনটি সুর বাঙ্গালীর নিজস্ব। এই তিনটি সুরের ভুলভ্রান্তি অনুভব করার শক্তি আমার ছিল।

আসরে ছিলেন একজন বাঙ্গালী ধনী ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে ভাবের আবেগে তিনি ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। ফুলের পরিবর্তে যদি নোট ছড়াতেন তবে বোধহয় ভাল হ'ত; কিন্তু নোট ছড়াবার মত উচ্চ ও উদার মন তাঁর ছিল না। তাঁর সঙ্গে যে কয়েকজন মোসাহেব ছিল না, এমন কথা বলা চলে না। মণিপুরী মেয়েরা বেশ প্রশস্ত স্থানে গান গাইছিল, সেজন্য সকলেই গান উপভোগ করতে পারছিল। চিৎকার করা, উচ্চ কথা বলা, মণিপুরীদের অভ্যাস ছিল না। তাছাড়া,—"পান নিয়ে আয়, তামাক নিয়ে আয়", এই ধরণের হাঁক-ডাকও ছিল না।

বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছা হল না, শৈলেন ও অন্য দুইজন পর্যটককে রেখে চলে এলাম। এরা কোন্ সময় ফিরে এসেছিল জানি না কিন্তু ঘুম হতে একই সঙ্গে উঠেছিল।

বৃটিশ রেসিডেন্টের অফিসে যাওয়া হয়নি। সেখানে যেতে আদেশ বা অনুরোধ করা হয়েছিল। এর মাঝে একজন বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি মণিপুরী নৃত্য শিখতে ইম্ফল গিয়েছিলেন। পাঠান মুল্লুক দেখে এসেছেন ও পাঠানদের গান শিখে এসেছেন বলছিলেন। আমি পাঠান মুল্লুকে ছয় বৎসর কাটিয়েছিলাম, সে কথা তাঁকে বললাম না। উপযাচক হয়ে তিনি পাঠান নৃত্য দেখালেন এবং একটি গানও গাইলেন। গান গেয়েছিলেন "তুরুক সুরে", সে খবর তাঁর ছিল না। তাঁর ভুল ধরতে ইচ্ছা হল না; মেকী দেশে সবই মেকী চলছে। যে যে রকমে পার দু পয়সা রোজগার কর, তাতে ক্ষতি কি?

পাঠানদের গানের সঙ্গে বাঙ্গালী এবং গুজরাতী সুরের যত মিল আছে, শব্দের দিক দিয়ে আরও বেশি মিল রয়েছে। আসামী ভাষার সঙ্গে গুজরাতীর বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। "শ" অক্ষরকে

আসামী, গুজরাতী এবং পাঠানরা "হ" উচ্চারণ করে। এসব আমি জানতাম কিন্তু জানা বিষয় নিয়ে বাহাদুরী করা অভ্যাস ছিল না, সেজন্য যুবককে পুনরায় পাঠান গ্রামে যেতে বললাম না। পাঠান দেশের কথা যখন বলব তখন পাঠানদের সঙ্গে শব্দের, গানের সুরের সমতা কেন হল, বলতে চেষ্টা করব।

রেসিডেণ্ট-অফিসে কয়েকজন পুলিশ-অফিসারও ছিলেন, তাঁরা সবাই আসামী। তাঁদের দুষ্ট বুদ্ধি ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। বড়ই সোজা প্রকৃতির লোক। তাঁরা যে সরকারী তাঁবেদার এবং পেটের ভাতের যোগাড়ের জন্য চাকরি নিয়েছেন, সে ধারণা বেশ জাগ্রত ছিল। আসামীদের মধ্যে দারিদ্র্য ছিল না। তা হলে এঁরা চাকরি করতে এসেছিলেন কেন? অভাব অনুভূতি হয়েছিল, কৃষ্টির মান উচ্চে উঠেছিল, সেইজন্যই সরকারী চাকরি করতে এসেছিলেন।

আফিসের বাঙ্গালী বাবুরা সেখানে শাসকরূপে গিয়েছিলেন। অনেকে নিজের বাসা-বাড়িতে বসেই কাজ করতেন যেন নিজের খাস-মহল! অবশ্য সবার উপরে "বৃটিশ সত্য" একথা খুব ভাল করেই জানতেন এবং মিনিটে মিনিটেই বোধহয় রাখতে হ'ত "সবার উপরে রেসিডেণ্ট" এবং সেই রেসিডেণ্ট বৃটেনেরই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতেন। এর পরেও বাবুদের ধমকা-ধমকি দেখলে মনে হ'ত যেন ভীমের পার্ট অভিনয় করছেন!

রেসিডেণ্ট-আফিসে যতগুলি বাঙ্গালী বাবু ছিলেন, তাঁরা সকলেই টেরারিষ্টদের কথাই চিন্তা করতেন কিন্তু একটিও টেরারিষ্ট দেখতে পেতেন না। মণিপুরের মত স্থানে টেরারিষ্ট যাবে কেন? তবুও ভয়, কি জানি টেরারিষ্ট তাদের চাকরি-বাকরি বুঝি খতম করে দেয়! এক অহেতুক কারণে সকলেই ভীত থাকতেন। আমাদের পেয়ে তাঁদের ভয় বেড়ে গিয়েছিল। অনেকের ধারণা হচ্ছিল, গুজরাতী ও বাঙ্গালীতে এবার মিলন হল। এই নিয়ে লম্বা-চওড়া

কেচ্ছা যে তৈরী হচ্ছিল তাতে সন্দেহ ছিল না। এসব হতে দূরে ছিলেন স্বয়ং রেসিডেন্ট সাহেব ও মণিপুরীরা। মণিপুরীরা ছিল মজুর এবং কৃষক, আর রেসিডেন্ট ছিলেন আর এক মজুর। তিনি মধ্যবিত্ত নন্, গ্রেট বৃটেনের কোথাও তাঁর নিজস্ব এক ইঞ্চি জমি ছিল না কিন্তু মনে মনে বড়লোক ; বাঙ্গালী বাবুরা সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত এবং কৃষ্টিতে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এদের মধ্যে টেরারিষ্ট-ভীতি থাকবে না ত কার থাকবে ? আমার তখন কৃষ্টি-জ্ঞান হয়েছিল। অতীতের ইতি যাকে বড় গলায় ঐতিহ্য বলা হয় এবং ভবিষ্যতে যদি এই রকমেই আমাদের জীবন চলতে থাকে তবে আমাদের জাত কালী-দুর্গার মত 'ঐতিহ্য' নাম দিয়ে এক দেবীর পূজা করবে এতে আমার কোনও সংশয় নাই।

এখন রেসিডেন্ট-আফিসের কথা বলছি। বাবুদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মানুষে মানুষে দেখা হলে একে অন্যকে যেরূপ ভাবে আপ্যায়ন করে, রেসিডেন্ট সেরূপ ব্যবহারই করেছিলেন। তাঁর ব্যবহারে বেশ আনন্দই হয়েছিল। তাঁকে এক সময় বললাম, "Why not build Tammu-Palel Road?" রেসিডেন্ট বললেন, "We don't need it." এর বেশি এ সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে আর কোনও কথাই হয়নি। রেসিডেন্ট হয়তো ভাবছিলেন, আমি বিদেশী। আমার আচার-ব্যবহার ওদের মত ছিল না। তিনি শুধু বলেছিলেন, "Now you feel it." এর মানে, বিদেশ দেখা যেন অন্যায় হয়েছে। কাজেই কষ্ট পেতে হবে।

তখন মনের গতি ছিল অন্যরূপ। জীবনে অনেক রুশিয়ানের সঙ্গে থেকেছি, খেয়েছি, এবং দেখেছি বিপ্লবী জীবন কাকে বলে। পলাতক রুশিয়ানদের কথা বলছি, মার্কসবাদী রুশিয়ানদের কথা বলছি না। মতবাদ বজায় রাখতে গিয়ে দেশত্যাগ করে

পালিয়ে আসা বড় সহজ নয়। তারপর সারা জীবন বিপ্লব করে হঠাৎ ধপাস্ করে পড়ে যাওয়া, তাও কম নয়। এসব ত দেখেছি এবং যাদের পতন হয়েছে, তাদের সঙ্গেও ছিলাম; বুঝতে পেরেছিলাম তাদের গলদ কোথায়? এরপরে আর পতনের কোনও কারণ ছিল না। মনে মনে আমি মধ্যবিত্ত, ক্রমে সেই মানসিক দুর্বলতাও চলে গিয়েছিল।

অনেকের ধারণা, গ্রেট বৃটেনে অথবা আমেরিকাতে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেশ রয়েছে। ইংলণ্ডের কোনও স্বনামখ্যাত লোক বলেছিলেন, "We have only one fool in every family." আমি সেই কথার প্রতিবাদ করে বলছি, বর্তমানে ইংলণ্ডে প্রত্যেক হাজার পরিবারে একটি করে গোমূর্খ থাকে কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে আমাদের দেশে প্রত্যেক পরিবারে সম্পত্তির অধিকারী মাত্রই এক-একটি গোমূর্খ। ইংলণ্ডের হাজার পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারও ভূমি-সম্পত্তি অথবা ব্যবসায়ী কোম্পানীর শেয়ারের ডিভিডেণ্ড বাবদ মাসিক, অথবা বার্ষিক কিছু পায় কি না সন্দেহ। অতএব গোমূর্খের সংখ্যাও কম।

মণিপুরীদের মধ্যে মধ্যবিত্ত নাই বললেই চলে। সরলতা, কর্মক্ষমতা, মজুরের সম্মান—এসব প্রায়ই লক্ষ্য করতাম। একটি ব্রাহ্মণকে চাষের জমিতে চাষ-কাজে নিযুক্ত দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছিলাম। ক্ষত্রিয় নিজের জমি নিজে চাষ করে, অন্যান্যদের কথা না বললেও চলে। মণিপুরী স্ত্রীলোক মাত্রই স্বাধীন। অবতারবাদ তাদের মাঝে হামলা করতে সক্ষম হয়নি। স্ত্রী-আচারের কাছে অবতারবাদ মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে অর্থাৎ হামলা করেও পরাজিত হয়েছে। মণিপুরী ভাষা সেজন্য প্রশংসার যোগ্য।

মণিপুরী ভাষা, আসামী তথা বাংলা অক্ষরে লিখিত হয়। আমাদের অক্ষরে মণিপুরী ভাষা লিখিত হয় দেখে খুশী হয়েছিলাম। এটা স্বাভাবিক এবং অজ্ঞানতার পরিচায়ক। আজ

যে জিনিসটাকে আমার অথবা আমাদের বলছি, একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় সেই জিনিসটা আমার অথবা আমাদের ছিল না। কোথাও থেকে কেউ এনেছিল অথবা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। যে বোঝা একদা বইতে কষ্টকর ছিল, সেই বোঝা বইতে আজ আনন্দ হয়। মজার বিষয় ত! অজ্ঞানতার মোহ কম নয়!

মণিপুরীদের মধ্যে পূর্বে তালাক-প্রথা ছিল। তবে মুসলমানী তালাক-প্রথা ছিল না অথবা বর্তমানেও নাই। উভয় পক্ষই তালাকের দিক দিয়ে সমান অধিকার রাখত। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তালাক-প্রথাকে আরও উন্নত করেছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণিজম্ তালাক-প্রথাকে খর্ব করেছে। বর্তমানে বোধহয় তালাক-প্রথার উচ্ছেদ হয়েছে। ব্রাহ্মণিজমের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলছিল দেখেছিলাম, তারপর বর্তমানে কতকগুলি পৌরাণিক গল্পের সবাক চিত্রের মারফতে ভারতের সর্বত্র "মিথ্" প্রচার হওয়ায় মণিপুর নিশ্চয়ই অধোগতির দিকে চলছে। শুনছিলাম, মণিপুরের মহারাজা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। এখন বাকি আছে চতুর্থ স্ত্রী গ্রহণ করা; অর্থাৎ দস্তুর মাফিক মহাম্মদী ধর্মের তৃতীয় স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন, বাকি রয়েছে চতুর্থ স্তরে ওঠা। চতুর্থ স্তরে উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না। বর্তমানে মণিপুর একজন চিফ্-কমিশনার দ্বারা শাসিত হয়। মণিপুরের রাজা শুধু নামেই রাজা আছেন, কাজে একজন খয়রাতভোগী মহামানব। মহামানব নিশ্চয়ই, নতুবা এমন খয়রাত ভোগ করার অধিকার সকলের থাকে না।

বৃটিশ আমলের রাজা, মহারাজা, নবাব, সুলতান সকলেই মহামানব। প্রকৃত পক্ষে মণিপুর ষ্টেট বৃটিশরাই চালাত। তাও আবার অল্প খরচে। বৃটিশের অধিকৃত ভারতে তখন একজন কেরাণীর মাইনে কমের পক্ষে ত্রিশ টাকা ছিল অথচ একজন মণিপুরী ম্যানেজার অথবা কালেক্টারের মাইনে আট টাকার

বেশি ছিল না। সেই মণিপুরী আই-সি-এস কি করে সংসারের খরচ চালাত, সকলেই জানতে চাইবেন। বাজারের তোলা হতে পরিবারের উপযুক্ত খাদ্য পেত, বস্ত্র পেত, তারপর পেত আট টাকা। এর পরে অভাব থাকে কোথায়? হাঁ, একটি অভাব সহজে পূরণ হ'ত না। মণিপুরীরা জীবনে একবার নবদ্বীপে না এলে নির্বাণের অধিকারী হয় না। সেজন্য চুরি-চামারি, ডাকাতি করেও মণিপুরীরা নবদ্বীপে আসা-যাওয়ার খরচ যোগাড় করত। এখন করে কিনা, অথবা নবদ্বীপে এসে 'হাজী' হবার প্রবৃত্তি আছে কিনা জানি না। না থাকারই সম্ভাবনা বেশি, কারণ এটা ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের শুধু অন্তর্গত নয়, সমস্ত মণিপুর জেলাটাই জাপানীরা দখল করেছিল। জাপানী আক্রমণে সাধারণ লোকের মানসিক উন্নতি হয়েছিল বলতে হবেই। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে অন্তত আর্টিফিশিয়েল ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে, বই পড়বার অধিকার আছে। ঢাকাতে তাও নাই; এইচ্. জি. ওয়েল্স-এর 'পৃথিবীর ইতিহাস' ঢাকার লোক পড়তে পারে না।

৩

ইম্ফল ছোট্ট শহর, দেখার মত কিছু ছিল না কিন্তু অনুভব করার মত অনেক কিছু ছিল। অনেকে এখানে এসে মস্ত বড় বড় বই লিখে ফেলেন, আমার পক্ষে বই লেখা সম্ভবপর হবে না, কারণ সেরূপ জ্ঞানচক্ষু আমার নাই। মণিপুরী জাতকে ভাল করে চিনবার মত সময়ও ছিল না। আমার সামনে মস্ত বড় দুনিয়া, মণিপুরে বসে থাকলে চলবে কেন?

সঙ্গের দুইজন গুজরাতী তৃতীয় দিন সকালবেলা মণিপুর পরিত্যাগ করলেন। আমরা দুজন রইলাম। দেশী ভাইদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেতেছিলাম। খেতে বসবার পূর্বেই চীন দেশের খাদ্য-সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হত। বাবুরা ভাবতেন

তাঁরা যা খান তাই হল সবচেয়ে উত্তম খাদ্য, অন্যান্য জাতের লোক কুখাদ্য খায়। তাঁরা মণিপুরী খাদ্যের প্রতিও কটাক্ষ করতে ছাড়তেন না। এঁদের কথা শুনে মনে মনে হাসতাম কিন্তু কিছু বলতাম না। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক এখনও মলমূত্র পরিষ্কার করতেও জানেন না, আচার-ব্যবহারে অনেক পেছনে রয়েছেন বুঝিয়ে বলতে লজ্জা করত। নিজের দোষ কেউ স্বীকার করতে চায় না, বিশেষ করে আমাদের দেশের লোক।

মণিপুরী ছাত্রেরা আমার অন্বেষণে ছিল কিন্তু আমি থাকতাম সাহেব-পাড়ায় অর্থাৎ বাঙ্গালী অফিশিয়েল কোয়ার্টারে অধিক সময়, সেজন্য তাদের সঙ্গে দেখা হত না। বোধহয় চতুর্থ দিন এক মণিপুরী স্কুল-মাষ্টার আমাকে পথে ধরে বললেন, "চলুন আমাদের স্কুলে, সেখানে চীন-অভিজ্ঞতা বলতে হবে।" হাঁ কি না করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, অবশেষে শৈলেন বললে, "চলুন।"

আমি ভাবছিলাম মণিপুরীরা প্রথমত মোংগল জাতের লোক, দ্বিতীয়ত এদের মধ্যে মধ্যবিত্ত মোটেই নাই। আমার লেকচার শুনে যদি বিদ্রোহ করে তবে সামলাতে পারবে না, উপরন্তু এরা গাঁজার গল্প মোটেই উপভোগ করতে পারে না। 'যা দেখেছ তাই বলে যাও' এটাই হোল তাদের শ্রোতব্য বিষয়।

বিদ্যালয়ে গেলাম এবং দেখলাম, যে সকল ছাত্র বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করে তারা সকলেই মজুরদের ছেলে। এদের কাছে যদি চীনের কথা বলি তবেই এরা বিগড়াবে। অপরকে বিগড়ানো অতি সহজ কিন্তু ঠিক পথে চালানো বড়ই কঠিন। স্কুল-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে সামান্য দু'চার কথা বলতে বাধ্য হলাম। সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম—ঘুমন্ত চীন জেগেছে, মাও-সুতন এবং চু-তে চীন জাতকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

টিকেন্দ্রজিত বৃটিশের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন, ছাত্রেরা বোধহয়

মনে করেছিল মাওস্তুন এবং চু-তে টিকেন্দ্রজিতের মতই কেউ হবেন। মণিপুরী ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় ভাব ছিল। বিদ্যাভ্যাসের ফলে দেশপ্রেম বেড়েছিল এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালী-বিদ্বেষও জেগেছিল। রেসিডেন্টের পরেই তারা দেখতে পেত বাঙ্গালী বাবুরা তাদের প্রতি রক্তচক্ষু বিস্তার করে আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্বেষ হওয়া স্বাভাবিক। বাঙ্গালী ক্লাব, বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা মণিপুরীরা দূর থেকে দেখত এবং পাঁঠা কাটা দেখে বাঙ্গালী হিন্দুদের ম্লেচ্ছ বলে প্রতিশোধ নিত। বাঙ্গালী আমরা, দূরদর্শী ছিলাম না কোনকালেই; যদি আমাদের দূরদর্শিতা থাকত তবে কালীপূজা এবং দুর্গাপূজায় অন্তত মণিপুরে পাঁঠা কাটতাম না।

বাবুরা বি-এ এবং বি-এস্-সি পাশ করেও চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের সময় বর্বরদের মত মরণ-ভয়ে ভীত হয়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করতেন। মণিপুরীদের মধ্যে সেই প্রথা নাই এবং ছিল না। একবার মণিপুরীরা সূর্যগ্রহণের সময় বাঙ্গালী সংকীর্তন পার্টিকে আক্রমণ করেছিল। মণিপুরীরা সূর্যগ্রহণ দেখে আনন্দিত হয়, মাটি অথবা পাথরের মধ্যে জল রেখে বার বার দেখে, সেই সময় বাঙ্গালীদের 'হরিবোল' চিৎকার পছন্দ করে না এবং সেজন্যই আক্রমণ করেছিল। রেসিডেন্ট সাহেব পাঞ্জাবী সৈন্য এনে মণিপুরীদের শাস্তি দিয়েছিলেন। কারো ধর্মে হাত না দেওয়া যাদের প্রিন্সিপ্‌ল্, তারা কি করে বাঙ্গালী বাবুদের সাহায্য না করে থাকতে পারে?

মণিপুরী স্ত্রীলোক বড়ই কর্মঠ। কাপড় বুনা, রান্না করা, শাকসব্জি ফলানো, শিশুরক্ষা, কাপড়কাচা, রান্নাকরা—এর পরে দরকার বোধে জমিতে চাষ দেওয়া কাজেও আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। মণিপুরী শিশুরা প্রায়ই বেশ স্বাস্থ্যশালী। তারা যে বেশি কিছু খায় তেমন নয়। মায়ের দুধও তাড়াতাড়ি বন্ধ

করে দেওয়া হয়। মণিপুরী, আসামী এবং অন্যান্য মোংগল জাতের মধ্যে কলার অত্যধিক প্রচলন রয়েছে। তা বলে সকল রকমের কলা শিশুদের খেতে দেওয়া হয় না। এঁঠেল কলা (যাতে অত্যধিক বীচি থাকে) সেই কলা হতে চালুনীর সাহায্যে বীচি বের করে নিয়ে লবণ এবং পারলে সামান্য দই মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়। শিশুরা একটু বড় হলেই চিড়া খেতে আরম্ভ করে। মুড়ি এবং খৈ হতে চিড়া পুষ্টিকর। এতেই মণিপুরের যুবক-যুবতীর শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এরূপভাবে এঁঠেল কলা খাওয়া লুসাই, গাড়ো, নাগা, খাসিয়া এবং অন্যান্য পার্বত্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। অথচ এমন উপাদেয় খাদ্য বাঙ্গালীরা ব্যবহার করে না। তার একমাত্র কারণ হল আসামবাসীরাও তাদের শিশু এবং কিশোরদের এঁঠেল কলা খেতে দেয়। বাঙ্গালীবাবুরা আসামীদের 'ভূত' বলতে বড়ই পছন্দ করেন। কি জানি এঁঠেল কলা খেয়ে যদি তাদের মত ভূত হতে হয়, সেই ভয়েই আমাদের জাত এত ভাল জিনিসও পরিত্যাগ করেছেন।

মণিপুরীদের বিয়ে আমাদের মত হয় না। আমাদের বিয়ের প্রথা অবিকল আরবী প্রথায় হয়ে থাকে। মণিপুরীরা যেমন মেয়ে দেখতে যায়, তেমনি মেয়েরাও ছেলে দেখতে যায়। অবশ্য এই নিয়মটি আধুনিক। পূর্বে সেরূপ ছিল না। মেয়েরাই স্বামী বেছে নিত এবং এখনও মেয়েরাই স্বামী বেছে নেয়। স্বামী বেছে নেওয়া এবং পাঁঠা কেনা একই। ছেলের কটা দাঁত উঠেছে যুবতী হাত দিয়ে দেখে। দাঁতে ক্ষয় আছে কিনা তাও দেখাতে হয়। শরীর কেমন দেখাতে হয়, উপরন্তু শক্তি এবং সাহসের পরিচয় দিতে হয়। মেয়ের দিকে কোনও রকমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় না।

আসামী এবং মণিপুরীদের মধ্যে এখনও এমন অনেক শ্রেণীর লোক আছে, যাদের মেয়েদের বিয়ে হয়নি অথচ চার-পাঁচটি

সন্তানের মা হয়েছেন। বিয়ে করাটা তত বড় কাজ নয়, স্বামী-স্ত্রীতে মিলে-মিশে থাকাই বড় কাজ। অনেক মায়ের বিয়ে হয় ছেলের উপনয়নের পূর্বে। আমরা যাকে দ্বিজত্ব বলি, এটা উত্তরের লোকের সৃষ্ট নয়, এটা মোংগল জাতের সৃষ্ট। উত্তরের লোক দ্বিজত্বপদ্ধতি গ্রহণ করেছে মোংগলদের কাছ থেকে। উপনয়ন মানে পুরুষতার পূর্ণ অনুভূতি এবং কৃষ্টির মধ্যে এনে উচ্ছৃঙ্খলতা অপসারণ করা। উত্তরের লোকের মধ্যে অর্থাৎ তথাকথিত আর্যদের মধ্যে যখন বিবাহপ্রথা ছিল না, তখন যে-কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে-কেহ বসবাস করতে পারত। আর্যদের মধ্য হতে এই বর্বরপ্রথা লোপ পাবার পূর্ব হতেই বোধহয় মোংগল, ব্রাউন মোংগল, টিবটো-বর্মনদের মধ্যে দ্বিজত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে দ্বিজত্ব প্রচলিত ছিল না। সেজন্য স্ত্রীলোকেরাই শুধু পূর্বকালে ব্যভিচারী হতেন, পুরুষেরা সংযত থাকতেন। এই নিয়ম পৃথিবীতে যত আদিবাসী আছে সকলের মধ্যেই এখনও প্রচলিত আছে। আর্য এবং সিমেটিকদের মধ্যে দ্বিজ হওয়ার প্রথা পূর্বে প্রচলিত ছিল না, রামায়ণ কাব্যে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

দ্বিজ হওয়ার সময় তখনই হয় যখন পুরুষের শরীরে যৌবন দেখা দেয়। যখন যৌবন বিকশিত হতে থাকে এবং শরীর বৃদ্ধি হয়, সেই বৃদ্ধি যাতে ব্যাহত হতে না পারে সেজন্য আদিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হ'ত; যেমন নিজের ভাত নিজেই রান্না করা, পরিশ্রমের কাজ করা, দিনে না ঘুমানো, মাথার চুল কেটে ফেলা, নারী-সংস্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ করা, রাতে কিছু না খাওয়া ইত্যাদি। এই ধরণের রীতি মণিপুরীদের মধ্যে— যারা জংগলের বাসিন্দা তাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। শহরের লোকের আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ পৃথক। এখন বলতে ১৯৩২ খৃঃ বুঝতে হবে। আজকের অবস্থা কিছুই জানি না।

মণিপুরীদের মধ্যে যাঁরা সন্তানের মা, তাঁরা তাঁদের শিশুদের ভালমন্দ যেমন বুঝতে পারেন, পুরুষেরা সেরূপ বুঝতে রাজি নয়। রোগগ্রস্ত শিশুর কাছে না যাওয়া, দূর থেকে শিশু কেমন আছে জিজ্ঞাসা করা এবং যদি শিশু মারা যায় তবে সৎকার করা, এর বেশি পুরুষদের যেন কিছুই করার নাই! এই ব্যবহার পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

ভূত, প্রেত, দেবতা, অপদেবতা, ঈশ্বর, এসবকে ভয় করাই মণিপুরীদের অভ্যাস। সন্ধ্যার পর গন্ধক, শস্য ও শস্যের তেল আগুনে দেবার প্রচলন রয়েছে। শিশু জন্ম নেবার পর তার পাশে বাঘের চামড়া, লোহা, ঝাঁটা এবং আরও অনেক কিছু রেখে দেওয়া হয় যাতে অপদেবতা আশ্রয় না করতে পারে। জ্বর হলে যদি কারো 'ডিলিরিয়াম্' হয় এবং আবল-তাবল বকে, তা হলে তাকে অপদেবতা পেয়েছে মনে করা হয়। অপদেবতা-পাওয়া দুটি জ্বরের রোগীকে মাথা ধুইয়ে দেবার পর ভূত অথবা অপদেবতা হতে আমি মুক্ত করেছিলাম।

ভূত, প্রেত, অপদেবতা শুধু মণিপুরের শিক্ষিত-সমাজে অবস্থান করে না, ভারতের প্রত্যেক ঘরে এসবের অভাব নাই। যে সকল গল্প শোনা যায়, অনেক সময় বুদ্ধি খাটিয়ে কোনও মীমাংসায় আসা যায় না এরূপই অনেকের ধারণা; কিন্তু অনেক গল্পের সমাধান ছয় মাস পরে হয়েছে এবং ভূত যে অশিক্ষিত ভূতের ঘাড়েই চাপে, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভারত-ভ্রমণে ভূতের প্রাচুর্য থাকবেই, নতুবা ভারত-ভ্রমণের মর্যাদা কি করে থাকে? মণিপুরীরা ভূতের ভয় হতে রেহাই পায়নি, কিন্তু কোথা হতে এবং কি করে মণিপুরীদের মধ্যে ভূত প্রবেশ করেছিল, তাই ছিল অন্বেষণের বিষয়। শেওড়া, কদম্ব, বট, তেঁতুল এবং অন্যান্য উচ্চ বৃক্ষেই ভূতপ্রেতের বাসস্থান। আলেয়ার জন্মস্থান পচা ডোবা, খাল-বিল। মণিপুরে এসব আছে বটে কিন্তু আলেয়ার সৃষ্টি

করতে পারে না। শীতের আধিক্য এবং প্রবল বাত্যা থাকার জন্য গ্যাস হতে পারে না। তবুও বনাঞ্চলে বড় বড় গাছের পচা অংশে আলেয়ার সৃষ্টি হয় এবং সেই আলেয়া প্রখর না হওয়াতে ভয়ের কারণ হতে পারে না।

মণিপুর, আসাম, উত্তর বিহার, বঙ্গদেশ সর্বত্রই ভূতের ভয় বেশি এবং সেই ভয় শিক্ষিত-সমাজে সীমাবদ্ধ। মণিপুরীদের মধ্যে যারা বৈষ্ণব অথবা মুসলমান নয়, তারা ভূতকে ভয়ও করে না এবং ভূত স্বীকারও করে না; কিন্তু বাঘ, অতিকায় সাপ, অতিবৃদ্ধ শূকর, হাতী এবং আচমকা দেখা বন্যজীবকে ভূতের মতই ভয় করে এবং হত্যা করারও চেষ্টা করে। এসব জীব যাতে তাদের অনিষ্ট না করে সেজন্য মোরগের রক্ত, ডিম, কলা এবং আতপ চাউল কোনও গাছের নীচে রেখে আসে। মণিপুরীদের কাছ থেকেই এসব কথা শুনেছিলাম, এখন বোধহয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জাপানী আক্রমণে শুধু ভূতই পালায়নি, অনেক জানোয়ারও পালিয়েছে।

আমাদের বিদায়ের সময় হয়ে এসেছিল। আবার রেসিডেন্ট-আফিসে যেতে হল। বড়বাবু অনেক বড় বড় কথা বলে আসামী ইনস্পেক্টারকে কি আদেশ দিলেন। আমরা চলে এলাম। আমাদের গন্তব্য স্থান মাউ।

আমরা দু-একদিনের মধ্যে রওয়ানা হব জেনে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত, কোন্‌দিন রওয়ানা হলে বিপদ হবে না বলতে এলেন। পণ্ডিত অমায়িক এবং দয়ালু। কোনরূপ দুষ্ট বুদ্ধি তাঁর ছিল না। ভদ্রলোক আসামের বাঙ্গালী, আসামীদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। পণ্ডিত মহাশয় অনেক রকমের হিসাব করার পর একটি দিন ধার্য করলেন। মনে মনে হাসলাম এবং বললাম, "আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, তবে এসব রাশি এবং তথাকথিত নক্ষত্র আমি মানি না। আমাদের এখান থেকে সত্বরই চলে যেতে

হবে।" পণ্ডিত দুঃখিত হলেন এবং বললেন, "এতগুলি দেশ ভ্রমণ করার পর এসবে অবজ্ঞা, এ ত কম কথা নয়!"

পণ্ডিত জানতেন না জ্যোতিষ-বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত নয়। ইণ্ডিয়া হতে আরবগণ জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করে জ্যোতিষ শাস্ত্র হাত ঝেড়ে ফেলে গিয়েছিল। সেই পরিত্যক্ত শাসন-পদ্ধতি (বিজ্ঞান নহে) ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচারকদের আর্থিক উন্নতির অনেক সুযোগ করে দিয়েছিল। কতকগুলি গ্রহ-নক্ষত্র মন ও শরীরের উপর কাজ করে, এই কাল্পনিক মত সমর্থন ক'রে কতকগুলি মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। এসব জানতাম, সেজন্য পণ্ডিতের প্রতি দয়া হয়নি।

আমার জন্ম এমনই এক পরিবারে হয়েছিল, যে পরিবারে আস্তিক এবং নাস্তিকের সমাবেশ ছিল। সাংখ্য অনেকটা নাস্তিকত্ব সমর্থন করে। বেদান্ত দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদ নিয়ে মাথা ঘামায়, তা ছাড়া ন্যায়-অন্যায়েরও সমর্থন করে—এসব কথা ছোট-বেলা হতে নিজের ঘরেই শুনতাম। এরপরে পশ্চিমা দর্শনগুলিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন আমার পরিবারের অনেকেই। আমি হলাম পণ্ডিত-পরিবারের মূর্খ ছেলে, আমাকে শনিবারের বারবেলা এবং মঘা নক্ষত্র ভয় দেখাবে কি করে? আমরা দিনক্ষণ না দেখে ইচ্ছামত একদিন মণিপুর হতে রওয়ানা হয়েছিলাম।

ইম্ফল হতে কোহিমা মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল। এই পথটুকু চলা একদিনেই সম্ভবপর। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় একটি শব্দ আছে, যাকে বলা হয় 'টপগ্রাফী'। আমার কাছে যে মানচিত্র ছিল, তাতে মাউ নামক স্থানের কথা লেখাই ছিল না। ভারতীয় সার্ভে-বিভাগ পূর্বেও অপদার্থ ছিল, বর্তমানেও বিশেষ উন্নতি করেছে বলে মনে হয় না। চিত্রাঙ্কনে যে পারদর্শী লোকের দরকার, ভারতীয় সার্ভে-বিভাগ এখনও তা' বুঝতে পারেনি। হাঁ বুঝবে,

যেদিন উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবগুলি কর্মচারীকে এক ঘণ্টার নোটিশে বরখাস্ত করা হবে। আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন, জার্মানী, এমন কি সেদিনের মুক্ত মহাচীনের কাছে ভারতবাসী নিতান্ত শিশু বললেও দোষ হয় না।

মাউ গ্রামে পৌঁছুতেই আমাদের বারটা বেজে গেল। সেখানে থাকবার ব্যবস্থা ছিল না। সামান্য জলযোগ করে আরও বারো মাইল নীচে গিয়ে একটি ডাক-বাংলো পেয়ে সেখানেই বিশ্রাম করব ভাবলাম। দ্বিপ্রহর এবং রাত্রের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিল ডাক-বাংলোর দ্বারওয়ান। বিকালে পাশের গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকটা ট্রপিক্যাল দেশের মত। আম, জাম, সুপারী, কাঁঠাল বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে ছিল। একজন গ্রামের লোক বললে, আগের দিন ডাক-বাংলো হতে একটি ঘোড়া বাঘে নিয়ে গেছে। গ্রামের হেডম্যান্ বাঘটাকে গুলি করেছিল, গুলি লাগেনি বলেই মনে হচ্ছিল। সন্ধ্যার পূর্বেই ডাক-বাংলোতে ফিরে এসেছিলাম। দ্বারওয়ান ফটক বন্ধ করে দিয়ে ডাক-বাংলোর সব দরজা বন্ধ করে দিল। রান্না সন্ধ্যার পূর্বেই করেছিল। আমরা ক্ষুধার্ত না থাকা সত্ত্বেও খেতে বাধ্য হয়েছিলাম। অবশেষে দ্বারওয়ান বাতি নিবিয়ে দিয়ে গল্প বলতে আরম্ভ করল। বাঘের ভয়ে দ্বারওয়ান আধমরা হয়ে ছিল। আমাদের পেয়ে সে খুশীই হল।

পরদিন আমরা কোহিমা পৌঁছি। কোহিমা, নাগা পাহাড়ের জেলা-কেন্দ্র, ডিপুটি কমিশনার থাকেন এখানে। এখন থাকেন কি না জানি না। আমরা এক স্বজাতি ভাইয়ের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। কোহিমা হতে মণিপুর রোড পর্যন্ত পথ বেশ চালু থাকায় একদিনেই মণিপুর রোডে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলাম।

দিমাপুর হইতে সদিয়া

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী যদি কেউ কিছু করতে চায় এবং তারই সঙ্গে যদি এমন কেউ থাকে যার পরিকল্পনায় সময়ের নির্দেশ না থাকে, তবে বড়ই বিপদে পড়তে হয়। আমার সাথী শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ দে'র পূর্বপরিকল্পনা ছিল। তার পরিকল্পনা ছিল, মার্চ মাসে দারজিলিং পৌঁছানো। আমার পরিকল্পনায় সময়ের নির্দেশ ছিল না। সদিয়া এবং তারও উত্তরে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল ; আমি সদিয়া যেতে মনস্থ করেছিলাম।

রেল-ষ্টেশনের নাম মণিপুর রোড এবং গ্রামের নাম দিমাপুর। রেল-ষ্টেশনে পৌঁছে দিমাপুর গ্রামটা দেখতে গেলাম। শৈলেন গেল না। কেন গেল না অথবা কেন যাবে না, সে প্রশ্ন করার অধিকার আমার ছিল না। গ্রাম দেখতে যাবার সময় বলে গেলাম, "আজ এখানেই থাকতে হবে এবং আমরা থাকব ওয়েটিং-রুমে ; তুমি সেখানে যাও, স্নান কর, তারপর রেস্টোরেণ্টে খেয়ে নিও।"

আমার কথার কোনও জবাব না পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলাম। ভাবলাম, হয়ত ভারতীয় আবহাওয়া শৈলেনের মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

মণিপুর রোডের পাশেই যে গ্রাম, সেই গ্রামের এক পাশে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেকক্ষণ উপভোগ করলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে লাভ হবে না ; যাঁরা দেখতে চান তাঁরা দেখে আসবেন। তারপরই দেখতে পেলাম একদল কুকী চলে যাচ্ছে। তাদের শরীরের গঠন, চলার ভঙ্গি, বাক্যের উচ্চারণ, ভাল করে লক্ষ্য করলাম, তারপর এই নিয়ে কত কি চিন্তা! বাস্তবিকই এসব চিন্তা মনে আসত বলেই পৃথিবী-ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

কতক্ষণ বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখি, শৈলেন সদিয়ার টিকিট

কিনে ফেলেছে। চারখানা টিকিট। আমাদের ছু'জনার ছুখানা; তাছাড়া ছু'খানা সাইকেলের ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। চারজন যাত্রীর পক্ষে সাইকোয়া ঘাট পর্যন্ত পৌঁছতে যা ভাড়া, আমাদের সাইকেলসমেত সেই ভাড়া। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে সাইকোয়া ঘাট, সেই পর্যন্তই রেলগাড়ি যায়।

শৈলেনের কাছে টাকা ছিল না তাই আমি জানতাম, কিন্তু হঠাৎ এত টাকা কোথা হতে পেল ভেবে পাচ্ছিলাম না। জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করছিল। শৈলেনশ্রেণীর যুবক ভিন্ন প্রকৃতির। প্রকৃত বিপ্লবী যারা হয়, তারা জীবনটাকে তুচ্ছ মনে করে আজীবন। এরা একগোছের জীব বটে। এদের জীবন আছে; খায়, ঘুমায় সবই করে কিন্তু যে কোন মুহূর্তে জীবনটা শেষও করতে পারে। আমার ধারণা ছিল না শৈলেন টেরারিষ্ট; কিন্তু তার দারজিলিংএর কার্যকলাপ ও পরে ভাওয়ালের কার্যকলাপ দেখে ভাল করে বুঝতে পেরেছিলাম সে টেরারিষ্ট ছাড়া আর কিছু ছিল না। কোথায় লাগে দাদা আর ফাদা, যাকে হত্যা করবে ঠিক করে নিল তাকে হত্যা করবেই। শত গোর্খায় বেষ্টিত হয়ে থাকলেও জীবন রক্ষা পাবার উপায় নাই। মারলে যে কষ্ট অনুভব করে না, যার মাংস কাটলেও সে হু-হা করে না, সর্বদাই হাসিমুখ, তার প্রতি কে কত অত্যাচার করতে পারে? ভ্রমণ-জীবন শেষ হবার পর কলিকাতায় ফিরে এসে ১৯৪১ সালে শৈলেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলেছিল, সিকিউরিটি কয়েদী-হিসেবে রেঙ্গুনের ইন্‌সিন্ জেলে সাত বৎসর সে আবদ্ধ ছিল। তাতেও তার মনে কিছুমাত্র দুর্বলতা আসেনি। সে তার জেল-জীবনের কতকটা আভাস দিয়েছিল; বুঝতে পেরেছিলাম—বন্দীদের মধ্যে সকলেই বিপ্লবী ছিলেন না।

বোধহয় রাত নয়টার সময় মণিপুর রোড হতে আমরা রেলগাড়িতে উঠেছিলাম। বেশ পরিশ্রান্ত ছিলাম। গাড়িতে

শোবার স্থান মিলেছিল। তারপর যখন ঘুম থেকে উঠেছিলাম, তখনও আমরা পার্বত্য ভূমির উপর দিয়ে চলছিলাম। সেই পথ-চলা আরামদায়ক বটে। দু'দিকে দিগন্তব্যাপী পর্বতমালা, লোকের বসতি আছে বলে মনে হচ্ছিল না। বিকালের দিকে ধীরে ধীরে গাড়ি সমতল ভূমিতে চলতে আরম্ভ করল। বুঝলাম, আমরা সাইকোয়া ঘাটের কাছে এসেছি। বিকাল চারটার সময় আমরা গাড়ি হতে নামলাম। গাড়ি হতে নেমেই সদিয়ার ফেরিবোটের দিকে রওয়ানা হলাম।

আমার ইচ্ছা, সাইহুল্লার মুসলিম লীগ রাজত্বের পত্তন দেখা। পত্তন আরম্ভ হয়েছিল নদীর উত্তর তীরে। আমরা নদী পার হলাম। তারপরই দেখা হল একদল অসমীয়ার সঙ্গে। তারাও সাইকেলেই আমাদের পেছন নিয়েছিল। কাউকে কিছু না বলে আমরা একটি মাড়ওয়াড়ী ধরমশালায় উঠলাম। ধরমশালাটা মস্ত বড় কিন্তু অপরিষ্কার। তাতেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করলাম না। আমার উদ্দেশ্য, শৈলেনকে বৃটিশ সরকারের কুমতলব বুঝিয়ে দেওয়া।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ধরমশালার এককোণে কম্বল পেতে বসলাম। ধরমশালার মালিক আমাদের একটা ডিজ্ ল্যাম্প দিয়ে গেল।

তাই আমাদের দেখার পক্ষে প্রচুর। একটুও বিশ্রাম না করে মানচিত্র খুলে শৈলেনকে দেখালাম, "ঐ দেখ চীনের চেকিয়াং প্রদেশ। এই প্রদেশটা তিব্বতের একটি অংশ। এখানকার অধিবাসী প্রায় সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আর ঐ দেখ সদিয়া ফ্রন্টিয়ার জেলা। এই জেলা, দরং, নাগা হিল্ এবং কামরূপের কতকটা নিয়ে বৃটিশ রাজ্যগঠনের মতলব করেছে। যদিও এই রাজ্যকে মুসলিম স্টেট নাম দেওয়া হবে, হয়ত সাইহুল্লা এই স্টেটের প্রধান মন্ত্রীও হতে পারেন কিন্তু দেশটা হবে বৃটিশের অধীনে। এটা যদি ফলবতী হয় তবে চীন ও ভারতের ঘাড়ে

বসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী পা তুলাবে এবং উভয় দেশের প্রতি খবরদারী করতে পারবে।

বিষয়টা বুঝতে পারা মাত্র শৈলেন জিজ্ঞাসা করল, "সাইহুল্লা থাকে কোথায় ?"

"এসব বাজে কথা শৈলেন, একটা কি দুটা লোক হত্যা করলে বৃটিশ পরিকল্পনা ধ্বংস হবে না। যদি পার ত সর্বসাধারণের মধ্যে অনুপ্রবেশ কর, মাও-সুতনের মত তোমরাই সদিয়া দখল করে নাও, দেখবে বৃটিশ পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেছে।"

আমরা যখন এই প্রকারের কথায় লিপ্ত ছিলাম, তখন দুইজন অসমীয়া ভদ্রলোক তাঁদের মেসে গিয়ে থাকতে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা সাদরে তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

যে রুমটাতে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল, পাশের রুমের একজন অসমীয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করে বললেন, "মনে করবেন না এটা আপনাদের বন্ধুগৃহ, এটা সত্যিকারের পুলিশ-মেস, অতএব কারো কাছে কিছু বলবেন না।" আমার ভয়ের কোনও কারণ ছিল না, যত ভয় শৈলেনকে নিয়ে। নিরাপদে রাত্রি কাটিয়ে আমরা যখন পরশুরাম-কুণ্ডের দিকে চলছি তখন পুলিশ আমাদের বাধা দিল এবং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ আফিসেই ছিলেন। আমাদের বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এদিকে কি দেখলেন ?"

"এরই মাঝে অনেক কিছু দেখেছি। এত বড় বিস্তৃত সমতল ভূমি অনাবাদী পড়ে আছে। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে বাস করতে পারে। জমি সমতল এবং পরিষ্কার। এত পতিত জমি থাকতে আমাদের দেশের লোক জমির অভাব বোধ করছে, তাই দেখে এলাম। পথের দু'পাশে পাঞ্জাবীরা গ্রাম করেছে বটে কিন্তু এখানে এরা থাকতে পারবে না। আমাদের দেশের বাঙ্গালীরা যদি এখানে থাকবার সুবিধা পায়, তবেই ভাল হবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বাধা দিয়ে বললেন, "অনেক বাঙ্গালী-গ্রাম এদিকে আছে, দেখেছেন কি?"

"নিশ্চয়, এদের অবস্থা দেখলে সকলের চোখেই জল আসবে।"

"এরা সবাই মুসলমান বাঙ্গালী।"

অবতারবাদ এত নীচ স্তরে নেমে এসেছিল সেকথা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বললাম না। একদা অবতারবাদের প্রভাবে মুসলমানদের মানুষ বলেই স্বীকার করতাম না, কিন্তু যেদিন স্টালিন্-সোভিয়েট দেখেছিলাম, সেদিন হতে অবতারবাদ আমার মন হতে মুছে গিয়েছিল।

বাঙ্গালী মুসলমান শিশুদের রৌদ্রে বৃষ্টিতে খেলা করতে দেখেছিলাম। তারা ছিল অরক্ষিত। তাদের মা বাবা পেটের অন্ন যোগাড় করবার জন্য, অনেক দূরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করছিল। তারা জানত না, দুষ্ট লোক ময়মনসিংহ জেলা হতে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নিয়ে এসেছিল দূর দেশান্তরে। তবুও ভাল, তারা পরিশ্রম করছিল। তাদের আচার-ব্যবহারে ইস্‌লাম সভ্যতার গন্ধও ছিল না। তবে তারা জানত, তারা মুসলমান, এর বেশি নয়!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চাইছিলেন মুসলমান বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে কিছু বলি; কিন্তু আমি সাম্প্রদায়িকতার একটুও প্রশ্রয় দিলাম না। তখন আমি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে অবতারবাদের উর্ধ্বে, কাষ্ট-ইজমের উর্ধ্বে; অথচ শিশুর ক্রন্দন আমাকে কাঁপিয়ে তুলত, বৃদ্ধের আর্তনাদ আমার মনে বিদ্রোহের ভাব এনে দিত, স্ত্রীলোকের প্রতি অপমান সহ্য করতে পারতাম না। আমি হয়ে গিয়েছিলাম কাকের বাসার কোকিলের ছানা। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিচ্ছি না দেখে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদেশ করলেন, আজই সন্ধ্যার পূর্বে যেন সদিয়া শহর পরিত্যাগ করে যাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট একজন আসামী মুসলমান। কিন্তু আমার কাছ থেকে

সাম্প্রদায়িকতা-সম্পন্ন কথা কি করে পেতে পারেন? কি করে আমি বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘৃণা করতে পারি? ময়মনসিংহের মুসলমানদের শরীরে দ্রাবিড়-রক্তের প্রাচুর্য ছিল। হাজর উপজাতি পূর্বে ময়মনসিং জেলার বাসিন্দা ছিল। কালের প্রভাবে তারা ব্রাহ্মণদের কাছে অনার্য নামে পরিচিত হয়। বুদ্ধযুগে তারা মুক্ত হয়েছিল, পৃথিবীর অনেক দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করেছিল। আবার যখন শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণ্য-প্রথা প্রচলন করেছিলেন, পুনরায় তারা অনার্য হয়েছিল। তারপর এল পাঠান এবং মোংগল। সে যুগেও তারা শুধু গোলাম এবং বাঁদী হবার অধিকারী হয়েছিল। বৃটিশ-আমলে তারা হয়েছিল মুসলমান। এত ঘাত-প্রতিঘাত যাদের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, তাদের প্রতি কোন্ পাষণ্ড দয়া না দেখাতে পারে?

শৈলেন কি চিন্তা করছিল! বোধহয় তার মনে বৃটিশ-বিদ্বেষ আরও উগ্র হয়েছিল। দ্বিপ্রহরে একটি অসমীয়া ভাতের দোকানে স্নানাহার সমাপ্ত করে একটু বিশ্রাম করলাম, তারপর নদীতীরে এসে শৈলেনকে বললাম, "কি বুঝলে শৈলেন? এই ত আমার দেশ! তোমার শরীরে যে রক্ত বইছে, সেই রক্ত ময়মনসিংহের মুসলমানদের শরীরেও বইছে। এদের জন্য কি তোমার একটুও দয়া হয় না?""

"সব হারিয়ে ফেলেছি, মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নৃ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যা বলছেন, তার কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এটা বুঝেছি—এদের শরীরের রঙ, চেহারা এবং ভাষার সঙ্গে নিকট-সম্বন্ধ রয়েছে। কথা হল, প্রথমে স্বাধীন হতে হবে, তারপর এদের কথা চিন্তা করব।"

"তা হয় না শৈলেন। স্যান-ইয়াত-সেন মাঞ্চু-বংশকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন কিন্তু চিয়াং কাইসেক তাঁর স্বজাতিকে লুটেই যাচ্ছেন, উপকার ত করতে পারছেন না। এসব ভূয়া স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই।"

আমাদের পেছনে গোয়েন্দা মহাশয়গণ—আমরা কি বলি না বলি শুনবার জন্য কান পাততে এসেছিল, আমরা ফেরী-বোটে উঠলাম। গোয়েন্দা আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করল।

সন্ধ্যা হয় হয়, পশ্চিমের সূর্যের সোনালী কিরণ নদীবক্ষে পরে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করছিল। তরঙ্গায়িত জলে রবিরশ্মি ঢেউ খেলে পশ্চিমমুখী সূর্যের দিকে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলছিল। এ দৃশ্য সর্বত্র দেখা যায় না। যে সকল নদী পশ্চিমগামী, সেই নদীতেই এই দৃশ্য দেখা যায়।

সন্ধ্যার পর আমরা ওপারে এলাম। সাইকোয়া ঘাটের আশেপাশে গ্রাম ছিল বটে কিন্তু বহুদূরে। ষ্টেশনেই রাত কাটাব স্থির করে প্লাটফর্ম-এর একদিকে আড্ডা গাড়লাম। কতক্ষণ পর কয়েকখানা গাড়ি প্লাটফর্ম-এ আনা হয়েছিল। পরদিন আটটায় গাড়ি ছাড়বে। গাড়িতেই রাত কাটাব মনস্থ করলাম। ইতিমধ্যে একজন কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বোধহয় রেল-কোম্পানীতে কোন কিছুর সাপ্লাই দিতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি। কোথা হতে খাদ্য আনিয়ে আমাদের খাওয়ালেন, তারপর প্রথম শ্রেণীর কম্‌পার্টমেণ্ট খুলে দিয়ে রাত কাটাবার সুযোগ করে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। আসাম এবং বাংলাদেশের মধ্যে ইনিই প্রথম আমাদের প্রতি আতিথ্য দেখিয়েছিলেন।

সেই ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি নাম বলতে অস্বীকার করে বলেছিলেন, "নাম কেনবার জন্য আপনার সাহায্য করিনি, এটা আমার কর্তব্য।"

হায়রে সে-যুগের বাঙ্গালী! নামের ভিখারী তারা তখন ছিল না। যে জাত যখন এগিয়ে চলে, তখন তারা নামের ভিখারী মোটেই হয় না। জাতের অধঃপাতের সঙ্গে নামের সঙ্গে মোহ আসে এবং জাত জাহান্নামে যেতে থাকে। আজ আমরা কোন্‌দিকে?

আসাম

১

আমাদের দেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে যে বিরাট ভূখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়, তাকে আসামপ্রদেশ নাম দেওয়া হয়েছে। অসমীয়াদের বাসস্থান বলেই সে ভূখণ্ডের নাম আসাম হয়েছে। অবশ্য এই নাম বৃটিশের আমলে দেওয়া হয়েছে। পূর্বে এই দেশের নাম ছিল কামরূপ। মহাভারতে আসামের পূর্বের নাম কামরূপই দেখা যায়। যাহোক্ আসাম অথবা কামরূপ নাম নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না। এদেশে এলেই দেখা যায় স্ত্রী-প্রাধান্য। স্ত্রী-পুরুষে সমতা দেখা যায় কোরিয়ায়, আসামে দেখা যায় স্ত্রীলোকের প্রাধান্য। আদিযুগে পৃথিবীর সর্বত্র লিঙ্গ-উপাসনার প্রাধান্য ছিল। গ্রেট বৃটেন হতে জাপান পর্যন্ত সর্বত্র লিঙ্গ-উপাসনার জয়জয়কার ছিল। মহাম্মদ, যিশু, শঙ্কর, এই তিনজন অবতারই ঈশ্বরের বিশেষণ পিতা অথবা সেই শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছেন। কন্‌ফিউসাস্ স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অপহরণ করেছিলেন। সর্বত্র দেখা যায়, ঈশ্বর সম্বন্ধে যখনই কিছু বলা হয়েছে তখনই পুংলিঙ্গ শব্দের ব্যবহার হয়েছে; কিন্তু আসামেই শুধু তার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

বিষয়টি অতি সংক্ষেপে এবং সোজাভাষায় বলা হল, গুরুত্ব তেমন দেখা যায় না, কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে এর গুরুত্ব আছে। পর্যটক মরগেন বার বার স্ত্রী-জাতের শক্তিহীনতার নিদর্শন দেখিয়ে পুরুষরা কি করে স্ত্রীলোকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল বিশদভাবে তা বলেছেন; কিন্তু তিনি আসাম ভ্রমণ করেননি অথবা অষ্ট্রিক জাতের বিশেষত্ব অনুধাবন করার সুযোগ পাননি। ইস্‌লাম এবং ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতি-অধ্যুষিত ইন্দো-নেশিয়া দেখে নৃতত্ত্ব-সম্বন্ধে তিনি যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন,

অবনত মস্তকে তা স্বীকার করি কিন্তু পুরাতন থাইজাতের দিকে যদি তিনি চেয়ে দেখতেন তবে বুঝতেন, তিনি এক নূতন জগতে এসেছেন।

থাইজাত এবং বর্তমানের বাঙ্গালী জাতের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক রকমেরই ছিল এবং এখনও আছে। সেই থাইজাত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক স্থানে ছিল এবং এখনও আছে। অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে, অনেকে কোনও ধর্ম গ্রহণ করেনি, তারা এখনও মহামায়া শক্তি দেবীর আরাধনা বর্বর-প্রথায় পালন করে। উত্তরে চীন; পূর্বে ইন্দোচীনের তংকিন্, আনাম্, কোচিন চীন; দক্ষিণে কতটুকু পর্যন্ত আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ নিউগিনীতে আমি যাইনি। আন্দামান বিশুদ্ধ নিগ্রোয়াইট, পূর্বে—বিহার, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম। এতটুকু স্থানে যাদের বাস, তাদের অপর নাম একদা 'থাই' ছিল। 'থাই' মানে স্বাধীন। স্বাধীনতারও একটি পরিমাণ আছে। যাদের স্বাধীনতার কোনও পরিমাণ নেই, তারাই নিজেকে স্বাধীন বলতে সাহস করে।

শ্যামদেশে দেখা যেত (এখন দেখা যায় কিনা জানি না), কোনও স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে আজ বিয়ে করে পরের দিন তালাক দিয়েছে। এর কোনও কারণ নেই। ভাল লাগল না, ছেড়ে দিল, তাতে কি আসে যায়? আমাদের কিন্তু অনেক কিছু আসে যায়, কারণ আমাদের ধর্মগুলি স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে। সে জন্যই আমাদের চোখে থাই-প্রথা বেশ আঘাত করে, অথচ থাইদের মধ্যে এটা হল সাধারণ নিয়ম।

আসামে প্রবেশ করা মাত্রই দেখা যায়, যারা সত্যিকারের অসমীয়া, তাদের স্ত্রীলোক বাস্তবিকই স্বাধীন। আসামে আজ যারা সত্যিকারের অসমীয়া, তারা সকলেই থাই। তাদের স্থাপিত কামাখ্যা-মন্দির যদিও ব্রাহ্মণ্য-মতবাদ এবং আচার-ব্যবহারের প্রাবল্যের দ্বারা নিজস্ব করতে সক্ষম হয়েছে, তবুও তাদের বিশেষত্ব

রয়ে গেছে। যখনই আমি সেই বিশেষত্ব দেখাতে আরম্ভ করব তখনই সকলে বলবেন, "এটা ত তান্ত্রিক মতবাদ, এতে আর নূতনত্ব কি?" কিন্তু তান্ত্রিক মতবাদ কোথা হতে এল, কেন এল, তা জানতে হবে প্রথম। যদি সেদিকে চেয়ে দেখা যায় তবে পুনরায় আমরা থাইজাতের মাতৃদর্শন জানতে বাধ্য হব।

থাইজাত আগাগোড়া মায়ের উপাসক। পৃথিবীর অন্যান্য জাত যেমন পিতার উপাসক ছিল, থাইজাতও তেমনি মায়ের উপাসক ছিল। পিতাকে থাইরা কোনওরূপ প্রাধান্য দিত না। পিতা থাকলেও চলত, না থাকলেও চলত; কিন্তু মা যার থাকত না, তার পক্ষে জীবন ধারণ করাই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠত, এই সত্যটুকু থাইজাত বুঝতে পেরেছিল। তারই বিকাশের জন্য মহাভারতের যুগেও আমরা কামাখ্যা দেবীর কথা, কামরূপের কথা নানাভাবে শুনেছি এবং ভবিষ্যতে যখন থাইজাতের ইতিহাস থাইরা লিখবেন তখন আমরা জানতে পারব।

মাতৃমঙ্গল-বিষয়ক প্রবন্ধ আমেরিকান জার্ণেলগুলিতে যেমন দেখা যায়, তেমন দেখা যায় না ইংলিশ জার্ণেলগুলিতে। অথচ উভয় দেশেই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম বর্তমান। যে কোনও রকমে মাতৃমঙ্গল-বিষয় নিয়ে আমেরিকান বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করেছেন বটে কিন্তু থাইজাতকে একেবারেই উপেক্ষা করে গেছেন। তবুও কয়েকজন ডাচ্ এবং ফরাসী পর্যটক থাইদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা বড়ই চমকপ্রদ এবং জ্ঞানবৃদ্ধিকারক।

আংকোর মন্দির সম্বন্ধে ফরাসী পর্যটকগণ সন্দিহান হয়ে অনেক কথা বলেছেন, সত্য কথা যেন তাদের বলতে ইচ্ছা ছিল না! আংকোরওয়াট কোনকালে বুদ্ধ-বিহার ছিল না। বুদ্ধধর্ম প্রবর্তন হবার পূর্বে এই মন্দির তৈরী হয়েছিল। তখন কি মূর্তি সেখানে ছিল, বলা কষ্টকর। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে বাস্তবিক কোনও মূর্তি নাই। যে সকল মূর্তি আমরা দেখতে পাই, সবই নূতন; এমন

কি, মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের। কামাখ্যা দেবীর মন্দির পাঠানরা ভেঙ্গেছিল, তারপর রাজা শিব পুনরায় গঠন করেন। সেই মন্দিরে শুধু যোনিরই লক্ষণ রয়েছে। ঠিক সেরূপ করে যদি আংকোরওয়াট কেউ দেখেন তবে দেখবেন, সেখানেও যোনিরই ছাপ, আর কিছুই নয়। পরবর্তী বুদ্ধ-যুগে বুদ্ধদেবের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পুনুমপেন অথবা ব্যাঙ্ককে যে সকল ভারতবাসী বুদ্ধধর্মের বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে কেহই আংকোর-ওয়াট দেখেছেন বলে মনে হয় না; তবুও বলা হয়, আংকোর-ওয়াটে কোনও এক সময়ে শিবলিঙ্গ ছিল। আমিও সে মত পোষণ করতাম কিন্তু কামাখ্যা দেবীর মন্দির দেখার পর সেই ভ্রান্তি দূর হয়েছে। মাতৃদর্শনে মায়ের মূর্তি থাকে না; মা মাই, তাঁর কোনও মূর্তি গড়তে পারা যায় না। আসল মাকে পূজা করাই ছিল মাতৃদর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য। নকল মা অর্থাৎ প্রতিমা-পূজার পদ্ধতি থাইদের মধ্যে ছিল না এবং আসামেও তদ্রূপই ছিল। আজ যদি কেউ থাইবংশের কোনও অসমীয়াকে এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেন তবে সে কিছুই বলতে পারবে না। দেখতে হবে তার আচার-ব্যবহার। অসমীয়াদের মধ্যে দুর্গা-কালী, এ সবের পূজার প্রচলন নাই। অসমীয়ারা মাত্র দুটি প্রাকৃতিক পর্ব পালন করে—হারিবিষু এবং মহাবিষু। হারি-বিষু আদি, মহাবিষু নূতন। 'হারি' মালয় শব্দ অর্থাৎ থাই শব্দ; তার মানে, "দিন অথবা রোজ"; 'বিষু' শব্দ বোধহয় খাঁটি দক্ষিণী। এতেই বুঝতে পারা যায় অসমীয়াদের সঙ্গে থাইদের একত্ব। মহাবিষু আধুনিক এবং কর্জ করা। আসলে মহাবিষু আষাঢ় মাসে হয়ে থাকে এবং এই নিয়ম মালয়, শ্যাম, কম্বোজ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে দেখা যায়। আষাঢ় মাসের অমাবস্যাই হল মহাবিষুর সঠিক তারিখ। কেন এই দুটি দিন থাই

অথবা অষ্ট্রিকদের মধ্যে বিশেষ দিন, সেই বিষয়গুলি এখানে বলা বড়ই কঠিন এবং অনেক পুস্তক থেকে অনেক কথা উদ্ধৃত করতে হবে সেজন্য পরিত্যাগ করা হল।

তারপর এই জটিল বিষয় নিয়ে অসমীয়ারা কোনরূপ আলাপ-আলোচনা করতে মোটেই রাজি হন না। কি জানি, বর্তমান রাজনীতি যদি আলাপ-আলোচনার মধ্যে এসে যায়! আমি ধন্যবাদ দেই অর্থাৎ প্রশংসা করি সাইছুল্লা, আকবর হাইদরী এবং মিশনারীদের। তাঁরা অসমীয়াদের মুখ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। অসমীয়াদের ভয়, কথার ফাঁকে রহস্য যদি প্রকাশিত হয়ে যায় তবে মহা বিপদ হবে। সাইছুল্লা, আকবর হাইদরী এবং মিশনারীরা নাগা, কুকি, খাসিয়া, গারো, মিরি, মিসমী এবং অন্যান্য উপজাতিকে অসমীয়াদের কাছ থেকে আগাগোড়া পৃথক হবার জন্য উস্‌কানী দিয়ে আসছে; ফলে আজ আমরা স্বাধীন নাগা, স্বাধীন গারো-স্থানের জিকির শুনতে পাই। আমাদের দেশের অনেককেই Self-determination শব্দ ব্যবহার করতে শুনতে পাই; কিন্তু এই শব্দ ছুটি মার্কস্ আবিষ্কার করেন এবং এই শব্দ ছুটি তখনই আরোপ করা হবে যখন কোনও দেশ প্রলিটারিয়েট ডিক্‌টেটর কর্তৃক পরিচালিত হবে। সুবিধাবাদীরা এই ছুটি শব্দ নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করছে দেখে ছুঃখ মোটেই হয় না, শুধু সুবিধাবাদীদের ক্ষণস্থায়ী বিজয়-গর্ব দেখে হাসি পায় এবং সেই সঙ্গে মনে হয়, তাণ্ডব নৃত্যের সময় ক্ষণস্থায়ী। ছু'দিন বৈ ত নয়, নেচে নাও।

আসামের রাজপথে পা দেওয়ামাত্রই বুঝতে পেরেছিলাম, অসমীয়ারা কত কষ্টে জীবন অতিবাহিত করছে! অবশ্য পথের ছু'দিকে বাঙ্গালী, মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানীও দেখতে পেয়েছিলাম। মারোয়াড়ী এবং হিন্দুস্থানীরা সরকারী কাজের জন্য লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত না; আমার স্বজাতি, বিশেষ করে আমার জেলা-

বাসীরা যখন আসামীদের বিরুদ্ধে আমার মত পর্যটকের কাছে নালিশ করতেন, তখন বলতে বাধ্য হতাম, "বন্ধুগণ, এখানে এসে চাকুরির দাবী না করে যাতে ব্যবসা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারেন সে চেষ্টা করুন ; দেখবেন এ দেশ আপনাদের হয়ে যাবে। অসমীয়াদের দূরে রেখে 'বেঙ্গলী ক্লাব' করলে এ দেশে থাকতে পারবেন না। হিন্দুস্থানীর বাড়িতে শনিপূজা হলে অসমীয়ারা নিমন্ত্রিত হয় ; তারা আসে, আনন্দ করে তারা, এবং হিন্দুস্থানীদের নিজেদের লোক মনে করে। আপনারা অসমীয়াদের দূরে রাখবার চেষ্টা করেন, সেজন্য ঘৃণিত হন। ভবিষ্যতে হয় ত বিপদেও পড়তে পারেন।"

আমার কথা শুনে অনেকে বিরক্ত হতেন, এমন কি থাকতে পর্যন্ত দিতেন না ; কিন্তু আজ যদি তাঁরা পূর্বের কথা স্মরণ করেন তবে দেখবেন, আমি যা বলেছিলাম তা সত্য কি না !

তখন বোধহয় বেলা নয়টা হবে, একজন চা-বাগিচার সাহেব ঘোড়ার গাড়ি করে কোথায় যাচ্ছিল। পথটা ছিল খুব বিশাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দৌলতে সেই পথই বর্তমানে আসামে জি. টি. রোডে পরিণত হয়েছে। আমরা দু'জন চলেছি। সাহেবটা সামনে দিয়ে আসছিল। সে হয়ত ভাবছিল, আমরা সাইকেল থেকে নেমে হাত জোড় করে মাটিতে বসে পড়ব কিন্তু তা আমরা করিনি। পাশ দিয়ে চলছিলাম। সাহেবটা কেন একটু সরে গেল না, সেজন্য শৈলেন অনুযোগ করছিল ; কিন্তু সেদিনই বিকালের দিকে দেখলাম, একজন অসমীয়া সাইকেল থেকে নেমে সাহেবকে নমস্কার জানিয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। এই দেখে আমার স্ব-জেলাবাসী বন্ধুরা অসমীয়াদের প্রতি বিদ্রূপ-বাক্য নিক্ষেপ করতেন, তাদের এরূপ কিছু করতে নিষেধ করতেন। তাঁরা সে ভাব যদি না দেখাতেন, তাহলে শ্রীহট্ট জেলা আজ আর পাকিস্থান হ'ত না। এ সম্বন্ধে পরে অনেক কথাই বলব।

প্রথম দিন আমরা যে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেই গ্রামে

অসমীয়ার সংখ্যাই ছিল বেশি। একজন অসমীয়া সমাদর জানিয়ে তাঁর বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন। তাঁর নাম অরুণ গোস্বামী। তিনি বাংলা বেশ বলতে পারতেন। তাঁর ঔদার্য এবং আমাদের প্রতি দয়া দেখে মোহিত হয়েছিলাম। শর্মা, গোস্বামী এবং আরও কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমস্ত অসমীয়া-সম্প্রদায়ের শাসক অর্থাৎ তাঁদের বিধানই হল শাস্ত্র। এই প্রকার লোকের বাড়িতে সমাদরে গৃহীত হওয়াও সুখের কথা। অবশ্য তখনকার দিনে আমার গোত্র কেউ জিজ্ঞাসা করত না, চীনের কথাই সকলে জিজ্ঞাসা করত।

গোস্বামী মহাশয়ের পূর্বপুরুষ হয় নবদ্বীপ, নয় ভাটপাড়া হতে আসামে বসবাস করতে গিয়ে সেখানেই চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। পূর্বকালে কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া এবং দক্ষিণ-শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোকের বসবাস ছিল। গোস্বামী মহাশয় তাঁর পূর্বপুরুষের কথা এবং উপকথা বলে আমাকে তৃপ্ত করেছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অবয়ব দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁর শরীরে নব্বই পারসেণ্ট দ্রাবিড়-রক্ত এবং দশ পারসেণ্ট অসমীয়া-রক্ত। তাঁর ঠোঁট বেশ পাতলা, চোখ দুটো বড়, চিক্-বোন্‌টা কিছু উচ্চ। তাঁর স্ত্রী কিন্তু খাঁটি অসমীয়া বলেই মনে হচ্ছিল; অসমীয়া এবং দ্রাবিড়-রক্তের সংমিশ্রণে মানায় বেশ।

তখন নন-কোঅপারেশনের যুগ। সবাই জেলে যায়—গোস্বামী মহাশয়ও তিন মাস জেলে ছিলেন। এতে তাঁর গোঁড়ামি নষ্ট হয়েছিল। যাঁর বাড়িতে অন্য লোক গেলে পরিবার শুদ্ধ সকলে স্নান করে পবিত্র হতেন, সেই পরিবারে তখন যে কেহ খেতে পারত, উচ্ছিষ্ট কাউকে ফেলতে হ'ত না। গোস্বামী পরিবারের সামাজিক পরিবর্তন দেখে মহাত্মা গান্ধিকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম অন্তরে অন্তরে।

সন্ধ্যার পর সাইছুল্লা-ক্লিকের কথা উঠল। গোস্বামী মহাশয় সব দোষ বাঙ্গালীদের ঘাড়ে চাপালেন এবং কেন বাঙ্গালীরা দোষী,

তাও বুঝিয়ে দিলেন। শ্রীহট্টবাসীরা চাকরি যোগাড়ের জন্য সাইহুল্লাকে প্রাধান্য দিয়েছিল; যদি তা না হ'ত, তবে আসামে কংগ্রেস-মন্ত্রিত্ব গঠন হ'ত। তিনি চোখের সামনে দু'একটি নিদর্শন দেখিয়ে দিলেন।

গোস্বামী মহাশয় যা বলছিলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য। আজ যাঁরা শ্রীহট্টকে পাকিস্থানভুক্তির জন্য বড়দলইকে দায়ী করেন, তাঁরাই অনেক দিক দিয়ে শ্রীহট্টকে পাকিস্থানে ঠেলে দিয়েছিলেন— অবশ্য আকবর হায়দরীর চতুরতা যে তাতে ছিল না তা বলা চলে না। এসব হল আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

গোস্বামী মহাশয়কে যখন বুঝিয়ে দিলাম, আসামের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, আসামের অনেকগুলি জেলা নিয়ে বৃটিশ নূতন এক দেশের সৃষ্টি করতে চায়, তখন তিনি যেন গাছ থেকে পড়লেন! সুখের বিষয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে; গোস্বামী মহাশয় আমার কথা শুনে যেমন ভাবে হতাশ হয়েছিলেন, তাঁর সেই হতাশার অপসরণ হয়েছে।

২

আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হতে প্রবেশ করতে হলে সর্ব-প্রথমেই তিনসুকিয়া শহর পথের পাশে পড়ে। তিনসুকিয়াতে আমরা অতিথি হয়েছিলাম গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে। শহরের বিশেষত্ব ছিল। এখানে রেলওয়ে জংশন এবং ব্যবসায়ীদের আড্ডা ছিল। এখান হতেই সদিয়া-ফ্রন্টিয়ার জেলাতে পণ্য রপ্তানী হ'ত।

শহরে পৌঁছেই নিজের দুইজন গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হয়। একজন ব্যবসায়ী, অন্যজন পি. ডব্লিউ. ডি.-এর মুহুরি। তারা আমাকে পেয়ে সুখী হয়েছিল কিন্তু তাদের অসমীয়া-বিদ্বেষ এবং উক্তি আমার সহ্য হচ্ছিল না। পরের দিন স্থানীয় হাই ইংলিশ স্কুলে একটি লেকচার দেবারও বন্দোবস্ত হয়েছিল।

যাঁরা লেকচারের বন্দোবস্ত করেছিলেন তাঁরা সকলেই ঢাকা জেলার বাসিন্দা। অথচ শ্রীহট্ট জেলার লোক সেখানে বহু ছিল। ঢাকা জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে সকলেই ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের চালচলন, কথার পদ্ধতি অন্ততঃ আমাকে মুগ্ধ করেছিল, অথচ আমার জেলারই সুশীল সেন পনর বৎসরের ছেলে হয়ে পনরটা বেতের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন কলিকাতায়। সুশীল সেন অমর হয়েছেন নির্যাতনকারী শ্বেতাঙ্গকে নির্যাতন করে, কিন্তু তাঁরই স্বজেলাবাসী শিক্ষিত যুবকেরা চাকরির জন্য উন্মত্ত হয়ে যার-তার পেছনে হামলা করছে দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম।

এখানে 'প্রগ্রেসিভ স্টাডি ক্লাবে'র দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে ঘরোয়া বৈঠকে যোগদান করি। প্রগ্রেসিভ স্টাডি ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে বর্তমান কমিউনিষ্ট পার্টির অনেকেই ছিলেন। তাঁদের কাছে আমার প্রথম কথাই ছিল, চীনা সভ্যতা অথবা সোভিয়েট-রুশিয়ার আচার-ব্যবহার আমাদের সভ্যতার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না, অতএব চীন অথবা রুশকে অনুকরণ করে আমাদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অবতরণ করা মোটেই কাম্য নয়। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধিকেও মেনে চলা সম্ভবপর নয়। সভার সভ্যগণ আমাকেই প্রশ্ন করেন, "তবে কি করে আমাদের মুক্তি সম্ভব হতে পারে?"

সে যুগ আর বর্তমান যুগ এক নয়, অতএব পূর্বের কথা এখানে পুনরাবৃত্তি করা শুধু বাজে কথা হবে না, প্রকৃতপক্ষে হবে চালবাজি।

তিনসুকিয়ার মত স্টাডি ক্লাব আসামের আর কোথাও দেখতে পাইনি। প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সভ্যগণ কেন যে তিনসুকিয়াতে তাঁদের আড্ডা গেড়েছিলেন, তাঁরাই ভাল করে জানতেন। বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য তিনসুকিয়া তখনকার দিনেও যেমন নগণ্য স্থান ছিল, বর্তমানেও তদ্রূপই রয়ে গেছে।

তিনসুকিয়া হতে ডিব্রুগড় পর্যন্ত যে সদর রাস্তা গিয়েছে সেই রাস্তায় সাইকেলের উপর দাঁড়িয়ে হিমালয় পর্বতের শুভ্র শিখর দেখে শৈলেনের খুবই আনন্দ হয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল নিজেকে, বোধহয় আনন্দে চীৎকার করছিল, এটাই ছিল আমার ধারণা; কিন্তু আসলে সে হিমালয় দেখে আনন্দিত হয়নি, তার মনে যে গোপন তথ্য ছিল তার অনেকটা প্রকাশ করেছিল। আফজল খানকে হত্যা করে শিবাজী যতটুকু আনন্দ পেয়েছিল, শৈলেন সেই আনন্দের অপেক্ষায় ছিল; পরে বুঝতে পেরেছিলাম তার উদ্দেশ্য।

ডিব্রুগড় পৌঁছে আমরা ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে উঠি। তিনি ছিলেন অতি সদাশয় ব্যক্তি—কংগ্রেসের একান্ত ভক্ত। তাঁর ছেলে ডাক্তারী পেশা পরিত্যাগ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধির ডাক শুনে। এখানেও লেকচার দেই, শহরের লোক আমাকে নিয়ে বেশ হৈ-হল্লা করতে থাকে, যেন একটি পর্ব! আনন্দ করা ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না। এ ছাড়া আমার ভ্রমণ-কাহিনী বলার মধ্যে থাকত একটু রাজনৈতিক ছাপ। তার মানে, একটু দেশোদ্ধার হয়ে যাচ্ছিল।

ডিব্রুগড়ে চারদিন ছিলাম। পঞ্চম দিন সন্ধ্যার সময় শিবসাগরে পৌঁছি। এখানে আমি ব্যস্ত ছিলাম শিবসাগর দীঘি দেখতে, মন্দির দেখতে, অসমীয়া রাজাদের রাজধানী দেখতে এবং শৈলেন ব্যস্ত ছিল তার নিজের কাজে। কোথায় চলে যেত সে, ফিরে আসত ঠিক খাবার সময়। ভয়ে জিজ্ঞাসা করতাম না কোথায় গিয়েছিল।

এখানে দেখা হল এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে। তাঁর নাম জালালউদ্দিন হাজারিবন। খাঁটি অসমীয়া। নাক চেপ্‌টা, চুলগুলি চীনাদের মত, শরীরের রং পীত। বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে বসে অসমীয়া আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিলাম। সাইহুল্লার অভ্যুত্থানের সঙ্গে অসমীয়া মুসলমানদের

মধ্যে পর্দা-প্রথা প্রবেশ করেছে, হিন্দুদের সঙ্গে এক যোগে কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে মুসলিম লীগের সভ্য হতে বাধ্য করা হয়েছিল ইত্যাদি। জালাল পল্টনী লোক। সে রাজনীতির পাশ দিয়ে যেত না, বাড়ীতে ছুটিতে এসেছিল। সে ফিরে যাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে।

এখানকার অসমীয়া রাজাদের পুরাতন প্রাসাদ যাঁরাই দেখেছেন, তাঁদেরই বোধহয় বসে চিন্তা করতে হয়েছে। অসমীয়া রাজা এবং তাঁদের পুরাতন প্রাসাদ চিন্তাশীল পর্যটকদের চিন্তার উদ্রেক করে। এখনও যে দু'একখানা অস্ত্র এবং কারুকার্যখচিত প্রস্তর দেখতে পাওয়া যায়, তা দেখে মনে হয় না জিনিসটা ইদানীন্তন কালের। উপরন্তু বৃষ্টি ও উত্তাপের দেশে জিনিস তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। সে দিকটা না তলিয়ে যাঁরাই অসমীয়া সভ্যতার সমালোচনা করেছেন, তাঁরাই করেছেন ভুল। শিবসাগরের পুরাতন রাজপ্রাসাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কক, মৌল্মীন এবং উত্তর-বর্মার রাজপ্রাসাদের সাদৃশ্য রয়েছে। অসমীয়ারা যাই বলুন না কেন, আমার মনে হয় তাঁদের সঙ্গে থাইদের মত নিকট-সম্বন্ধ, অন্যান্য মংগোলিয়ানদের সঙ্গে তত নিকট-সম্বন্ধ নাই। নৃতত্ত্ব-বিদেরা ব্রাউন মংগোলিয়ান (Brown Mongolian) বলে কোনও শব্দের সৃষ্টি করেননি। আমিই এই শব্দ বার বার ব্যবহার করছি। আমার মনে হয় যাদের অষ্ট্রিক (দক্ষিণে) বলা হয়, তাদের যদি ব্রাউন মোংগোলিয়ান বলা হয় তবেই হবে ভাল। দ্রাবিড়দের অষ্ট্রিকের ভেতর কোনও মতেই আনা চলে না। যদি আনা হয় তবে আমি এখনই তার প্রতিবাদ করছি এবং সেটা মস্ত বড় ভুল।

দুইদিন কাটালাম শুধু পৌরাণিক তথ্য দেখে। অনেকেই আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছিলেন। তাঁদের নিরাশ করতে হয়েছিল নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে।

শিবসাগর হতে জোড়হাটের পথে দুইদিন কাটাতে হয়েছিল।

একদিন কাটিয়েছিলাম এক অসমীয়া জমিদার-বাড়িতে। অসমীয়া জমিদার এবং বাঙ্গালী জমিদারদের মধ্যে ঢের পার্থক্য। হাম্‌কি-তুম্‌কি মোটেই দেখতে পাইনি। জাতিভেদের পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য মোটেই লক্ষ্য হয় না। জমিদার-বাড়িতে যারাই আসছিল তারাই উপযুক্ত সমাদর পাচ্ছিল ; অন্ততঃ তুই তুমি, এই দুটি শব্দ জমিদারের মুখ দিয়ে বের হয়নি। আমারই সামনে এমন কতকগুলি বিষয় নিষ্পত্তি হয়, যা আমাদের জমিদার হলে প্রজার পক্ষে কত দুর্গতি ভোগ করতে হ'ত বলা শক্ত। যদিও কাষ্টইজম অসমীয়াদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং আরও প্রবেশ করেছে উৎকটরূপে, তবুও এর বিকট রূপ আমাদের মধ্যে যেমন করে প্রকটিত হয়েছে তেমন অসমীয়া সমাজে প্রকটিত হয়নি। অসমীয়ারা এক ঝাঁকানিতে জাতিভেদের বিকটত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারবে এটা আমার প্রবল ধারণা।

এর পরের দিন দেখা হল এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে, তিনি জঙ্গলে শিকার করেন। আমাদের পরিচয় পেয়ে তাঁর ক্যাম্পে নিয়ে গেলেন। সেখানে বন্য জীব শিকার হয়নি, তবে বন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করে তৃপ্ত হয়েছিলাম। আসামের জঙ্গল কিরূপ, সেদিন কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম।

জঙ্গল শুষ্ক ভূমিতে অবস্থিত। প্রায়ই উলু ঘাস। উলু ঘাসে যেমন করে বাঘ লুকিয়ে থাকে তেমনি লুকিয়ে থাকে সাপ। সাপ এবং বাঘের সমাবেশ যেখানে, সেই স্থান কত ভয়াবহ সহজেই বুঝতে পারা যায়। হাতীর উপর বসে শিকারে গিয়েছিলাম। একটি বুলেটও খরচ করতে হয়নি। হরিণ না হলে গভীর রাত্রে আর কোন্ পশুর দেখা পাওয়া যেতে পারে—তাও উলুবনে ? ফিরে এসেছিলাম রাত চারটার সময়। পরের দিনটা কেটেছিল শুধু ঘুমিয়ে।

জোড়হাট পৌঁছেই আমরা অতিথি হয়েছিলাম একজন

অসমীয়া ভদ্রলোকের বাড়ীতে। সেদিন তাঁর এক আত্মীয় সবে মাত্র জেল হতে ফিরেছিলেন। সেই যুবকের শরীর খুব দুর্বল ছিল, তিনি ক্রমাগত বমি করছিলেন। প্রাইভেট ডাক্তার তাঁকে শুইয়ে দিয়ে ঔষধের ব্যবস্থা করেছিল। জেলখানার অত্যাচারে যুবকের এই অবস্থা! আমার চোখে, এটাই বোধহয় সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দুর্ঘটনা।

শৈলেন তো এই দেখেই লাফিয়ে উঠেছিল। "হারামজাদা বৃটিশ!" বার বার বলছিল সে। আমি কিছুই বলিনি। চীনদেশে পশুপ্রকৃতির লোক চিয়াং কাইসেকের অনেক অত্যাচারই দেখেছিলাম বলে একটু দুঃখ হয়নি। চীনদেশে জেলে নিয়ে অত্যাচার করা ত মামুলী কথা। যে দেশে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করেছিল চিয়াং কাইসেক, সে দেশের অত্যাচারের সঙ্গে ভারতে বৃটিশ অত্যাচার মামুলী। যুবক আইন-অমান্য করেছিলেন, সেজন্য পুলিশ সর্বপ্রথম তাঁকে বেশ করে উত্তম-মধ্যম দিয়েছিল, তারপরে জেলে পাঠিয়েছিল। সেখানে ডাক্তার ছিল, ঔষধ ছিল, কিন্তু রোগীর আরামের ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের দেশই হল অপরূপ। মহাত্মা গান্ধির আদেশ মেনে অনেক যুবক-যুবতী অকালে পক্ককেশে পরিণত হয়েছিল। অসহযোগ আইন-অমান্য আন্দোলন ছিল খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতার কারণ, কেউ যেন তা মনে না করেন। কারণ যা ছিল, দরকার হলে অকারণেও একদিন বলতে বাধ্য হব, আপাততঃ বিষয়টি স্থগিত থাক্। হাজারো হউক রাষ্ট্রনীতি বুঝি, বিদেশের সংবাদ কিছুটা রাখি, অতএব সময় মত সবই বলার ইচ্ছা রাখি।

একদিন একটি পর্ণকুটীরে একজন অসমীয়াকে হুঁকোয় তামাক খেতে দেখে তার হুঁকোটা চাইলাম। সে দিলে না, দিলে কলকিটা। কলকিতে তামাক খাওয়ার অভ্যাস শুধু যজ্‌মানী ব্রাহ্মণ

এবং মুসমানদের মধ্যেই দেখেছিলাম ; চিলিম ধরে কখনও তামাক খাইনি। দ্বিতীয়ত ছোটবেলা হতেই আমি জাতিভেদ মানতাম না, এমন কি মুসলমানের সঙ্গেও না। ডাণ্ডার শক্তি যার যত বেশি তার কাছে সামাজিক আইন তত নরম। ডাণ্ডার জোর ছিল, সেজন্য সমাজ ছিল আমার অথবা আমাদের পদানত, আমরা সমাজের পদানত ছিলাম না। যা করেছি, তাই ছিল আমাদের সামাজিক নিয়ম।

কলকেটা বুট্ দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নদী পার হবার জন্য নদীতীরের কুঁড়ে ঘরটাতে বসে থাকলাম। কতক্ষণ পর খেয়ানী এসে নদী পার করে দিল। তাকে উপযুক্ত মজুরী দিয়ে ওপারে গিয়ে আর একটা কুঁড়ে ঘরে বসতে হল। শৈলেন বল্লে, সে খাবে। দই, চিঁড়া, গুড় এবং কলা ছিল সেখানে। শৈলেন খুব খেলে, আমি খেলাম না। বার বার নিজের গ্রামের কথা মনে হচ্ছিল দই-চিঁড়া দেখে।

সেদিন ইচ্ছা করেই একজন কংগ্রেসীর বাড়ীতে উঠলাম। কংগ্রেসী জেল-ফেরতা, অতএব উদার। তাঁর জাত জেলেই চলে গিয়েছিল, সেজন্য তিনি কারো জাত জিজ্ঞাসা না করেই তাকে খেতে দিতেন। কংগ্রেসী ভদ্রলোক বলছিলেন, স্বাধীনতা পেলে একদিনে জাতিভেদ উঠিয়ে দেবেন। কই, কিছুই ত গেল না, তবে কি আমরা স্বাধীনতা পাইনি ?

এদিকের মাটি বড়ই সুন্দর। গরমের সময়ও সকাল-বিকালে শীতল স্নিগ্ধ বাতাসের অভাব হয় না। যেদিকে দৃষ্টি যায়, সর্বত্র সবুজ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। পথ চলার সময় বড় বড় সাপ পথের উপর দেখা যায় কিন্তু ভয় করতে নাই। তাড়া করলেই পালিয়ে যায়। সাপ বোধহয় মানুষকে জানে। ছোট্ট একটা মানুষ একটা অজগর সাপকে তাড়া করলে পালায় কেন ? অথচ মানুষের চেয়েও বড় বন্য জীব হরিণ, গরু, শূকর ধরবার জন্য সে ওৎ

পেতে বসে থাকে। কয়েকটা অতিকায় সাপের শরীরের ছাপ এদিকে দেখতে পেয়েছিলাম। বাঘ যে নাই, বলা চলে না ; কিন্তু বাঘ দেখতে পাইনি একটিও।

এদিকের নদীগুলি অতীব গভীর এবং স্রোত প্রখর। নদীতে বাস্ উঠিয়ে যাঁরা বাসে বসে থাকেন অথবা মোটরে বসে থাকেন, তাঁদের আমি বোকা বলব। নৌকা যদি ডুবে যায় তবে মোটর-আরোহীর সন্ধান পাওয়া যাবে না। আমাদের সঙ্গে যাঁরাই মোটরে পার হতেন, তাঁদের মোটরে বসতে দিতাম না। অসমীয়া ভদ্রলোকেরা আমাদের আদেশ মান্য করতেন। আমার স্বজাতি বাঙ্গালী ভায়ারা বলতেন, "এটা আপনার মোটরকারও নয় এবং ফেরীবোটও সরকারী, অতএব আপনার বলার মত কিছুই নাই।" আমরা কিন্তু এসব কথা মানতাম না। মোটর হতে যাত্রীকে নামিয়ে দিতাম এবং বলতাম, "আপনাদের মৃত্যু দেখে আমরা সুখী হব না। নদীর ওপারে যেয়ে মোটরও আপনার, পথও সরকারের, যা ইচ্ছা তাই করবেন।" এতে অনেকে অসন্তুষ্ট হতেন।

শৈলেন বলত, দেখলেন ত ঝাণ্ডা এবং ডাণ্ডার শক্তি কত ? ঝাণ্ডা মানে পোশাক, ডাণ্ডা মানে হাতের শক্তি। শুধু শক্তিতে কিন্তু কিছুই হয় না, ঝাণ্ডারও দরকার। আমি আমাদের দেশের অবস্থা ভাল করে জানতাম না, সেজন্যই শৈলেনের কথার প্রতিবাদ করতাম না। এখন দেখছি শৈলেনের কথাই ঠিক, আমাদের দেশে ঝাণ্ডা এবং সেই সঙ্গে ডাণ্ডার অতীব দরকার। চীনদেশেও তার কতকটা আভাস পেয়েছিলাম। এ্যান্টি-জাপানী মুভমেণ্ট যারা চালাত, তারা ব্যবসায়ীদের প্রথমে বলত, জাপানী মাল এনে মুনাফা করবেন না। অনুরোধে যখন কাজ হত না তখন দরকার হত ডাণ্ডার। হ্যাণ্ড-গ্রেনেইটরূপী ডাণ্ডা বেশ কাজ করত।

তবে চীনের অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের নিকট-সম্বন্ধ নাই এবং ছিলও না। যাঁরা বলেন চীনের সঙ্গে আমাদের নিকট-সম্বন্ধ,

তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের দেশে জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা থাকাতে একের মৃত্যুতে অন্যে সুখী, একের জাহান্নামে পৌঁছনে অন্যে করতালি দেয়। এখানে কথাটি সংক্ষেপে সমাপ্ত করতে বাধ্য হলাম। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব।

অসমীয়ারা যখন দলে দলে কারাবরণ করছিল তখন বাঙ্গালী এবং অসমীয়া মুসলিমদের একেবারে নির্বাক থাকতে দেখেছি। বাঙ্গালী এবং অসমীয়া সরকারী কর্মচারীরা অসমীয়া গান্ধিবাদীদের দুর্দশা দেখে তৃপ্ত হত, এও বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। আমাদের দেশে শুধু সাম্প্রদায়িকতা অথবা জাতিভেদের কালো ছায়া মানুষের মন বিষাক্ত করছে না, আমাদের দেশের ধনীরা পৃথিবীতে যত ধনী আছে, তাদের সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট মনোভাবাপন্ন। জন্মান্তরবাদই তার প্রধান কারণ।

এদিকে পাটনী শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বেশি। পাটনীরা মিশ্রিত জাত। ব্রাউন এবং পীত জাতের সংমিশ্রণে এদের বেশ নূতনত্ব হয়েছে। ক্রমেই পীতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ব্রাউন যদি পুরুষ হয়, স্ত্রীলোকটি হয় পীত; তবে ছেলেমেয়ে সবই পীত হয়। আবার পীত যদি বাবা হয় এবং মা হয় ব্রাউন, তবুও ছেলেমেয়ে সবই পীত হয় দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে আসামে ক্রমেই পীতবর্ণের লোকের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে। ভবিষ্যতে বাদামী রং-এর লোক আসাম এবং বাংলাদেশের কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। পাটনীরা বড়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং অতিথিপরায়ণ। আমরা ইচ্ছা করেই এক পাটনীর গৃহে অতিথি হয়েছিলাম। এদের ঘর সব সময় নিকানো-পুছানো থাকে। থালা ঘটিবাটি ঝক্‌ঝক্ করে। দুঃখের বিষয়, এরাও আমাদের মতই জল ফুটিয়ে খায় না। তার ফলে মাঝে মাঝে গ্রামকে গ্রাম কলেরায় আক্রান্ত হয়ে নির্বংশ হয়। পথে অনেক নির্বংশ গ্রাম দেখতে পেয়েছিলাম। পাটনীর বাড়ি হতেই আমরা শীলঘাটে পৌঁছি। আমাদের গন্তব্যস্থল তেজপুর।

৩

ওপারে দাঁড়াতে হয়েছিল অনেকক্ষণ। সামনে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদী। নদীর জল গভীর। অনেকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। আমি নদীর জলের দিকে চেয়ে ছিলাম। নদীর স্রোত দেখে একবারও মনে হয়নি যে, এখানেও বান ডাকতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে নদীর গভীরতা সমুদ্র-সমতল (sea-level) হতেও নীচে। প্রাকৃতিক নিয়মমতে নদীর জল যে কেমন করে বিপরীত দিকে যেতে বাধ্য হয় এই তথ্যই বুঝবার চেষ্টা করছিলাম।

চিন্তায় বাধা পড়ল। পাটনী ডাক দিয়ে বল্ল, "চল কে কে ওপারে যাবে ?"

আমরা সাইকেল-সমেত নৌকোয় উঠলাম। অনেক লোক উঠল। নৌকো বোঝাই হয়ে গেল। অনেকে ভীত হয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করল। শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি ঈশ্বরের নাম নিলে না কেন ?" শৈলেন বল্লে, "আমি ত কাপুরুষ নই। নৌকো যদি ডুবে যায় সাঁতরাবার চেষ্টা করব, হয়ত ওপারেও যেতে পারব।"

আমরা ওপারে পৌঁছলাম। নৌকোয় উঠেছিলাম সকলের আগে, নামতে হল সকলের শেষে। নৌকো হতে নেমেই নদীতীর দিয়ে যে বড় রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে, সেই পথে চল্লাম। কতকক্ষণ যাওয়ার পর একটি হোটেল পেলাম। বেশ ভাল হোটেল। থাকবার জন্য কিছুই দিতে হ'ত না। চার আনা করে প্রত্যেক বারের খাবারের দাম দিতে হ'ত।

হোটেলের ম্যানেজার দুইখানা চৌকি দেখিয়ে দিলেন। আমরা আমাদের মামুলী বিছানা পেতে স্নান করে এলাম। উত্তম খাদ্য বলতেই হবে। বিকালে শহর বেড়াতে বের হলাম। শহরটা দেখে মনে আনন্দ হল। একেবারেই অস্থায়ী শহর। একখানাও ইঁটের বাড়ি দেখতে পেলাম

না। নদীর ভাঙ্গনের ভয়ে ভীত হয়ে কেউ পাকা বাড়ি তৈরী করে না। বাঁশ, বেত আর উলু ছন, এই তিনটি জিনিস দিয়ে শহরের বাড়ি-ঘর তৈরী। সজীবতা সর্বত্র লক্ষ্য হচ্ছিল। উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, কেরাণী, এঁরাই ছিলেন বেশ মোটা উপার্জনকারী ; তারপর ব্যবসায়ীরা। এখানেও মধ্যবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অনেক উন্নত বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু ভেতরে ভেতরে ব্যবসায়ের একচেটিয়া আধিপত্য অর্জন করছিল জয়পুরীরা। দেখে মনে হয় না যে, তারা ধনী, অথবা ভেতরে ভেতরে এতদূর এগিয়ে গেছে।

আমাদের যিনি সর্বপ্রথম অভ্যর্থনা করলেন তিনি একজন জয়পুরের বাসিন্দা ; কিন্তু বাঙ্গালী অথবা অসমীয়া হয়ে গেছেন বল্লে দোষ হয় না। তাঁর বিরাট শরীরই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তিনি ভিন্ন প্রদেশ হতে এখানে একজন নবাগত মাত্র। তিনি ইংরেজী বেশ ভাল জানতেন। কথা-প্রসঙ্গে চীনের কথাই উঠল। চীনের অবস্থা জানবার জন্য উৎসুক হলেন। এই ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী এবং অসমীয়াদের সঙ্গে সুপরিচিত হবার সুযোগ হয়ে গেল। লক্ষ্য করেছিলাম, এখানে যাঁরা স্বদেশী করতেন, তাঁরা একেবারে আনাড়ী, বিদেশের সংবাদ মোটেই রাখতেন না। 'বৃটিশকে তাড়াও' শুধু এই পর্যন্তই জানতেন। এর বেশি ওঁদের চিন্তা করারও ছিল না। কিন্তু কেমন করে তাড়াতে হবে, তাড়াতে যদি পারা যায় কেমন করে ভবিষ্যতে দেশের এবং দশের উন্নতি করতে হবে, তার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। শুধু 'তাড়াও আর তাড়াও !'

এখানে অনেকগুলি খুলনাবাসীর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা প্রায়ই আই. বি. বিভাগের লোক ; এবং যে পদ্ধতিতে এঁরা কাজ করে যাচ্ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল, তেজপুরের শাসন-ভার যেন তাঁদেরই উপর ন্যস্ত করা হয়েছে! তাঁরা সর্বদাই

সকলের সঙ্গে কথা বলার জন্য উৎসাহী অথচ কথার ফাঁকে কিছু গোপন তথ্য জানা যায় কি না এটাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। অসমীয়া-বাঙ্গালী পার্থক্য এখানে পূর্বে ছিল না; কিন্তু আই. বি. মহাশয়েরা বাঙ্গালী-সমাজকে অসমীয়া-সমাজ হতে পৃথক করে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। কলিকাতায় পৌঁছেও দেখছিলাম আচার্য পি. সি. রায়ের মত লোকও পূর্ব এবং পশ্চিম-বঙ্গের সমস্যার প্রাধান্য প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান নিয়েই আলোচনা করতেন কিন্তু তাঁর আশেপাশে কতকগুলি 'ফেউ' থাকত, তারাই তাঁর পবিত্র মনে বিষের ইন্‌জেকশন দিয়ে দিত। ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব তখনই তৈরী হয়েছিল। এই রকম প্রাদেশিকতা যে বৃটিশের রাজনৈতিক চাল, তা কেউ বুঝত না, বুঝবার চেষ্টাও করত না।

দ্বিতীয় দিনই একটি লেকচার দিয়েছিলাম। চীনের বিষয় উদ্ধৃত করে বলেছিলাম, "চীনের স্বাধীনতাকামী যুবক-যুবতীরা কিন্তু প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দিচ্ছে না অথচ চীনের শয়তান প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইসেক বৃটিশের অনুকরণে প্রাদেশিকতা ও বুদ্ধ-ইসলাম প্রভৃতি অনেক রকম সমস্যার সৃষ্টি করেছে।" তারপর বলে ফেল্লাম, "মুষ্টিমেয় কয়েকজন আই. বি. বিভাগের লোক কেমন সুন্দর করে প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করছে তা কি আপনারা লক্ষ্য করছেন না? আপনাদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতি করছেন, তাঁরা স্বদেশ এবং বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবেন। আপনারা সংবাদ পান শুধু রয়টারের মারফতে, রয়টার যে আমাদের কত সংবাদ হতে বঞ্চিত করছে সে খবর আপনারা রাখেন কি?"

এই লেকচারের পরই আমার প্রতি আই. বি. বিভাগের খরদৃষ্টি পড়ল। তাতে একটুও দুঃখিত হলাম না। আবার বিদেশে যেতে পারবই তাই ছিল আমার ধারণা।

বিকালে লেকচার দিয়েছিলাম। লেকচার দেবার পরই বুঝতে পারছিলাম এখানে আরও কয়েকদিন থাকা খারাপ হবে। লেকচার হতে ফিরে এসে শৈলেনকে যখন সকল কথা বুঝিয়ে বল্লাম, তখন শৈলেন বল্লে, "প্রকাশ্যে এই ধরনের লেকচার দেবেন না। আমি যাদের নিয়ে আসব তাদের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলবেন। এ ছাড়া ভূত-প্রেত ডাকাত-সাপ এবং বাঘের কথাই বেশি বলবেন। দেখবেন তাতেই লোক সন্তুষ্ট হবে।"

শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি এখানে কাউকে চেন কি?"

"নিশ্চয়, দুই একজনকে চিনি বই কি এবং আপনি যেখানে যাবেন সর্বত্রই আমি কিছু লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, তাদের সঙ্গেই মন খুলে কথা বলবেন।" শৈলেনের কেরামতি ছিল বলতেই হবে।

তেজপুরে ছিলাম চারদিন। চারদিনের মধ্যে চারজন মুসলমানের সঙ্গেও দেখা করতে সক্ষম হইনি। অথচ মাঞ্চুরিয়া, সাংটাং, কোয়াংটাং প্রভৃতি চীনের বড় বড় প্রদেশ চীনা মুসলমানদের সঙ্গে রোজই কথা বলতাম। তাদের উন্নত চিন্তাধারাকে প্রশংসা করতাম। আর নিজের দেশের নিজের জাতের মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়াতে অন্তরে কত ব্যথা পেয়েছিলাম বলবার নয়।

পঞ্চম দিন সকালে আবার নদীতীরে এলাম। আমার সঙ্গে যারা এসেছিল, তারা ছিল আই. বি. বিভাগের লোক। তারা দেখতে এসেছিল, আমি শহর ছাড়লাম কি না। নদীতীরের আকাশ ছিল শুদ্ধ মুক্ত, বাতাস বইছিল মৃদু মৃদু। বেশ আরাম লাগছিল; কিন্তু পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ছিল ত্রিশ টাকার গোলাম। ত্রিশ টাকাতে মানুষের মনের গতি এত পঙ্কিল কি করে হতে পারে তাই ভাবছিলাম।

সিঙ্গাপুরে যখন ছিলাম তখন মনে পড়ে গৌরীশ একদিন বলেছিল, "মনে রাখবেন বিশ্বাস মশায়, আমাদের মধ্যে এখনও

রয়ে গেছে কাল্পনিক মধ্যবিত্ত অহঙ্কার; সেইজন্যই আমরা পরিশ্রম-সাধ্য কাজ যারা করে তাদের ঘৃণা করি।"

গৌরীশদের বাড়ির কাছে ছিল অনেকগুলি কৃষক। তারা শুধু পানের চাষই করত এবং পান বিক্রি করে বিত্তশালীও হতে পেরেছিল। গৌরীশ তাদের ঘৃণা করত, সেই ঘৃণা তখনও তার মনে ছিল। সেই ঘৃণাকে অপসরণ করার জন্য সিঙ্গাপুরে থাকার সময় গৌরীশ কাজ নিয়েছিল ডকের মজুরী। মাত্র সাড়ে সাত আনা মজুরীতে আট ঘণ্টা কাজ করত। আমাদের দেশে এখনও যারা কাল্পনিক মধ্যবিত্তসম্পন্ন মনোবৃত্তি বজায় রাখছে, তারা যদি কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেবার ইচ্ছা রাখে তবে তাদের প্রথম কাজ হবে—হয় কৃষকের দলে, নয় ত মজুরের দলে মিশে মজুরী করা, তারপর রাজনৈতিক কাজে অগ্রসর হওয়া। তা না হলে রাজনৈতিক বুদ্ধি অর্জন করা অসম্ভব। আবার বলছি, নিশ্চয়ই অসম্ভব।

নদীর ওপারে এসে নওয়াগাঁ-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। পথ বড়ই সুন্দর। নদীতীর দিয়ে আমরা চলছিলাম। নদীর স্নিগ্ধ বাতাস আর দুই দিকের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মোহিত করে ফেলেছিল। কবি-কবি ভাব হয়েছিল; কিন্তু কবিতা লেখার যেমন কল্পনাও করতাম না, তেমনি কবিদের কবি-কবি ভাবও পছন্দ করতাম না। আসল কথা হল, সাইকেলের ফ্রি-হুইল আপনি ঘুরছিল, আমরা চলছিলাম নীচের দিকে। পথে অনেকবারই নদী পার হতে হয়েছিল। কোথাও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়নি।

এদিকে অসমীয়াদের মধ্যে আফিং-এর প্রচলন বেশি, সেইজন্য আরও নিরাপদ ছিলাম। আফিং যারা খায় তারা প্রাণান্তেও রাজদ্রোহ করে না। আফিং পেলেই হল। আসামের যে সকল অসমীয়া আফিং খেত, তারা চীনদের মত শুধু আফিংই খেত না, সেই সঙ্গে ভাগ্যের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করত।

চীনারা ভাগ্য মানত না বলেই স্বাধীন হতে পেরেছে। আমাদের দেশের 'ভাগ্য' চীনদেশের আফিং হতেও মারাত্মক এবং হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন। অসমীয়াদের মধ্যে দুই রকমের আফিং প্রচলন দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম।

নওয়াগাঁ পৌঁছে আমরা আর একজন অসমীয়া কংগ্রেসসেবীর বাড়িতে উঠেছিলাম। ভদ্রলোক বাস্তবিকই ভদ্র। তাঁর বাড়ির আশেপাশে যে সকল বাঙ্গালী ছিলেন তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কিন্তু অসমীয়াদের আচার-ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। অসমীয়াদের খাদ্য-প্রণালী ক্রমেই বাঙ্গালী প্রথায় পরিণত হচ্ছিল। আসলে তাদের খাদ্য-প্রথা যে থাই-প্রথা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তা বুঝতে পেরেছিলাম। থাইদের ভাত রান্না করাই সবচেয়ে বড় কাজ। ভাত রান্না হয়ে গেলে তরকারীর জন্য চিন্তা করতে হয় না। ভোজন ব্যাপারে আমাদের চিন্তাধারা একেবারে বিপরীত। আমরা ভাতের সঙ্গে কি খাব চিন্তা করি বেশি। এটা কিন্তু খারাপ নয়। মানুষ যতই উন্নতি লাভ করছে ততই প্রধান খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে উপকরণ-খাদ্যের উপর নির্ভর করে বেশি। দুঃখের বিষয়, যেভাবে আমরা উপকরণ-খাদ্যের উপর ঝুঁকে পড়েছি, সেই রকমে কিন্তু আমরা উনুন গঠনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি না। এখনও আমরা প্রিমিটিভ প্রথা মতেই উনুন রেখেছি। এটা আমাদের সামাজিক প্রথার চরম দুর্গতি বলতেই হবে।

নওয়াগাঁ-এর অবস্থিতি এবং আবহাওয়া চমৎকার। এখানে ইউরোপীয়ান প্রথায় বাড়ি-ঘর তৈরী করে আনন্দের সহিত বসবাস করা যেতে পারে।

তিনদিন নওয়াগাঁ বাস করে চতুর্থ দিন আমরা কামরূপের কামাখ্যা দেবীর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। পথে অনেকগুলি অসমীয়া-মুসলিমের সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা অনেকেই তাঁদের

বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন কিন্তু সেই দিনই আমরা কামাখ্যা দেবীর মন্দির দেখতে যাব শুনতে পেয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, হিন্দু প্রথায় যে ছুৎমার্গ আছে, অথবা অন্যান্য যে সকল কুসংস্কার আছে, আমার মন হতে তা দূর হয়নি। শুধু তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য যাঁরাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে ভাত এবং চা খেয়ে খুশী করেছিলাম।

কামাখ্যা দেবীর বাড়ির পাশ দিয়ে আসাম ট্রাঙ্ক রোড গৌহাটির দিকে চলে গেছে। আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে সাইকেল ইত্যাদি রেখে কামাখ্যা দেবীর মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দির নূতন। মীর জুমলা এই মন্দির ভেঙ্গেছিলেন। রাজা শিব সেই মন্দির পুনর্গঠন করেন। মন্দিরের কোথাও কোন প্রতিমা দেখতে পাইনি। একস্থানে একটি যোনি দাঁড়া করে রাখা ছিল। গর্তটাতে শ্বেত চন্দন দিয়ে ভর্তি করে রাখা হয় এবং যখনই কোন যাত্রী যায় তাকে একখানা শ্বেত চন্দনের টুকরা দেওয়া হয়। পুরোহিত ঠাকুর সেইজন্য এক টাকা সোয়া পাঁচ আনা দাবী করেন। সকলেই তাঁর দাবী রক্ষা করে।

মন্দির হতে বেরিয়ে আশীর্বাদস্বরূপ নেকড়া ফেলে দিলাম।

শৈলেন জিজ্ঞাসা করলে, “ফেলে দিলেন কেন নেকড়াখানা ?”

তাকে কিছুই বল্লাম না। পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত লিঙ্গপূজার প্রচলন আছে, শুধু আসামের থাই-শ্রেণীর লোক এখনও যোনির পূজা করে। আর কিছু না হউক, মাতৃজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা যেমন ছিল এখনও তেমনি রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে যদি ঈশ্বরের নাম করে লিঙ্গ উপাসনা করা যেতে পারে, তবে মাতৃজাতির উপাসনা কামাখ্যা মন্দিরেও করা যেতে পারে। উভয় পূজাই কিন্তু একই চিন্তাধারা হতে উৎপন্ন। অতএব মহাম্মদ, যিশু, শঙ্কর, এঁদের মধ্যে চিন্তাধারা বেশি উন্নতি লাভ করেনি। বরং বুদ্ধ এবং কন্‌ফিউসাস পিতৃপূজা অথবা মাতৃপূজার কোনরূপ প্রস্তাবনা

দেননি, তাঁরা বলেছেন মানুষের সেবা। এর মধ্যে কন্‌ফিউসাস যদিও কারো পূজার আদেশ দেননি তবুও মাতৃজাতির প্রতি তাঁর অনেক অবিচার দেখা যায়। সেই হিসাবে যীশুখৃষ্ট বড়ই উদারতা দেখিয়েছেন। তাঁর উপদেশাবলী অনেকটা থাইদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের সঙ্গে যায় মিলে। অবশ্য মহাম্মদ, যিশু এবং শঙ্কর জন্মান্তরবাদের যে সকল কথা বলেছেন, থাইরা সেরূপ কিছু বলেন না। সেদিক দিয়ে কামাখ্যা মন্দিরের পেছনে যে চিন্তাধারা, তা প্রিমিটিভ চিন্তাধারা হতে অনেক উন্নত। দুনিয়ার মানুষ ক্রমেই উন্নতি লাভ করছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে; তখন আদি যুগের জন্মান্তরবাদ, ভেস্ত, দুজগ, এসব হবে হাস্যকর বিষয় এবং সেজন্যই এই বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্বে আমরা গৌহাটি পৌঁছি এবং একটি বাঙ্গালী হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করি। দুইদিন পরই দেখা হয় ৺সরুয়ার সঙ্গে। তিনি ছিলেন গৌহাটির আইন কলেজের প্রিন্সিপাল। একজন শিক্ষিত লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে কত যে আনন্দিত হয়েছিলাম তার আর অবধি নাই। তিনি আরও কয়েকজন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে গোস্বামী এবং শর্মাই প্রধান।

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের কথাই প্রথম সমালোচনা হয়, সেই সঙ্গে হয় মাতৃপূজার কথা। পৃথিবীর সর্বত্র মাতৃপূজা হ'ত শর্মা প্রমাণ করে দিলেন, তারপর আরম্ভ হয়েছিল পশুপতির পূজা—অবশ্য আমার ধারণা, আমাদের দেশেও তাই হয়েছিল। মা এবং মাতৃস্নেহ এই দুটার মধ্যে নিশ্চয়ই মা প্রথম, তারপর মাতৃস্নেহ। যে মায়ের মাতৃস্নেহ নাই, সেই মায়ের সন্তান বাঁচতে পারে না। মাতৃস্নেহবিহীন অনেক মা দেখা যায়। আমরা সেরূপ মায়েদের দেখতে পাই সামাজিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। সজল নয়নে মা সন্তানকে ডাস্টবিনে ফেলে যেতে বাধ্য হন। এটা হল সভ্য

সমাজের কথা। অসভ্যদের মধ্যে এখনও অনেক কিছুটা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলছি, আরব দেশের জিপসীদের কথা।

যখনই কোন আরব কোনও জিপসী মেয়েকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বে বিয়ে করে, তখনই তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। প্রথমতঃ জিপসী মা তার সন্তানকে বাঁচতে দেয় না; দ্বিতীয়তঃ স্বামীকেও হত্যা করার সুযোগ পেলে সে হত্যা করে। এটাও প্রায় সভ্য সমাজেরই বিষয় বলা যেতে পারে; কিন্তু যারা একেবারে অসভ্য, তাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কোনও পুরুষ, কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে হঠাৎ সহবাস করার ফলে যদি কোন সন্তানের জন্ম হয় এবং সেই পুরুষের প্রতি যদি স্ত্রীলোকের ঘৃণা থাকে, তবে সেই শিশুকে না খেতে দিয়ে মা মেরে ফেলে দেয়। যাকে ঘৃণা করা হয় তার ঔরসজাত সন্তানের বাঁচবার অধিকার অসভ্য মা ছিনিয়ে নেয়। এই প্রকারের শিশুহত্যা হতে মায়েদের নিবৃত্ত করার জন্য পূর্বকালে মাতৃপূজার ব্যবস্থা ছিল। পরে ধীরে ধীরে যখন মায়েরা স্বামীর অধীনতা স্বীকার করতে থাকল তখন পুরুষ-দেবতার সৃষ্টি হতে থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, পশুপতিনাথ শিবলিঙ্গ ইত্যাদি। তবে শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে আমার এখনও সন্দেহ আছে। মায়েরা হয়ত মাতৃপূজার পূর্বেই শিবলিঙ্গের আরাধনা কল্পনা-বলে করতেন। কল্পনা করার কি দরকার ছিল? পুরুষ কি তখন ছিল না। নারী কি প্রকৃতির প্রথম অবদান? পুরুষ ছাড়া কি কোনও প্রাণীর জন্ম হতে পারে না? এই প্রকারের আলোচনায় দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল।

গৌহাটিতে শুধু বাঙ্গালী আই. বি. বিভাগই প্রাদেশিকতার বীজ ছড়াচ্ছিল না, অসমীয়া-মুসলিমও যোগ দিয়েছিল। সাই-ফুল্লার প্রথম নম্বরের কেন্দ্র ছিল গৌহাটিতে। অসমীয়া-মুসলিমরা বড়ই সুন্দরভাবে প্রাদেশিকতার বীজ ছড়াচ্ছিল। তারা বেশি

কথা বলত না। প্রায় কথার শেষেই বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে দুই-একটি কথা বলত। আমার প্রিয় বন্ধু গোস্বামী মহাশয় পানবাজারে থাকতেন। অতি আগ্রহ করে তিনি কয়েকজন অসমীয়া-মুসলিমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আমাকে নিয়ে যান। বেশ আরামদায়ক কথা চলছিল, হঠাৎ একজনের মুখ হতে বের হয়ে পড়ল, "সবই ভাল কিন্তু এ যে আসলি বাঙ্গালী, শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের বাসিন্দা।"

শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ সাব ডিভিসনের দুইদিকে ময়মনসিং জেলা, আর একদিকে ত্রিপুরা জেলা। কথ্য ভাষার সঙ্গে এই দুই জেলার সঙ্গেই হবিগঞ্জবাসীর নিকট-সম্বন্ধ। গোস্বামী মহাশয় কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে অন্য কথা আরম্ভ করলেন। এই প্রকারের প্রাদেশিকতার বিষ বৃটিশ সরকার নানা রকমের এজেন্সির মারফতে ছড়াচ্ছিল।

প্রাদেশিকতার বিষে অনেক নরনারী আক্রান্ত হয়েছিল। তারাও কিন্তু স্বদেশী অথচ তারা কখনও তলিয়ে দেখত না স্বাধীনতা পাবার জন্য যাঁরা চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা কি চান এবং কেনই-বা অকাতরে কারাবরণ, নির্যাতন বা ফাঁসি বরণ করে নিচ্ছেন! বাস্তবিক পক্ষে স্থানীয় বিষয় এবং পরিবেশের দিকে মোটেই কারো দৃষ্টি ছিল না।

এর পেছনে ছিল না কৃষক, এর পেছনে ছিল না মজুর। তখনও 'চাষাটা, মজুরটা' এই প্রকার কথারই ছিল রেওয়াজ। আমি আর পারলাম না সহ্য করতে, মন একেবারে পরিবর্তন করে ফেলে নূতন করে নিজের দেশ দেখতে প্রবৃত্ত হলাম। সোভিয়েট-রুশিয়ার সংবাদ অনেকেই মামুলীভাবে শুনেছিলেন কিন্তু কিছুই বিশ্বাস করতেন না। 'ভাগ্য' এবং 'ভগবান' এ দুইটা যেন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে চেপে বসেছিল! বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করার মতও শক্তি কারো ছিল না।

গৌহাটি ছাড়বার সময় হয়ে গেল। আমরা গৌহাটি ছেড়ে কেরাণীগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলাম। শিলং-এর অপর নাম কেরাণীগঞ্জ, যে শহরে আমার স্বজেলবাবাসী তখন প্রবল বিক্রমে রাজত্ব করছিলেন। একদিনেই আমরা শিলং পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলাম। চিন্তার বিষয় ছিল, থাকি কোথায়? হোটেলে থাকার মত টাকা ছিল না। আমার স্বজেলাবাসী কেরাণী মহাশয়েরা বড়ই গোঁড়া। তাঁরা আমাকে তাঁদের বাড়িতে থাকতে দেবেন না, তার একমাত্র কারণ, আমার জাত ছিল না। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষটায় আমার বন্ধু কেতকী দেবের আশ্রমে উঠলাম।

কেতকী রামকৃষ্ণ-মিশনে যোগ দিয়ে স্বামী হয়েছিল। সে জাতের বিচার করত না। যদিও তার জাতের বিচার ছিল না, তবুও তার মন হতে কুসংস্কার যায়নি। সে জানিয়ে দিল আমাকে রান্না করতে হবে। আমি রাজি হলাম না। তাকে আমিও জানিয়ে দিলাম, ভ্রমণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করে খাব না। অবশেষে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-হোটেলে খাবারের বন্দোবস্ত হল এবং থাকলাম তারই আশ্রমে।

শৈলেন ছিল আমারই মত ধর্ম-বিবর্জিত। রেঙ্গুনে তার জন্ম। ছুৎমার্গ কি চিজ্ বুঝতই না। সে যে কায়স্থ, সেই পর্যন্তই তার জানা ছিল। শৈলেন খেত সবই। শূকর-মাংস ছিল তার প্রিয় খাদ্য। শিলং-এ খাসিয়া জাত শূকর-মাংস খায়। মাঝে মাঝে সে খাসিয়াদের বাড়ীতে খেয়ে আসত। আমার নিকটস্থ আত্মীয়েরা একটু দূরে সরে থাকতেন, কি জানি তাঁদের বাসায় যদি ঢুকে যাই! তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করেই কারো বাসায় যেতাম না।

কেরাণীগঞ্জের পরিচালক সাইদুল্লা। সাইদুল্লা কিন্তু আমাকে সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য মন্ত্রীরাও আদর-আপ্যায়ন

করতে কসুর করেনি। শিলং-এ থাকার সময় কয়েকটি লেকচার দিতে হয়েছিল। চীন, জাপান, কোরিয়া, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়বাসীদের আচার-ব্যবহার নিয়েই বক্তব্য বিষয় সমাপ্ত করতাম। যখনই বলতাম, এই কারণে চীনারা এই করতে বাধ্য হয়েছে, তখনই বুঝতাম আমার দেশবাসী আসল তথ্য জানতে মোটেই রাজি নন, শুধু বাইরের ভাসা-ভাসা কথাতেই তাঁরা তৃপ্ত।

শিলং

পৃথিবীতে যত পার্বত্য শহর দেখেছি, শিলং-এর মত ফলে-ফুলে ভর্তি এমন সুন্দর শহর কোথাও দেখতে পাইনি। কাছেই চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জিতে যত বৃষ্টি হয় পৃথিবীতে কোথাও তেমন বৃষ্টি হয় না। অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং মাঘ এই তিনটি মাসই বৃষ্টি-বিরহিত কিন্তু কুয়াশায় অন্ধকার থাকে। অতএব যেন-তেন-প্রকারেণ চেরাপুঞ্জিতে জলের সংযোগ বৎসরের সব সময় লেগেই আছে।

যে কয় মাস চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি হয় না, সেই কয় মাস চেরাপুঞ্জির বাসিন্দাদের পক্ষে স্বর্গ উপভোগ হয়। রোগের নামগন্ধও শুনা যায় না। সাধারণ লোক বিভিন্ন রকমের শাকসব্জী এবং স্থানীয় চাউলের ভাত খেয়ে তৃপ্ত হয়। চিঁড়া এবং পিঠার ব্যবহার শীতের সময়ই হয়ে থাকে। বন-মোরগ, হাঁস, কবুতর, ভেড়া, পাঁঠা, শূকর এবং অন্যান্য গৃহপালিত জীবের মাংস প্রচুর ব্যবহার করা হয়। সেই সঙ্গে ধেনো মদ হয় সুখের সাথী। খাসিয়াদের দেবতার আরাধনাও হয়ে থাকে; প্রকৃতপক্ষে অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং মাঘ, এই তিনটি মাস খাসিয়াদের আনন্দের সময়। কমলালেবুর প্রাচুর্য এই তিন মাসেই দেখা যায়।

কমলালেবুর ইংরেজী নাম অনেকেই 'অরেঞ্জ' রূপে ব্যবহার করেন, বিশেষ করে ভারতবাসীরা। সকলের অবগতির জন্য বলছি, কমলালেবুর ইংরেজী নাম আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। ইংরেজরা যাকে অরেঞ্জ বলে, তা কমলালেবু নয়। তার আফ্রিকান শব্দ 'মাচুঙ্গা', ভারতীয় তথা সমস্ত এশিয়াবাসী তাকেই বলে 'সুইট লিমন', আর বাংলা শব্দ 'মিষ্টি লেবু'। মিষ্টি লেবু বোম্বাই প্রদেশে প্রচুর হয়। কমলালেবু আমাদের দেশের খাসিয়া পাহাড়, শ্রীহট্ট জেলার কতক অংশ, দারজিলিং এবং নাগপুরেই হয়ে থাকে। ইউরোপে, আমেরিকায় অথবা অষ্ট্রেলিয়ার কোথাও কমলালেবু

হয় না, শুধু আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে এক শ্রেণীর কমলালেবু হয়, যার আকৃতি ছোট এবং খেতে ভয়ানক টক।

শব্দ-তত্ত্ব নিয়ে সমালোচনা করা বৃথা সময়ক্ষেপণ মাত্র। শিলং-এর কমলার মত মিষ্টি কমলা ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় না। যে ভূমিখণ্ডে মিষ্টি কমলা ফলে ও অনবরত বৃষ্টিপাত হয়, সে ভূমিখণ্ডের মাহাত্ম্য আমি কেমন করে বর্ণনা করিতে পারি?

খাসিয়া পাহাড়ের আর একটি বিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় যার নমুনা পৃথিবীর আরও একটি স্থানে দেখেছি। সেই খাদ্যদ্রব্য হল চাউল। তবে আমি যে চাউলের কথা বলছি সেই চাউলকে রান্না করে ভাত করতে হয় না, জলে ভিজিয়ে রাখলেই ভাত হয়। নিজের চোখে দেখেছি এই রকম চাউল, ফিলিপাইন দ্বীপের বাগিয়া পাহাড়ে হয়; মালয় দেশের ফ্রেজার হিলেও এই ধরণের চাউল পাওয়া যায় শুনেছি কিন্তু দেখতে পাইনি। যারা জল-ভাত খেয়েছেন অথবা খেয়ে থাকেন, তাঁরা যেন মনে না করেন এটা হয়ত জল-ভাতের মত অথবা ভিজা চিঁড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। উপযুক্ত পরিমাণে জলের মধ্যে চাউল ভিজিয়ে রাখলে আধ ঘণ্টার মধ্যে ভাত হতে সুগন্ধ বেরিয়ে আসে এবং যে কোন দ্রব্যের সংযোগে খেলে বেশ ভাল লাগে। এই চাউলের আবাদ বর্তমানে নাগা পাহাড় এবং মণিপুর জেলার কোথাও কোথাও হচ্ছে শুনতে পাই।

শিলং শহরের আর একটি বিশেষত্ব আছে। এখানে আসাম এবং বাংলা হতে কূটনৈতিক এবং অন্যান্য ধরণের রাজনৈতিকরা একত্রিত হন। মাথা স্থির রেখে পরামর্শ করার পক্ষে এই শহরটি বিশেষ উপযুক্ত। এই শহরকে হলেণ্ডের ডেন্ হেগ্ নগরীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শহরের কোথাও কোনরূপ গোলমাল নাই। সবাই আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে অথচ চক্রান্তকারীরা

নিজেদের চক্রান্ত পাকিয়ে মহানন্দে নিজ নিজ বাসভূমিতে যেয়ে চক্রান্ত অনুযায়ী কাজ করছে।

নাগা পাহাড়ে যে কয়জন মিশনারী দেখেছিলাম, তাঁদের দেখলেই মনে হত যেন ষড়যন্ত্র করাই এঁদের একমাত্র কাজ; কিন্তু শিলং-এর মিশনারীরা অন্য রকমের। তাঁরা খাসিয়াদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম এবং সমাজ-উন্নতির পথই বাতলিয়ে যাচ্ছেন যার প্রভাবে আজ খাসিয়ারা জন-সংখ্যায় বৃদ্ধি হচ্ছে। লোক সুখে আছে। ধর্মান্ধতা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। খাসিয়াদের মধ্যে একই পরিবারে হিন্দু এবং খৃষ্টান দেখা যায়। খৃষ্টান খাসিয়ারা হিন্দু খাসিয়ার দেবতাকে অমান্য করে না, হিন্দু খাসিয়াও খৃষ্টকে অবজ্ঞা করে না। কার কি ধর্ম তার পরিচয় দৈনন্দিন জীবনে বুঝতে পারা যায় না। কারো মৃত্যু হলে বুঝতে পারা যায় তার ধর্ম কি ছিল। হিন্দু হলেই পোড়াবে, খৃষ্টান হলেই কবর দেবে।

খাসিয়ারা বিদেশের সংস্পর্শে এসে রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ উন্নতি করেছিল। অসমীয়ারা তখনও আত্মরক্ষার্থে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, বাঙ্গালীদের সাহচর্য পাওয়া দুষ্কর এবং লাভের মধ্যে শুধু নিজ সমাজের গ্লানি আহরণই হবে। শিলং শহরেও কয়েকটি লেক্চার দিতে হয়েছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি। শিলং-এর অসমীয়া-সম্প্রদায় বিদেশের সংবাদ শোনার জন্য কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করায় দুঃখিত হয়েছিলাম। অবশেষে একজন অসমীয়াকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "বাঙ্গালীরা যেমনভাবে তাদের কোণঠাসা করতে আরম্ভ করেছে, তাতে আত্মরক্ষা করাই দায় হয়ে উঠেছে। এতটুকু জেনেও আমরা কি করে বিদেশী তথ্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল হতে পারি?"

বাস্তবিক পক্ষে শ্রীহট্টের অপরিণামদর্শী রাজনৈতিকদের অজ্ঞতার জন্যই আজ শ্রীহট্ট জেলা আসামের বাইরে ঠেলে দেওয়া

হয়েছে। রাজনীতিতে দেশের এবং দশের উপকার করতে হলে সাধারণ মানুষ হতে একটু উচ্চ স্তরে না পৌঁছলে কিছুই করা যায় না।

শিলং শহর পরিত্যাগ করার সময় হয়ে এসেছিল। আমার ইচ্ছা ছিল শিলং হতে শ্রীহট্ট, কুলাউড়া, ত্রিপুরা হয়ে কলকাতায় পৌঁছি। শৈলেনকেও পথ নির্ধারণ করতে বলেছিলাম। সে শুধু বলেছিল, "যে পথেই যান না কেন দারজিলিং যেতে হবেই।" আমার কিন্তু দারজিলিং যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। শিলং ছেড়ে আসার দু'দিন পূর্ব হতেই মন বড়ই দুর্বল হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল কোনও বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কুসংস্কার অনেক রকমের, মনের দুর্বলতাও তার মধ্যে একটি। আমি ভাল করেই জানতাম শিলং হতে শ্রীহট্ট একদিনেই পৌঁছন যায়। সবটা পথই ঢালু।

বিদায়ের দিন সকালবেলা কেতকীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলাম। আমরা ক্রমেই নীচের দিকে চলছিলাম। পথের সৌন্দর্য দেখার অবসর ছিল না। শৈলেন আগে চলছিল। তার সাইকেলে ভাল ব্রেক না থাকায় অনেক সময় খাড়িতে ঝুঁকে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি পড়ল!

বেলা বারটার সময় লাইলংকট নামক স্থানে পৌঁছি এবং বিশ্রামান্তে শৈলেনকে ধীরে চলতে আদেশ দিয়ে নিজে ধীরে চলতে আরম্ভ করি। হঠাৎ শৈলেন প্রবল বেগে সাইকেল চালিয়ে দিল। সামনেই একটা খাড়ি। পড়লেই একটি হাড়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাবছিলাম, শৈলেনকে পেছনে রেখে আমিই আগে যাব। হঠাৎ সাইকেলে ব্রেক কসতে গিয়ে সামনের চাকাতে ব্রেক দেওয়া মাত্র সাইকেল হতে ছিটকে গিয়ে সামনের দিকে গড়াতে আরম্ভ করলাম। সাইকেল পেছনে পড়ে থাকল। গড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেলাম। বুঝতে পেরেছিলাম ডান পায়ের হাড় ভেঙ্গেছে এবং ডান পায়ের পাতা এমনিভাবে sprain হয়েছে যে

হয়ত কেটেই ফেলতে হবে! দূর থেকে শৈলেন আমার দুর্গতি দেখতে পেয়ে ফিরে এল। কতক্ষণ পর চা-বাগানের দু'জন ইউরোপীয়ান কর্মচারী, আমি মাটিতে পড়ে আছি দেখে গাড়ি থামালেন। শৈলেন উভয়কে অনুরোধ করল, আমাকে যদি তাঁরা হস্‌পিটালে পৌঁছে দেন তবে বড়ই বাধিত হবে। শৈলেনের আবেদন তাঁরা রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখানে 'বাধ্য হওয়া' শব্দ ব্যবহার করলাম। শৈলেন তখন অবাধ্য ছিল, সেজন্যই যাকে-তাকে বাধ্য করার মত ক্ষমতা তার ছিল।

১৯৩৪ সালের ৩রা জানুয়ারী বিকালে আমাকে শ্রীহট্টের সদর হস্‌পিটালে নিয়ে এলেন দু'জন ইউরোপীয়ান। বাঙ্গালী ডাক্তার আমার অবস্থা দেখেই ভীত হলেন! তিনি ভেবেছিলেন, হয়ত এঁদের মোটর চাপা পড়ে আমার পা ভেঙ্গেছে। সেজন্য চিৎকার করে বল্লেন, "So far you are injured, I will endorse that much." অর্থাৎ শরীরে যতটুকু আঘাত লেগেছে ততটুকুই আমি লিখব, এর বেশিও নয়, কমও নয়।

ডাক্তারের কথা শুনে চা-বাগিচার কর্মচারীরা হাসলেন এবং আমাকে স্টেটমেণ্ট দিতে বল্লেন। আমি বল্লাম, "সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, এঁর দয়া করে হস্‌পিটালে নিয়ে এসেছেন। শৈলেন এলেই এঁদের পেট্রলের দাম দিয়ে আসবে।"

এবার ডাক্তার মহাশয় আশ্বস্ত হলেন এবং পা পরীক্ষায় মন দিলেন। পা পরীক্ষা, পা ব্যাণ্ডেজ এবং ঔষধের ব্যবস্থা হয়ে গেলে শৈলেনও পৌঁছে গেল। ইউরোপীয়ানদের বিদায় নেবার পূর্বেই শৈলেন আমার অটোগ্রাফ বইটা তাঁদের কাছে দিয়ে বল্লে, "দয়া করে আপনাদের অটোগ্রাফ দিয়ে বাধিত করুন।" ইউরোপীয়ান প্লেণ্টারগণ তাঁদের অটোগ্রাফ এবং মন্তব্য লিখে বিদায় নিলেন।

কতক্ষণ পরই স্থানীয় রামকৃষ্ণ-মিশন হতে দু'জন সেবক এলেন। তাঁদের সেবাব্রত অপূর্ব। এরূপ সেবাইত খুব কমই

দেখেছি। তাঁদের ধৈর্য এবং কর্মক্ষমতা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। শৈলেনও বেশ সাহায্য করেছিল। অন্য লোককে কষ্ট দেওয়া ভাল হবে না মনে করে নিজের ভাইপোকে ডেকে আনাই ভাল হবে মনে করে বাড়িতে টেলিগ্রাম করি।

ভাইপো সবেমাত্র জেল থেকে ফিরে এসেছিল এবং পুলিশের হেপাজতে ছিল। আমার তার পেয়ে সে পুনরায় আইন অমান্য করে এবং রেল ধরবার জন্য শহরের দিকে রওয়ানা হয়। পুলিশ সংবাদ পেয়ে পথেই তাকে গ্রেপ্তার করে এবং পুলিশ-সুপারের কাছে হাজির করে। পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তার শরীর তল্লাসীর আদেশ করেন। শরীর তল্লাসীর সময় আমার প্রেরিত টেলিগ্রাম তার পকেট হতে বেরিয়ে পড়ে। পুলিশ-সুপার টেলিগ্রাম পাঠ করে তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তার কাছে পাথেয় আছে কিনা? পাথেয় যা ছিল, জাতভাইরা পূর্বেই নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ-সুপার সমস্ত বিষয় বুঝতে পেরে নিজের পকেট থেকে তাকে পাথেয় দিয়ে বিদায় করেন।

পরের দিন আমার ভাইপো শহরে পৌঁছামাত্র পুলিশ তার পেছন নেয় এবং হস্‌পিটাল পর্যন্ত আসে। ভাইপো আমাকে দেখে যখন বুঝল, চিকিৎসার সুব্যবস্থাই হচ্ছে তখন সে আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলে, "অনেক দেশ ঘুরে এসেছেন কাকা, বলুন ত আমাদের দেশের পুলিশ ধরে আনতে বল্লে বেঁধে আনে কেন?" তার প্রশ্নের উত্তর একদিনে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ক্রমাগত কয়েকদিন তার উত্তর দিয়েছিলাম।

ধন্যবাদ জানাই আমার জাতভাই বাঙ্গালী গোয়েন্দা-পুলিশ মহাশয়দের। জ্ঞানী জাতে জন্মগ্রহণ করেছ বলে অহঙ্কার কর, শিক্ষিত বলে গর্ব কর কিন্তু কত নীচ স্তরে নেমে এলে রোগীকে আক্রমণ করার অভিপ্রায় হয় তোমরা জান না, জানবার ক্ষমতাও নাই এবং সেজন্যই আজ স্বদেশ হতে বিতাড়িত হয়েও একে অন্যের

সর্বনাশ করতে একটুকুও দ্বিধা বোধ কর না। আমি আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাসের নজির দেখিয়ে বলেছিলাম, আমাদের জাত বরাবরই রাজভক্ত। এখন তার ব্যতিক্রম হয় কেন? যাহোক্ দলবল নিয়ে একদিন পুলিশ-সুপার এল হস্‌পিটালে আমার রুম তল্লাস করতে। সুখের বিষয়, একজন বৃটেন ওদের নায়ক ছিল। সে আমার দুরবস্থা দেখেই বল্লে, "No let us go, he is suffering." একথা তাদের মনিবের মুখে শুনেও তারা যখন বল্লে, "No Sir, we must search him" তখনি তাদের মনিব বল্লে, "Right about turn," আর তারা কুকুরের মত সেই ইংরেজের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

কি জানি কি মনোবৃত্তি তাদের! চাকরি বজায় রাখতে গিয়ে সত্য-মিথ্যা সব ভুলে যাওয়া, আত্মীয়তা পরিত্যাগ করা বোধহয় আমাদের দ্বারাই সম্ভব হয়, আবার গর্বের সঙ্গে বলাও হয়, "Order is order, that must be carried out." কত অধোগতি হলে মানুষ বিবেক-বুদ্ধি হারায় তা যদি দেখতে হয় তবে দেখতে হবে আমাদের মধ্যেই!

দেড় মাস হস্‌পিটালে ছিলাম, আমার স্বগ্রামবাসী এবং আত্মীয়েরা আমাকে দেখতে বড় কেউ আসতেন না। তাঁদের ভয় ছিল, যদি আমি কাউকে বলি তোমার বাড়িতে আমাকে স্থান দাও। প্রথমতঃ স্বদেশের বৃটিশ গোলাম পুলিশের ভয়, দ্বিতীয় ভয়—জাত যাবার। অবশেষে হস্‌পিটালের কাছেই এক বৈষ্ণবী তাঁর বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়িতে ছিলাম মাত্র এক সপ্তাহ, ইতিমধ্যে ঢাকা জেলার বাসিন্দা শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে আমাকে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি কলিকাতায় আছেন, এবং হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্‌টিস করছেন। তাঁর সাহস এবং উদারতা ভুলবার নয়। বৈষ্ণবীর দয়াও ভুলে যাওয়া কৃতঘ্নতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

বৈষ্ণবী উদার। জাত-বিচার তাঁর ছিল না। কৃষ্ণনাম তাঁর মুখে লেগেই ছিল। একদিন বৈষ্ণবী আমাকে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য শোনাচ্ছিলেন। কি মনে করে বৈষ্ণবীকে বলে ফেল্লাম, "আমি কারো ভক্ত নই, ভক্তিকে কাপুরুষতার লক্ষণই মনে করি।"

বৈষ্ণবী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বৈষ্ণবী অশিক্ষিতা। অতি কষ্টে মহাভারত পড়তে পারতেন। তাঁকে আমার মতবাদ যখন শোনালাম তখন বৈষ্ণবী বল্লেন, "যাই বল বাবাঠাকুর, আমি কিন্তু অবতারবাদ পরিত্যাগ করতে পারব না।" বৈষ্ণবী অবতারবাদ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর বাড়ি পরিত্যাগ করার পরও বৈষ্ণবী আমাকে দেখতে আসতেন এবং কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করে আমার পায়ে ফুঁ দিতেন।

বৈষ্ণবীকে শব্দমাহাত্ম্য শোনাতে বলায় তিনি বলেছিলেন, "কি জানি বাবাঠাকুর, মন্ত্রের প্রভাব কি কম? আমার যদি ভাল না লাগে তবে ইচ্ছা করলেই আমি আমার গ্রামে বৃষ্টি থামাতে পারি অথবা ইচ্ছা অনুযায়ী বৃষ্টিও করাতে পারি। শব্দমাহাত্ম্য বল, আর মন্ত্র-মাহাত্ম্য বল, সবই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।" বৈষ্ণবীকে পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হয়নি বটে কিন্তু মনের কোণে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কুসংস্কার হতেই সংশয়ের সৃষ্টি, দুর্বলতার জন্য সংশয়ও বেড়ে গিয়েছিল।

বিদায়ের দিন বৈষ্ণবীকে ডেকে পাঠালাম। বৈষ্ণবী এলেন এবং আশীর্বাদ করলেন। শুভেচ্ছায় যদি কিছু হ'ত তবে পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছুই থাকত না। বৈষ্ণবীকে বুঝতে দিলাম না আমি শুভেচ্ছা এবং কু-ইচ্ছা ছাড়িয়ে আরও আগে চলে গিয়েছিলাম।

বৈষ্ণবী বল্লেন, "আমার শুভেচ্ছার মূল্য আছে, বাজে আলাপ আমি করি না। তুমি যেমন অনেক অগ্রসর হতে পেরেছ, আমিও পেছনে পড়ে থাকিনি। আমি আর পেছনে হটব না কিন্তু তুমি পেছনে হটতে বাধ্য হবে।"

এবার বৈষ্ণবী আর বৈষ্ণবী ছিলেন না। তাঁর আভ্যন্তরিক রূপ আমার চোখে দিব্য হয়ে ভেসে উঠছিল।

দুঃখের হাসি হেসে বলেছিলাম, "বৈষ্ণবী, আমি পুরুষ, সকল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত। আমার কাছে পৃথিবী সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা।"

বৈষ্ণবীও হেসে বলেছিলেন, 'অবাঙ্ মানস-অগোচর' যা, তাই নিয়ে কথা-কাটাকাটি চলে না। আমার কাছে ও সবই বস্তু এবং সক্রিয়।"

অতি কষ্টে বৈষ্ণবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোটরে উঠলাম। বৈষ্ণবীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলাম—"হাজারো হউক বৈষ্ণবী, তোমার জাত যাবার ভয় নাই। যারা জাতিভেদ সৃষ্টি করেছিল, তোমার স্থান আমার কাছে তাদের বহু ঊর্ধ্বে, তোমার মনোভাব শ্রীহট্টের যে কোনও তথাকথিত ধার্মিকের চেয়ে বহু উন্নত।"

ঢাকার পথে

ময়মনসিং শহরে তুই সপ্তাহ কাটিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হই। মামুলী গ্রাম্য পথ দিয়ে চলছিলাম। ডাইনে এবং বাঁয়ে যত ছোট-বড় গ্রাম পড়ছিল প্রায় সব গ্রামের বাসিন্দাই মুসলমান; থামতে হত অ-দরকারে। কেনার মত কিছুই ছিল না। কতক্ষণ যেয়েই থেমে যাওয়া শৈলেন পছন্দ করত না। কথা ছিল, জয়দেবপুর গিয়ে থামব। কিন্তু আমি তা পছন্দ করছিলাম না। গ্রামের পাশে দাঁড়িয়ে গ্রামের অবস্থা লক্ষ্য করলাম। আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। ঘরের মধ্যে হয়ত কয়েকখানা অপরিষ্কার কাঁথা, সানকী, বদনা, মাটির গ্লাস! ঘটি—খুব কমই দেখেছি। ঘরের চারদিকে মোরগ ঘুরে বেড়ায়। তা-ও বেশি নয়, চারটা নয় ত পাঁচটা। ভেড়া-ছাগলের সংখ্যা খুবই কম।

ওদের আকৃতি হাজংদের মত। শরীরের রং কালো, চুলগুলি যদিও এলোমেলো তবুও বেশ মোটা এবং কুচ্‌কুচে কালো, আদি অষ্ট্রেলিয়ানদের মতই আপনি নীচের দিকে ঝুঁকে-পড়া। ক্বচিৎ মোংগল রক্তের সংমিশ্রণ থাকায় কারো কারো শরীরের রং একটু ফর্সা, নাক একেবারে নিগ্রোয়াইট বল্লেও দোষ হয় না। মনে হয়, এরাই বঙ্গদেশের আদিবাসী।

যতই ধীরে চলছিলাম ততই শৈলেনের ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছিল। তুপুর কেটে গেল, কোথাও হিন্দু গ্রাম অথবা বাড়ি পাওয়া গেল না। সঙ্গে ছিল চিঁড়া, তাই খেতে হ'ল। বিকালের দিকে পথের পাশেই এক-খানা বাড়ি পেলাম। ভাবছিলাম, এটা হিন্দু বাড়ি কিন্তু আসলে সেই বাড়িটা ছিল একজন মুসলমানের।

বাড়ির মালিক বাড়িতেই ছিলেন। আমি তাঁকে বল্লাম, "মহাশয়, আপনার বাড়িতে থাকতে চাই, দয়া করে থাকতে দিন এবং আপনার পুকুরে এখনই স্নান করব ভেবেছি।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কি চিন্তা করলেন, তারপর বল্লেন, "কাছে কোন হিন্দুবাড়ি নাই, আপনাদের খাওয়াতে পারব না, থাকতে হলেই…" এরপর কিছু বল্লেন না।

"আজ্ঞে সবই বুঝেছি; কিন্তু আপনাদের বাড়িতেই যদি চারটি অন্নের ব্যবস্থা হয় বাধিত হব।"

"আচ্ছা থাকুন", বলেই ভদ্রলোক ভেতর-বাড়ি চলে গেলেন।

পুকুরের জল দেখে শৈলেনের স্নানের ইচ্ছা বেশি হয়েছিল। সে নেমে পড়ল পুকুরে, আমিও পুকুরের ঘাটে বসে রইলাম। পুকুরে মাছ ছিল, সন্ধ্যার সময় বোধহয় মাছকে খাবার দেওয়া হ'ত। শৈলেন জলে ঝাঁপ দিয়েছিল; মাছেরা ভেবেছিল বুঝি খাবার পড়েছে! চারদিক থেকে মাছ ঘাটের দিকে ছুটে এল। ভয় পেয়ে শৈলেন জল থেকে উঠে এল। কত রুই, কাতলা, শোল এল, কিছুই খেতে না পেয়ে তারা পুনরায় ডুব দিল।

শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মাছের কি মামুলী বুদ্ধিও নেই বলতে চাও?"

"নিশ্চয়ই বুদ্ধি আছে, নতুবা এ সময়ে জলে হুল্লোড় শুনে ছুটে আসবে কেন?"

"মাছেরও শুনবার মত শক্তি এবং বুদ্ধি আছে নিশ্চয়।"

শৈলেন বিরক্ত হয়ে বল্লে, "হাঁ হাঁ, এসব বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে চিন্তা করলে চলবে না; এবার গরু-গাধা যাই কিছু হোক, মুখে দিতে পারলেই ভাল হয়।"

বৃদ্ধ আমাদের দিকে আসছিলেন। তাঁর মুখের অবস্থা দেখে ভয় হচ্ছিল কি জানি যদি চলে যেতে বলেন! কিন্তু তিনি চলে যেতে বল্লেন না, বল্লেন, "স্নান করে এস, কিছু খেতে পাবে।"

আমিও আর দেরী করলাম না। ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। বেশ আরামদায়ক জল। উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ আদেশ করলেন, "চলে এস।"

স্নান করে চল্লাম তাঁর সঙ্গে। ভেতর-বাড়ির মধ্যেও অন্দর-মহল ছিল, সেটা আরও পেছনে। খেতে বসলাম। দই চিঁড়া সন্দেশ ছিল প্রচুর পরিমাণে। বৃদ্ধ বল্লেন, "রাত্রে ভাত হবে, এখন এই খেয়ে নাও।"

বাড়িটা দেখেই মনে হচ্ছিল এঁরা পূর্বে হিন্দু ছিলেন, বড় জোর বেশি হয়ত পাঁচ-সাত পুরুষ হবে মুসলমান হয়েছেন। বৃদ্ধ আমার পরিচয় চাইলেন। আমার পরিচয় দেওয়া মাত্র তিনি বল্লেন, "তবে তোমরা দেওয়ান্ বংশের—হিন্দুশাখা ?"

"আজ্ঞে হাঁ, তাঁরা আমাদেরই বংশের।"

পুরাতন হিন্দুবংশ হতে যারাই মুসলমান হয়েছেন, তাঁদের বাড়ির গঠন দেখলেই বুঝতে পারা যায় তাঁদের বংশ-পরিচয়। পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে পুষ্করিণী থাকবেই। মুসলমান হবার পর পূর্বের ঘরটা দক্ষিণ দিকে সরিয়ে নূতন করে অনেকেই বৈঠকখানা করেছিলেন। কেহ কেহ দক্ষিণ দিকেও পুকুর করেছিলেন। তবুও পূর্বের পুষ্করিণীর বিশেষত্ব যায়নি।

এঁরাও দেওয়ান। তবে মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়া উপাধি। দিল্লীর সম্রাট্দের কাছ থেকে যাঁরাই খেতাব পেয়েছিলেন, তাঁরা কেহই বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে সেই উপাধি পাননি। পরাজয়ের চিহ্ন-স্বরূপ ইস্লাম গ্রহণ এবং খেতাবও গ্রহণ। এঁদেরও হয়েছিল তাই।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। দলে দলে লোক আসছিল দেওয়ান সাহেবের বাড়িতে। দেওয়ান সাহেব আমাদের পূর্বেই বিদায় দিয়েছিলেন। আমাদের যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, সেটা হ'ল হিন্দু অতিথিদের ঘর। অনেকগুলি বই সে ঘরে ছিল। শৈলেন বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী নিয়ে পড়তে সুরু করল। আমি চিন্তা করছিলাম নিজের বাড়ির কথা। যখন আমি চিন্তামগ্ন ছিলাম, তখন বৃদ্ধ ফিরে এলেন এবং আমার নাম জিজ্ঞাসা

করলেন। তাঁকে আমার নাম বললাম। নাম শুনেই তিনি চুপ করে চলে গেলেন।

রাত্রে অনেকগুলি লোকের সঙ্গে খেতে বসলাম। সবাই মুসলমান, শুধু আমরা দুইজন হিন্দু। বৃদ্ধ কাছেই বসেছিলেন। পিঁড়িপাতা হ'তে আরম্ভ করে সবই হিন্দু মতে, শুধু খাওয়া আরম্ভ করার সময় সকলেই বিস্‌মিল্লা বল্লেন। আমরা কিছুই বল্লাম না। খাওয়ার শেষে বৃদ্ধ বল্লেন, "গতকাল তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তোমার সঙ্গের ছেলেটিকে কিন্তু দেখতে পাইনি। হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলবে। আমার বাড়ির অন্য কারো সঙ্গে পরিচয় করে তোমার লাভ হবে না, তাদেরও লাভ হবে না।"

স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র, পাঠশালায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকে পড়েছিলাম। স্বপ্নের কথা নিয়ে চিন্তা করতেও ইচ্ছা হল না। পরের দিন আমরা গফরগাঁও চলে গেলাম এবং তার পরের দিন জয়দেবপুর হতে ঢাকাতে পৌঁছি।

শৈলেনের ইচ্ছা ছিল, আমরা রামকৃষ্ণ-মিশনে থাকি। তার ধারণা ছিল, রামকৃষ্ণ-মিশন পূর্বের বিপ্লবী মিশনই রয়েছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-মিশন যে সেবাশ্রমে পরিণত হয়েছিল সেই ধারণা তার ছিল না। রামকৃষ্ণ-মিশনে থাকা হয়নি। শৈলেন প্রসাদ খেল, আমি খেলাম না। প্রসাদ খাওয়ার স্তর পেরিয়ে গিয়েছিলাম। পথের প্রাণী আমরা আবার পথেই চলে এলাম।

একটি যুবক আমাদের পেছন নিল। বুঝতে বাকি ছিল না সে পুলিশের অনুচর। কোনও হোটেল আমাদের স্থান দিতে রাজি হল না। অবশেষে আমরা রায় বাহাদুর পি. এন্. ব্যানার্জির শরণাপন্ন হই। দয়া করেছিলেন তিনি। আমাদের থাকবার জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং হোটেলের খরচও দিয়েছিলেন। হোটেলে থাকার এবং খাবার খরচ দিয়েছিলেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা ছিল আমরা বৃটিশ চালাকী তথা বাঙ্গালী বাবুদের পুলিশী বুদ্ধির খপ্পরে পড়েছিলাম, রায় বাহাদুর সেই খপ্পর হ'তে আমাদের রক্ষা করেছিলেন।

ঢাকায় পৌঁছেই বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের এই যে প্রাণের স্পন্দন দেখছি, তা হল ভূয়া স্পন্দন, এর কোন মানেই হয় না। এক ঝাপটাও সহ্য করতে পারবে না। এটা হল অহমিকার আর্তনাদ মাত্র। পরের দিন রাত্রে কুট্টিদের চায়ের দোকানে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম প্রাণের স্পন্দন। দুই পয়সার চা, এক পয়সার বিস্কুট, তারপরই এক পয়সার পান-বিড়ি! এর উপর নির্ভর করে বের হচ্ছিল গরমাগরম তূর্যনিনাদ! তাদের তূর্যনিনাদ আকাশে আর্তনাদ করছিল না, বাস্তব অবস্থার প্রতিধ্বনি করছিল মাত্র।

সেখানে যাওয়া অনেকে পছন্দ করে নাই। ভদ্রলোকের

ছেলে হয়ে কুট্টিদের চায়ের দোকানে যাওয়াতে কি ভদ্রতা বজায় থাকে? ডাক্তার, মোক্তার, উকিল, কেরাণী—তাঁদের ছেলেদের সম্মান কতটুকু, আফিসে কাজ করার সময় বুঝতে পেরেছিলাম। জমিদার, লগ্নী ব্যবসায়ী, আড়তদার—এঁরা প্রত্যহ কি করেন তাও জানতাম; সেই জন্য এঁদের কটূক্তি আমার পাশেও আসতে পারছিল না। ধনতন্ত্রবাদ কাকে বলে চীনদেশ থেকেই শিখে এসেছিলাম। ধনতন্ত্রবাদের আঁওতার মধ্যে যারা থাকে, তাদের আত্মসম্মান-বোধকে আত্মসম্মান বলা চলে না।

কুট্টিদের ভাষা, শরীরের গঠন, এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এমনি সময় হঠাৎ মনে হল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে কিছু বলতে হবে। শৈলেন কোথায় গিয়েছিল তার অপেক্ষায় ছিলাম। সকাল দশটা, তখনও তার খবর নাই। সাড়ে দশটার সময় ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পৌঁছতে হবে। তার খোঁজে বের হয়ে দেখলাম সে দাঁড়িয়ে আছে, আর কি দেখছে! সে আমাকে ডাকল এবং সরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "দেখুন।" দেখলাম, পাশের বাড়িতে একটি যুবতীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছিল, তার লজ্জাস্থানে ফমেণ্টেশন করা হচ্ছে। অত্যাচার নাকি পুলিশ করেছিল। দেখলাম মাত্র কিন্তু মনে একটুও লাগল না। কে এই পুলিশ? তারা ত আমাদেরই লোক। চাকরি বজায় রাখতে গিয়ে যারা অমানুষিক অত্যাচার করতে পারে, তারা যে সমাজের লোকই হউক না কেন, সেই সমাজ কলঙ্কিত, ভ্রষ্ট, পতনশীল।

লেকচার দিয়ে যা পেয়েছিলাম, হোটেলে বাজে খরচেই চলে গিয়েছিল। আর একটি স্থানে লেকচার দেবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। সেই স্থানটি হল রমনা। রমনা হ'তে ফেরবার পথে শ্রীযুক্ত নির্মল সেন মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলাম। অমায়িক লোক, বিদেশের সংবাদ জানবার জন্য প্রবল আগ্রহ তাঁর ছিল। তিনিও হোষ্টেলে কিছু বলার জন্য বলেছিলেন।

হোষ্টেলের ছাত্রদের মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখতে পাইনি। শ্রীযুক্ত সেন বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা প্রফেসর। সেন মহাশয়ের অমায়িকতা এবং রায় বাহাদুর পি. এন্. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বদান্যতায় ঢাকায় কয়েক সপ্তাহ আনন্দেই কেটেছিল।

আমাদের সঙ্গে যাতে কোনও টেরারিষ্টের যোগাযোগ না হয়, সেজন্য পুলিশের লোক প্রায়ই সঙ্গে থাকত। তবুও শৈলেন মাঝে মাঝে ছিট্‌কে পড়ত। আজ অমুক কালীবাড়ি, কাল অমুক আশ্রম, এসব নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। আমি জানতাম, অবতারবাদীদের আশ্রম আর সাপের গর্তে কোনও প্রভেদ ছিল না। আজ যারা স্বদেশীকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, আগামীকাল তাদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য তারাই স্বদেশসেবীদের ধরিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না ; সেজন্যই আমি কোথাও যেতাম না।

ঢাকাতে হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্বন্ধে একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়েছিল। সকলের মতই ছিল হিন্দু-মুসলমান মিলন হওয়া সম্ভব, আমি ছিলাম নির্বাক। স্বার্থের সংঘাত যেখানে রয়েছে সেখানে অবতারবাদীদের মিলন অসম্ভব। অবশ্য কিছুই বলিনি, শুধু বলেছিলাম এসব হল রাজনীতি, পর্যটকের পক্ষে ভ্রমণ-সময়ে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা অন্যায়। একজন বলেছিলেন, “আপনি বল্‌ছেন অবতারবাদ এবং ধর্ম একই। মেনে নিলাম ধর্মগুলি মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে রাজনীতি এল কোথা হ'তে?” উত্তরে শুধু বলেছিলাম, “ঈশ্বর, পুরোহিত এবং শাসকের মধ্যে যে যোগাযোগ, তাই হল প্রকৃত রাজনীতি।” আজকের দিন হ'লে ঢাকাতেই আমার ভ্রমণ শেষ হ'ত! কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়ে জেলে পূরতে কতক্ষণ? এই কয়েকটি কথাই মার্কস্‌বাদের গোড়ার কথা।

ঢাকার শাঁখারী-টোলা বিখ্যাত। শাঁখারী-টোলা দেখতে

গিয়ে দেখলাম মস্তবড় একটি গলিপথ। সেই পথের দুইদিকে শাঁখারীরা শাঁখা তৈয়ারী কাজে ব্যস্ত। শাঁখারীদের নিত্যকার্য হল শাঁখা তৈরী। শাঁখা বোধহয় তারাই করত নতুবা দালালদের আনাগোনা নিশ্চয়ই চোখে পড়ত। বহু পুরাতন সেই শাঁখারী-পট্টি। মোংগল এবং পাঠান রাজত্বেও নাকি শাঁখারী-পট্টির অস্তিত্ব ছিল। শাঁখারী-পট্টির বাড়িগুলি দেখেই তার কিছুটা আভাস পেয়েছিলাম। সেই ছিল আমার প্রথম বারের ঢাকা দর্শন, সেজন্য বিশেষভাবে সকল বিষয় লক্ষ্য করতে হয়েছিল। এর পরও ঢাকাতে গিয়েছিলাম, তখনও লক্ষ্য করেছিলাম শাঁখারী-টোলার বিশেষ বৈচিত্র্য !

গেণ্ডারিয়া, রমনা, অথবা কালীবাড়ির কথা না বলে শাঁখারী-পট্টি কথা প্রথম আরম্ভ করার একটি বিশেষ কারণ আছে। এখানে লোক দেখে মনে হয়নি কোনও বাঙ্গালী পাড়ায় গিয়েছিলাম। বাড়িগুলির গঠনে বিদেশী ছাপ ছিল। কোনও একস্থানে বলেছি, বালী দ্বীপের বাড়ি-ঘর বাঙ্গালী ধরণে তৈরী কিন্তু ঢাকার শাঁখারী-পট্টি কি করে তেলেগু ধরণে গড়ে উঠেছিল, তাই ছিল চিন্তনীয় বিষয়। তেলেগু অক্ষরের প্রভাব উৎকলী অক্ষরে বিশেষভাবে আরোপিত হয়েছে। অথচ ভাষার দিক দিয়ে উৎকলী ভাষা বাংলা ভাষার অতি নিকটে রয়েছে পূর্বে কুট্টিদের কথা বলেছি। শাঁখারী-টোলার শাঁখারী এবং কুট্টিদের শরীরের গঠন ও রং একই রকমের। কর্মক্ষমতাও উভয় শ্রেণীর একই। হদ্দ পরিশ্রমী উভয় শ্রেণীর লোক। দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল, এরা বিদেশ হতে এসে বসবাস করছিল। এক শ্রেণী ইস্‌লামী মতবাদ গ্রহণ করে, অন্য শ্রেণী পূর্বের মতবাদই বজায় রেখেছিল। শাঁখারী-টোলার শব্দ-উচ্চারণ এবং কুট্টিদের শব্দ-উচ্চারণ ও "হিউমার" একই ধরণের, যেমন "ঘোড়ায় হাসবে" "শাঁখে দাঁত দেখাবে" ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক এবং নৃতত্ত্বের সন্ধান নিয়ে বিপ্লবী তথ্যের সন্ধান নেবার বিশেষ সময় থাকত না। একদিন দেখলাম, দুজনই শিক্ষিত লোক কোনও বৈষয়িক বিষয় নিয়ে আদান-প্রদানের কথা বলছিল। আধ ঘণ্টা কথা বলে ঠিক করলে, পরের দিন বিকালে হোটেলে দেখা করবে এবং আদান-প্রদান করবে। আদান-প্রদান কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। পরের দিন শুনলাম, আদান-প্রদান প্রয়াসী উভয় ব্যক্তি পুলিশের হেপাজতে আছে। এদের মধ্যে একজন পুলিশের লোকও ছিল। এই করে তথাকথিত টেরারিজমের গোড়ায় আঘাত করা হচ্ছিল।

ঢাকার নবাব-বাড়িতে গিয়েছিলাম। একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। নবাব-পরিবারের যে কোনও লোককে দেখলেই মনে হয়, তাঁরা পশ্চিম দেশের লোক। বাংলা ইচ্ছা করেই বোধহয় বলতেন না। এখন বলেন কি না জানি না। ঢাকার নবাব-পরিবারের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের বেশ আন্তরিকতা ছিল। এখানে গড়ে উঠেছিল আর একটি বৃটিশ চক্রান্ত। সাধারণ মুসলমানের সহানুভূতি ছিল সেই চক্রান্তে। থাকতে হবেই। যাদের ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হয়, তাদের আত্মসম্মান জেগে উঠেছিল বৃটিশ প্রীতিরূপে। এটা না হয়ে যায় না। কতকাল অত্যাচার সহ্য করা চলে? নবাব-বাড়িতে পৌঁছেই বুঝতে পেরেছিলাম, ভারতের ভবিষ্যৎ এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

ময়মনসিং জেলার জামালপুরে যেদিন ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা নির্যাতিত হয়েছিলেন, সেদিন থেকেই মুসলিম শাসক এবং হিন্দু শাসকদের মধ্যে ফাটল ধরেছিল। বাংলার মুর্শিদাবাদের নবাব সামসুল হুদা এবং আরও কয়েকজন মুসলিম জননায়ক ব্যতিরেকে সকলেই বৃটিশের সঙ্গে হাত মিলাতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাঁরা বৃটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, তাঁরা জানতেন না পৃথিবীর গতিপথ কোন্‌দিকে!

যদি জানতেন, তবে বোধহয় তাঁরা বৃটিশের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে দুর্বল প্রকৃতির হিন্দু মধ্যবিত্তদের আঁকড়িয়ে থাকতেন। কে নিজের প্রাধান্য হারাতে চায়? বাংলা তথা গোটা হিন্দুস্থানে মুসলিম প্রাধান্য আগাগোড়াই ছিল। যাঁরা বঙ্কিম-সাহিত্য উপলক্ষ্য করে হিন্দুদের প্রতি কর্দম নিক্ষেপ করেন, তাঁরা ভুল করেন, বঙ্কিম-সাহিত্য এবং ডাক্তার স্যান-ইয়াত-সেনের মাঞ্চু-উৎখাত একই ধরণের বিষয়বস্তু। অগ্রগামী হিন্দু এবং মুসলমানগণ যদি সাধারণ লোকদের একই সূত্রে আবদ্ধ করে বৃটিশের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চালনা করতেন, তবে আজ আমরা হিন্দুস্থানের অন্য রূপ দেখতে পেতাম। অবতারবাদীরা বিপ্লবের মাধ্যমে আপনি কাবু হয়ে যেত, বৃটিশ আজ আমাদের দেশ থেকে যে রসটুকু পাচ্ছে, তা পেত না। বিপ্লব আরম্ভ হ'ত অবিকল আমেরিকান ধরণে এবং শেষ হ'ত সোভিয়েট রুশের পদ্ধতিতে।

নবাব-বাড়ির বৃদ্ধকে সবেমাত্র বলতে আরম্ভ করেছিলাম, অমনি কয়েকটা লোক এল, তারা বৃদ্ধকে মাথা নত করে সালাম ঠুকল। বৃদ্ধ মুখ বদলালেন, আরম্ভ করে দিলেন চীনের মুসলিমদের কথা। আমিও তাই বলতে আরম্ভ করলাম। আমাদের কথার শেষ এখানেই। আর নবাব-বাড়িতে যাইনি, যদিও আরও একদিন যাবার নিমন্ত্রণ ছিল।

আমরা যে হোটেলে থাকতাম সেই হোটেলে ইন্‌ফরমাররাই থাকত বেশি। সেইজন্যই বোধ হয় পরোক্ষে রাজনীতি-চর্চাকারীরা আসতেন না। আমরা ঢাকা ছেড়ে যাব ভাবছি তার কয়েক দিন পূর্বে কয়েকটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে শৈলেনের হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল। সুখের বিষয় তারা জানত না যে, শৈলেন কি চিজ্! তাদের মধ্যে যা নিয়ে তর্ক হচ্ছিল তা ছিল, কোন্ মার্কা স্বাধীনতা পেতে হবে? হিন্দু-মার্কা কি আরব-মার্কা! বিষয়টা

তাদের দ্বারা মীমাংসা হচ্ছিল না, তাই এই গণ্ডগোল। অবশেষে আমার কাছে মুসলমান যুবকেরা এল এবং যা বলতে যাচ্ছিল বলতেই পারল না। তারা তখন আমাকে নিমন্ত্রণ করে বিদায় নিলে। সাদরে তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। পরের দিন সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম। শৈলেন গেল না।

অনেকগুলি ছেলে বসেছিল। আমিও বসলাম। আশেপাশের বাড়ি দেখে মনে হচ্ছিল এরা সবাই দরিদ্র। সকলের পরনেই লুঙ্গি; মাথায় কারো টুপি ছিল, কারো ছিল না। কথা আরম্ভ হল। সেই পুরাতন কথা, হিন্দু-মার্কা কি আরব-মার্কা স্বাধীনতা হবে? তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তাদের মধ্যে কেহই কংগ্রেসের নির্ধারিত মতবাদ পড়ে নাই, এমন কি কংগ্রেসের নাম শুনতেও তাদের ঘৃণা হয়।

স্বাধীনতা বলতে তারা কি বোঝে জিজ্ঞাসা করায় একজন বল্লে, "এখন যেমন হিন্দুর গোলামি করছি তেমনি হিন্দুর গোলামি করতে হবে, এর বেশি আর ত কিছু মনে করি না।"

"কে বলে হিন্দুর গোলামি? এ সব হল খুব বাজে কথা। আপনারা গোলামি করছেন ধনীর, সে যে-কোনও মতবাদের অর্থাৎ ধর্মেরই হউক।"

"মতবাদ বলতে আপনি কি বোঝেন?" একটি যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

যুবকের প্রশ্নের জবাব খুবই কর্কশ হবে মনে করে বল্লাম, "যাঁরাই ধর্ম প্রচার করে গেছেন তাঁরা সবাই আমাদের মত মানুষই ছিলেন। তাঁদের উপদেশাবলী হল তাঁদের মত। তাঁদের মত মেনে যারা চলে তারা সেই মতবাদকে ধর্ম বলে। যেমন খৃস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, কন্‌ফিউসাস্ ইত্যাদি।"

"শ্রীকৃষ্ণকে আপনারা কি মনে করেন?"

"আপনারা বলবেন না, আমি কি মনে করি তা জিজ্ঞাসা করতে

পারেন। আমার মতে তিনিও আমার মতই একজন মানুষ ছিলেন। সে যুগের পক্ষে তিনি ছিলেন বিশেষ মানুষ, নতুবা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ চালাতে পারতেন না।”

প্রশ্নকারীর মুখ শুকিয়ে গেল।

“কেন কি হয়েছে বন্ধু, মুখ শুকালো কেন?”

“তারপর হয়ত বলবেন মহাম্মদও আমাদের মতই একজন মানুষ ছিলেন।”

“শ্রীকৃষ্ণকে যে মানুষ বলতে পারে তার কাছে খৃষ্ট, মহাম্মদ, কন্‌ফিউসাস্‌, বুদ্ধ, এঁরা মানুষ ছাড়া আর কি হতে পারেন?”

ব্যস্‌, এর পরেই সভা পাতলা হয়ে গেল। যারা রইল, তারাও যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে রয়ে গেল।

যে ছেলেরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল, তারা মহাবিপদে পড়ল। একটি পাক্কা কাফেরকে খাদ্য দেওয়া তাদের মতে মহাপাপ অথচ মুসাফিরকে বিমুখ করাও চলে না। তাদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে বল্লাম, “দেখলেন ত আমার মত লোককে নিমন্ত্রণ করা কত কষ্টকর ব্যাপার! আপনাদের বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য বলছি আমাকে বিদায় দিন, আমি হোটেলে যাই, অন্নের অভাব হবে না।”

যুবকেরাও বিপদে পড়েছিল। তাদের বিপদ হতে রক্ষা করবার জন্য একজন মৌলবী এলেন। মৌলবী শিক্ষিত এবং আমাদের গ্রামে শিক্ষকতা করেছিলেন। আমাকেও কয়েকদিন পড়িয়েছিলেন। মৌলবী আমাকে চিনতে পারেননি, অবশেষে আলাপ হবার পর আমার পরিচয় পেলেন। মৌলবী তখনকার দিনের বি-এ পাশ ছিলেন।

আমার পরিচয় পেয়েই মৌলবী মৌন অবলম্বন করেছিলেন। কতক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলেন, “এখন তুমি কি কও?”

“আমার মত বদলায়নি।”

"শুনলাম তুমি বেশ ইংলিশ বলতে পার!"

"কার কাছ থেকে শুনলেন?"

"অনেকে বলেছে। তোমার মত বদলায়নি কোনদিকে? তোমার ত অনেকগুলি মত ছিল।"

"বাঙ্গালী প্রথম, বাংলা ভাষা যারা বলে তারাই আমার জাত ভাই, তারপর ইণ্ডিয়ান্।"

"হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন?"

"এইসব হল মতবাদ, চিরস্থায়ী নয়।"

"এখন আমার কাছে যা বল্লে তোমার শিক্ষাগুরু কালীপদবাবু এবং তোমার বাবাকে তা বলেছ?"

"নিশ্চয়, এমন কি আমার কাকা পদ্মনাথ ভট্টাচার্যকেও বলেছি।"

"তারা কি বল্লেন?"

"তাঁরা আশীর্বাদ করেছেন, বলেছেন আরও শিখে এসো। তবে আমার মতবাদ তাঁরা মোটেই গ্রহণ করেননি।"

মৌলবী সাহেব আমার হাত ধরে বল্লেন, "চল খেতে যাই।" যুবকদের বল্লেন, "এ আমার ছাত্র, মাছ বেশি খায় না, মাংস থাকে ত নিয়ে এস।"

খেতে বসে মৌলবী সাহেব বল্লেন, "তুমি আরব দেশগুলি ভাল করে দেখবে। আসিরিয়ান্‌দের বাড়িতে থাকবে, আফগানদের আতিথ্য গ্রহণ করবে। তোমার যা অভিজ্ঞতা, আমারও সেই অভিজ্ঞতা। আজ বাস্তবিকই সুখী হয়েছি, একজন গোঁড়া হিন্দুর ছেলে এত উদার হতে পেরেছে এই দেখে! মনে রেখো, আশীর্বাদ বলতে কিছুই নেই, শুভেচ্ছাই সব। তোমার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল।"

মৌলবী সাহেব মাও-সুতন্ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করলেন। ইন্দোচীন, শ্যাম এবং চীনারা যে অবতারবাদকে মোটেই প্রশ্রয় দেয় না, তাও আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন।

উল্লিখিত বাক্য-বিন্যাসের সময় মৌলবী সাহেবকে 'স্যার' বলা উচিত ছিল কিন্তু গ্রাম্য প্রথায় 'স্যার' শব্দ ব্যবহার হয় না, ব্যবহার হয় 'আজ্ঞা', আমিও 'আজ্ঞা' শব্দই ব্যবহার করেছিলাম প্রত্যেকটি উত্তর দেবার প্রথমে।

মৌলবী সাহেব আমাকে ছাড়লেন না, তাঁর বাড়িতেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

তাঁর কাছ থেকে যেদিন বিদায় নেই সেদিন তিনি বলেছিলেন, "পৃথিবী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখবার সময় বেশ ভেবে-চিন্তে লিখবে।"

দুঃখের সহিত বলছি, সেই সুযোগ আমার মেলেনি। তাড়াতাড়ি লিখতে হচ্ছে এবং লিখেছিলাম ; নতুবা হয়ত কিছুই লিখতে পারতাম না, অথবা কিছুই লেখা হত না।

অনুশীলন সমিতি যাঁরা গঠন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ৺পুলিন দাস মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত মাখন সেন মহাশয়ের নাম আমার শোনা ছিল, চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাৎ কারো সঙ্গে ছিল না। ভাবছিলাম, তাঁদের কারো সঙ্গে দেখা হবে। শ্রীযুক্ত মাখন সেন মহাশয় কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। কলকাতায় কি করছিলেন তখনও আমার জানা ছিল না। নিজের অন্তরটাকে খুঁজে দেখছিলাম এঁদের এ সময়ে কোথায় থাকা উচিত ছিল। অন্তর থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল, এঁরা কেউই চীনের বিপ্লবী নন্। ভাল লাগল না এঁদের কথা চিন্তা করতে। বাস্তবিক পক্ষে নারায়ণগঞ্জ, ভৈরববাজার অথবা অন্য কোন স্থানেই এঁদের আড্ডা হওয়া উচিত ছিল।

বার বার ভুল করছিলাম, এটা চীন দেশ নয়, এটা বৃটিশ-অধিকৃত বঙ্গদেশ। এখানকার যে বিপ্লব, তা অবিকল কমিংটাং-পার্টির মতেই চলছিল। একটুও পার্থক্য ছিল না। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য যতটুকু বিপ্লবের দরকার, তার বেশি

এক চুলও কেউ অগ্রসর হচ্ছিলেন না। মৌলবী সাহেবের সঙ্গে এই নিয়ে অনেকবার কথা হয়। তিনি অবতারবাদকেই ব্যক্তি-স্বার্থপরতার জন্য দায়ী করছিলেন।

আমার সেই মৌলবী সাহেব মারা গেছেন, মুসলমানী মতে বলব অন্তকাল হয়েছে। আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন তবে দেখতে পেতেন, তাঁর মতবাদ অনেকের অন্তরে স্থান নিয়েছে। সুখের বিষয়, মৌলবী সাহেব না থাকলেও তাঁর জন্মভূমি, আমাদের জন্মভূমিই ভারতে সর্ব-প্রথম স্বাধীনতা অর্জন করবে।

কুট্টিদের মধ্যে 'হিউমার' অত্যধিকভাবে প্রচলিত। মৌলবী এবং মৌলানাদের রক্তচক্ষু এড়িয়েও তারা কবিগান গাইত, এখন গায় কি না জানি না। একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে তুইজন কুট্টির মধ্যে কবিতার প্রতিযোগিতা হয়। একজন যুধিষ্ঠিরের পক্ষে, অন্যজন অভিমন্যুর পক্ষে কবিতা তৈরী করছিলেন। অভিমন্যু হয়ে যিনি কবিতা বলছিলেন, তিনি যুধিষ্ঠিরকে জারজ সন্তান বলে বার বার আক্রমণ করছিলেন। যুধিষ্ঠির হয়ে যিনি কবিতা গাইছিলেন তিনি পেরে উঠছিলেন না। হঠাৎ তিনি একটি নূতন কবিতায় বিপক্ষকে একেবারে কাবু করে দিয়েছিলেন। কবিতাটি এখনও আমার মনে আছে।

কবি গাইছিলেন ঃ—

"আমু শেখের মামু যেমন ছাইড়া দিছে মেরীর পাল,
আতকা বেমরাইয়া উঠে না জানে কবির তাল।
হায় কি মজা, হায় কি মজা, হায় হায় রে!"

এখানেই পালা শেষ হল না। আরম্ভ হয়ে গেল তরজা। সেই তরজা বাস্তবিকই উপভোগ্য। কুট্টিদের তরজা শোনার পর ইচ্ছা হল, ঢাকাতে আরও কয়েকদিন থেকে যাই।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে একটি নিষিদ্ধ পাড়াতে চলে যাই। এটা হল আমাদের দেশের নিষিদ্ধ পাড়া। এখানে ভদ্রলোক

বেড়াতে যান না, যদিও যান নাক সিঁটকিয়ে পথ চলেন। দেখলেই মনে হয় ইনি এই পাড়ায় নবাগত এবং পথটা চলতে পারলেই রক্ষা পান। এরূপ অনেক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম। আমি ভাবছিলাম, চীন দেশের অনেক নিষিদ্ধ পাড়াতে গিয়েছি, সর্বত্র লুক্কায়িত দারিদ্র্যের ছাপ দেখেছি। দারিদ্র্য হতে কিসে রক্ষা পাওয়া যায়, সেই বিষয়েই সকলে আলোচনা করে। রাষ্ট্রনীতির আর্থিক দিকটা সমালোচনা করে, কিন্তু এখানে অন্য ধরণের চিন্তাধারা। প্রথম চিন্তা হল এমন কুস্থানে না-আসা। কেউ যদি দেখতে পায় তবেই বিপদ। সম্ভ্রম থাকবে না। দ্বিতীয় কথা হল, এরা পাপী, পূর্বজন্মের পাপের ফলে এদের এই দুর্দশা।

আমি যখন ধীর পাদনিক্ষেপে চলছিলাম, তখন কয়েকটি যুবক আমাকে দেখিয়ে বলছিল, "ঐ দেখ আমাদের পর্যটক, পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে!" শৈলেন বলছিল, "আমরা এখনও অবুঝ, ধীরে সবই হবে। এই ত সবেমাত্র 'টেরারিজম', তারপর আরও কত কিছু হবে, তখন হয়ত আপনার পাত্তাও পাওয়া যাবে না!"

সেইদিন রাত্রে কথা হচ্ছিল একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁর বাড়ি জলপাইগুড়ি। চীনের কথা শুনবার জন্য তিনি বড়ই আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁকে বলছিলাম চীন এবং আমাদের দেশের আচার-পদ্ধতি এক নয়। রাজনৈতিক অবস্থাও পৃথক্। চীনের কমিউনিষ্ট-পার্টি মাইনোরিটির স্বতন্ত্রতা রক্ষা করবে সবদিক দিয়ে, তাদের প্রতিজ্ঞাপত্রে বলে দিয়েছে। আমাদের কংগ্রেস সেরূপ কিছুই বলেননি, যেমন বলে না চিয়াং-কাইসেক। সেই জন্যই আমাদের দেশের মাইনোরিটি বিভ্রান্ত।

এর পরেও কথা রয়েছে অনেক। আমাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে চীনের আচার-ব্যবহারের মোটেই মিল নাই। আমাদের মধ্যে বাহ্যিক কতকগুলি হিংসামূলক আচার-ব্যবহার রয়েছে, তাকে আমরা বলি সাত্ত্বিকতা। এই সাত্ত্বিকতাই আজ মুসলিম

লীগের জন্ম দিয়েছে, হরিজনের জন্ম দিয়েছে। শত চেষ্টা করেও চিয়াং-কাইসেক চীনের মাইনোরিটির মনাকর্ষণ করতে পারছে না। তার একমাত্র কারণ হল আমাদের মধ্যে যাকে সাত্বিকতা বলা হয়, চীন দেশে তাই হল আসল বর্বরতা। দেখুন ত কত বড় পার্থক্য! আজ পূর্ববঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্য দেখতে পাচ্ছেন। তার কারণ অনুসন্ধান করুন দেখতে পাবেন, মোগল বা পাঠান তরবারির সাহায্যে ইস্‌লাম প্রচার করেনি। এদেশে ইস্‌লাম প্রচারের প্রথম কারণ হল গোঁড়া হিন্দুদের সাত্বিকতা, অদূর-দর্শিতা এবং হিংসা-পরায়ণতা।

চীনদেশে বুদ্ধধর্মের প্রভাব কত, চীনে কত মুসলমান আছে এবং তাদের প্রাধান্য কতটুকু, তাই জানবার জন্য অনেকে আগ্রহান্বিত হতেন। যখন শুনতেন, চীনের বুদ্ধরা গরুর মাংস খায় তখন তাদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেত। বিদেশের কি কথা বল্‌লে কার কোন্ দিকে সন্তুষ্টি হয় বুঝে উঠতে পারতাম না।

ঢাকাতে তখন দাঙ্গা ছিল না, কিন্তু দাঙ্গার পর্যায়ে এসেছিল। বৃটিশ সরকার সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। বৃটিশকে মোটা বুদ্ধি জোগাত বাঙ্গালী, চিক্কণ বুদ্ধি তাদের নিজস্ব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অত্যাচার করেছে হিন্দু বাঙ্গালীই বেশি। তথাকথিত টেরারিষ্টদের সঙ্গে হিন্দু পুলিশের আর্থিক সংঘাত হত। সামাজিক বিরোধিতা যে হত না, তা নয়। আমাদের গ্রামের বিশিষ্ট পুলিশ-অফিসারকে আমরা সামাজিক দিক দিয়ে বয়কট করেছিলাম, ফল হয়েছিল খারাপ। অনেকগুলি গোয়েন্দা গ্রামে বাসা করে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। এটা ত মামুলী কথা। যে স্থলে পুলিশ-অফিসার নিহত হ'ত, সে স্থলের অবস্থা আরও বিরূপ হয়ে দাঁড়াত। ব্যক্তিগত আক্রোশও অনেক স্থলে দেখা দিত। স্টালিন-সোভিয়েট দেখে এসেছিলাম সেইজন্য ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং দেশের আবহাওয়া মোটেই ভাল লাগত না। ভাল না-লাগবার

কারণ খুঁজতাম। দেখতাম, আমরা যাদের চিংফিং বলে উড়িয়ে দেই, তাদের সংস্কৃতি উন্নত আর আমাদের সংস্কৃতি অনুন্নত। পূর্ব-পুরুষের ভূয়া গুণগরিমা নিয়ে বাহাদুরী করলে ত চলবে না!

শৈলেন প্রায়ই চিন্তিত থাকত। একদিন সে আমাকে বল্লে, "চলুন দারজিলিং দেখে আসি। জামালপুর পর্যন্ত আমরা রেল এবং ষ্টিমারে যাব, তারপর বাইসাইকেলে দারজিলিং পর্যন্ত।"

আমি মনে করেছিলাম, হয়ত দারজিলিং দেখার ইচ্ছা হয়েছে, সেইজন্যই দারজিলিং যাবার এত তাড়া। আমরা যে হোটেলে থাকতাম সেই হোটেলে একজন ভদ্রলোক দারজিলিং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা প্রায়ই বলতেন এবং সুযোগ মত শৈলেনের সঙ্গে চুপি-চুপি কথাও বলতেন। চুপি-চুপি কথা বলা আমার মোটেই পছন্দ হ'ত না। পর্যটকের আবার গোপন কথা কি? শৈলেনকে কখনও পর্যটক, কখনও এ্যাডভেন্চারিষ্ট মনে করতাম। আমারও ইচ্ছা ছিল দারজিলিং কেমন শহর দেখে আসা যাক। শৈলেনকে বলছিলাম, "দারজিলিং যাবার পূর্বে শ্রীযুক্ত পি. এন্. ব্যানার্জিকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো অতীব দরকার।"

শৈলেন বলছিল, "ধন্যবাদের কোনও মানে হয় না। আপনাকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য ছিল, তিনি কর্তব্য করেছেন মাত্র। বর্তমানে যারা জেলে যাচ্ছে, পুলিশের অত্যাচারে অত্যাচারিত হচ্ছে, তারা কারও ধন্যবাদ প্রত্যাশা করে না। যাঁরা ফাঁসিতে ঝুলেছেন, তাঁরা কি কারও ধন্যবাদের প্রত্যাশী ছিলেন? আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি বর্তমানের আত্মবলিদানকারীদের স্মরণ নাও করে, তাতে কিছু আসে যায় না। এই ত সেদিন আপনি মুসলমানদের সভায় যেয়ে অপমানিত হয়ে এলেন, তাতে আপনার দুঃখ করার কিছুই নাই। ভবিষ্যতে যদি আমাদের দান অস্বীকার করে তবে কি আমরা যমের বাড়ি হতে ফিরে এসে প্রতিবাদ

করব? এটা হল আমাদের কর্তব্য; তাদের কর্তব্য তারা যদি না করে তবে দুঃখ করার মত কিছুই নাই।"

শৈলেনকে আর কিছুই বল্লাম না, নিজেই ব্যানার্জি মহাশয়ের বাড়িতে গেলাম। তখন তাঁর ছেলে তবলা বাজাচ্ছিলেন। ব্যানার্জি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম সকল 'রায় বাহাদুর' সমান নন্, কাহারও মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকা সত্ত্বেও 'রায় বাহাদুর' উপাধি গ্রহণে দ্বিধা বোধ করেন না।

বঙ্গদেশের মধ্যে যাঁরা তবলা বাজিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রায় বাহাদুর এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্যতম। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলাম।

ঢাকার পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদীর বিশেষত্ব আছে। পৃথিবীর অনেক নদী দেখেছি, তার মধ্যে ব্রহ্মদেশের তানাসিরিন ভ্যালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী, দ্বিতীয়টি বুড়িগঙ্গা। উভয় নদীর সমতা রয়েছে। এই নদী দুটি পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে সাগরে মিশেনি। পূর্ববঙ্গ যখন সাগর ছিল এবং উত্তর-পশ্চিম হতে সিল্ট-সমাবেশ হয়ে জমির পত্তন করছিল তখন থেকে এই সমুদ্র-গহ্বর পূর্ণ হবার সুযোগ হয়নি। উত্তর এবং পশ্চিমের জলধারা সমুদ্র-গহ্বরের মধ্যে পড়ছিল, সেইজন্যই বুড়িগঙ্গা পূর্ববঙ্গের সব নদী হতে গভীর। জলধারার গতি এবং কুণ্ডলী পাকিয়ে তলিয়ে যাওয়া দেখলেই কতকটা অনুমান হয়। বুড়িগঙ্গাতে স্নান করেছিলাম এবং একদিন প্রায় কুড়ি হাত জলের নীচে গিয়েও জলের গভীরতা নির্ণয় করতে সক্ষম হইনি।

নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা হতে আমরা নারায়ণগঞ্জে যাই। নারায়ণগঞ্জ শহর এবং বন্দর—পাটের আড়তে ভর্তি। পূর্ববঙ্গের অনেক পাট-ব্যবসায়ী তখন নারায়ণগঞ্জে থাকতেন। পাট-উৎপাদনকারী শতকরা নব্বইজন কি করে জীবন কাটায় দেখেছিলাম। শুধু দেখেছিলাম বল্লে কিছুই হবে না। একজন পাট-উৎপাদনকারীর বাড়িতে থেকেছিলাম। তার সবচেয়ে ভাল খাদ্য—শুকনো মাছ লঙ্কা বেটে সিদ্ধ করে মেশানো, আর ভাত। নারায়ণগঞ্জে যারা আড়তদার, তারা খায় বড় বড় রসগোল্লা, সন্দেশ, ক্ষীর, সরু চালের ভাত আরও কত কি!

শৈলেনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম এটা হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নয়, এটা হল শোষিত এবং শোষকের প্রশ্ন। যে পর্যন্ত শোষক-শ্রেণী নির্মূল না হয়, সে পর্যন্ত এদের উদ্ধার নাই। এরা হিন্দুও না, মুসলমানও না, এরা শোষিত। শোষকদের মধ্যে যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হবে তখনই এদের মুক্তি আসবে। অবতারবাদ ত হাতের ময়লা! আজ তুমি হিন্দু আছ, কাল মুসলমান হতে পার, পরশু খৃস্টান হয়ে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে পার, কিন্তু খাদ্য বন্ধ করতে পার কি?

নারায়ণগঞ্জ পৌঁছামাত্র ফেউ লাগল পেছনে। দুটি ছেলে ক্রমাগত আমাদের সঙ্গে চলছিল। অবশেষে সেখানেও এক ভদ্রলোক আমাদের আশ্রয় দিয়ে নিশ্চিন্ত করেন। আমরা জাহাজের অপেক্ষায় ছিলাম মাত্র। আমরা যখন শহরে বেড়াচ্ছিলাম তখন একজন ইংরেজের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি সেখানকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান্ ছিলেন। তিনি আমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান।

কথা-প্রসঙ্গে তিনিই বলেছিলেন, ইন্‌ফরমার এবং ছোট-খাট

সরকারী কর্মচারীরা আপনাদের কষ্ট দেবে, এতে ভয় খাবেন না, আমি এখানে আছি। এখানকার লোক ভ্রমণ কাকে বলে, বোঝে না। তারা মনে করে, নবাগতমাত্রই কিছু ভয়ঙ্কর হবে এবং তাদের জেলে পূরতে পারলে দু' পয়সা পকেটস্থ করতে পারবে।

ইংরেজের কথা অমৃত-সমান ছিল। বাস্তবিক, খাঁটি ইংরেজ বা বৃটিশদের মধ্যে সকলেই যে সাম্রাজ্যবাদী তা নয়। ভাল মানুষেরও অভাব নাই। আমাদের দেশে তখনও প্রায় রাজনৈতিকই বুঝতেন না, সাম্রাজ্যবাদী কাকে বলে। যারাই ধনীদের হয়ে স্বদেশবাসী অথবা বিদেশীকে শোষণ এবং শাসন করতে সাহায্য করে, তারাই হল সাম্রাজ্যবাদী।

এই বৃটিশ পরিষ্কার ভাষায় বলছিলেন তিনি সাম্রাজ্যবাদী নন। তিনি কাহাকেও শোষণ এবং শাসন করতে অনিচ্ছুক।

সেইদিন রাত্রে আমরা নারায়ণগঞ্জ ত্যাগ করি। নারায়ণগঞ্জ হতে বিদায় নিয়ে জাহাজে সুস্থির হয়ে বসার পর শৈলেন বল্লে, "হরিবোলের দলই এখানে বেশি, তারা চায় বৃটিশ আমাদের দেশ হতে চলে যাক্ ও তারা আরও বেশি করে মুনাফা লুণ্ঠন করুক। কি জানি কি হবে বলতে পারছি না, আমার মন ক্রমেই মুনাফা লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠছে।"

শান্তি পেয়েছিলাম অনেকটা। শৈলেন কিছুটা বুঝতে পেরেছে।

জামালপুর

জামালপুর পৌঁছে আমরা একজন উকিলের বাড়িতে আশ্রয় নেই। ভদ্রলোকের অমায়িকতা এবং অন্যান্য গুণ বাস্তবিকই আমাদের মোহিত করেছিল। পরের দিনও থাকতে বলেছিলেন। সকালের দিকে শহর ও শহর থেকে একটু দূরেও বেড়াতে যাই।

বাস্তবিক জামালপুর একটি উৎকৃষ্ট স্থান। এই শহর যদি উন্নত হয় তবে ইউরোপের যে কোনও শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মহত্ত্ব অর্জন করতে সক্ষম।

পরের দিন বিকালবেলা ফুটবল খেলা ছিল। দর্শকদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এবং বেকার শিক্ষিত সমাজ। কৃষক অথবা মজুর কেউ ছিল না। মনে মনে হেসেছিলাম। তোমাদের রাজত্ব করে নাও, তোমাদের কলহের মধ্যেই মজুর এবং কৃষকের উন্নতির বীজ লুকিয়ে আছে।

খেলা দেখে ফেরবার পরই পুলিশ-ষ্টেশন হতে একটি কনেষ্টবল আমাকে থানায় যেতে বল্লে। গেলাম সেখানে। দারোগা পাসপোর্ট বুঝে না। আমিই বল্লাম, "যতটুকু পারেন নকল করে রেখে দিলেই হবে।" দারোগা তাই করছিলেন। আমাদের নিয়ে যখন দারোগা ব্যস্ত, তখন একজন মুসলমান দারোগা— একজন মুসলমান, হয় চাষা নয় মজুরকে বেশ অত্যাচার করছিল। দুঃখ হয়েছিল, আর ভাবছিলাম অত্যাচারিত সব ভুলে যাবে একটি কথায়! সেই কথাটি হল 'ইসলাম বিপন্ন'! ইসলামের জন্য আল্লা যে স্বর্গরাজ্য রচনা করে রেখে দিয়েছেন, সেখানে অত্যাচারিত ইস্‌লাম মতবাদী যেতে পারবে না যদি সে ইসলাম বিপন্নে সায় না দেয়।

সেই রাত্রে গানের বৈঠক বসেছিল। আজকাল যাকে আমরা সাংস্কৃতিক বৈঠক বলি সেই ধরণের কিছু। গান মোটেই ভাল

লাগছিল না, গানের সুরে ভেসে আসছিল চাষার প্রতি পুলিশ অত্যাচারের গোংড়ানি। কতক্ষণ পর উঠে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।

শৈলেনের বড়ই তাড়াতাড়ি ছিল, আমরা পরের দিনই গাইবান্ধা পৌঁছি। শহর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং শিক্ষিত লোকের বড় বসতি। এখানে কয়েকটি লেকচার দিতে হয়েছিল। মাত্র দুইদিন ছিলাম, এতেই শৈলেন অতিষ্ঠ হয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল আরও একটি দিন এখানে থাকি, কিন্তু হয়ে উঠল না। রংপুরের দিকে রওয়ানা হলাম।

রংপুর শহরে পৌঁছবার পথে একটি নদী আছে। আমরা নদীতীরে যেয়ে দেখলাম, নদীতে হাঁটুজলের বেশি জল হবে না। হেঁটেই যাওয়া যাবে। নদীটা পার হয়ে কয়েকখানা কুঁড়েঘর দেখতে পেয়ে শৈলেনকে বল্লাম, "একটু বিশ্রাম করতে দাও। দুটো মাচা আছে, একটু শুয়ে নিই।"

শৈলেন এবং আমি শুয়ে রইলাম। হঠাৎ কোথা হতে একটা ছেলে এল এবং শৈলেনের মুখের উপর ঝুঁকে কি দেখতে আরম্ভ করল! প্রথমত শৈলেন ছেলেটাকে ধম্‌কে সরিয়ে দিল, তারপর যখন ছেলেটা আবার তার কাছে এল তখন একটা চড় মেরে দিল। চড় খেয়ে ছেলেটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকলাম।

আমরা যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, তখন একদল পুলিশ এসে কুঁড়েঘরটা ঘেরাও করলো। সার্জেণ্ট বললে, "Surrender your arms and ammunition."

বিষয়টা বুঝতে পেরে শৈলেনকে বল্লাম, "তুই যেমন আছিস তেমনি থাক্।" তারপর সার্জেণ্টকে বল্লাম, "মিষ্টার সার্জেণ্ট, ভেতরে আসুন, ভীত হবেন না। আমাদের কাছে কিছুই নাই, দুইখানা সাইকেল মাত্র।"

সার্জেন্ট ভেতরে আসতে রাজি ছিলেন না। পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করে, সেখানি বাইরে ফেলে দিয়ে বল্লাম, "দয়া করে আমার পাসপোর্ট দেখুন।"

পাসপোর্টটা কুড়িয়ে নিয়ে সার্জেন্ট দেখল। বুঝল আমরা কে! তারপর সহাস্যবদনে ঘরে ঢুকল।

আমি বল্লাম, "একটা ছেলে ঘরে ঢুকে আমার সাথীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে কি দেখছিল, তাতে এর রাগ হয় এবং একটা চড় মেরেছিল ; সেই ছেলেটাই বোধহয় আমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে ?"

"ঠিক তাই, এখন চলুন আমরা শহরে যাব।"

সার্জেন্টের সঙ্গে শহরে যেয়ে থানায় গেলাম। বড় দারোগার মুখ ত একেবারে কালো হয়ে ছিল। তখনও তাঁর ধারণা ছিল, আমরা টেরারিষ্ট। বড় দারোগাকে শুনিয়ে সার্জেন্টকে বল্লাম, "Look at the face of this police officer." সার্জেন্ট বল্লে, "Inexperienced."

সার্জেন্টের অনুরোধে আমরা এক রায় বাহাদুরের আতিথ্য গ্রহণ করি। রায় বাহাদুর আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং উত্তম খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেন।

জয়দেবপুর

এর পর আমাদের গন্তব্যস্থান ছিল ভাওয়াল বা জয়দেবপুর। ভাওয়ালের রাজবাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানকার ম্যানেজার মহাশয়ের পুত্র দারজিলিং-এ লাট সাহেবের উপর বোমা মারতে গিয়েছিলেন। তাতেই ভাওয়ালে তখন সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। রাজবাড়ি দেখা অথবা থাকবার সুযোগ আমাদের যদিও হয়নি তবুও আমরা ভাওয়ালে এক রাত্রি কাটিয়েছিলাম।

বিকালে একটি জঙ্গলের পাশে বসে মধু খাচ্ছিলাম, সে সময় একজন যুবক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে দারজিলিং-এর দুর্ঘটনার কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করে। যুবকের দুঃখ প্রকাশ করার একমাত্র কারণ ছিল, রাজবাড়িতে না থাকার জন্য যেন আমরা দুঃখিত না হই। আমরা অনেকটা সুখ-দুঃখের অতীত হয়েছিলাম, সেজন্য অনুতাপ করার মত কিছুই ছিল না।

আমরা যে জঙ্গলের পাশে বসে মধু খাচ্ছিলাম, তার আশে-পাশে প্রচুর কাঁঠালের বাগান দেখে বেশ আনন্দ হল। ভাওয়াল-রাজকুমারের মোকদ্দমায় যেমন করে ভাওয়ালের নাম সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল তেমনি ভাওয়ালের কাঁঠালও পূর্ববঙ্গের সর্বত্র নাম অর্জন করেছিল। অসময়ে ভাওয়ালে যাওয়ায় কাঁঠালের দেখা পাইনি—পেয়েছিলাম মধুর সন্ধান।

ভাওয়াল হতে ঘুরে-ফিরে আমরা রাজসাহীতে পৌঁছি। সেখানকার জমিদারবাবুরা আমাদের থাকতে দিয়ে বাধিত করেছিলেন। কয়েকস্থানে লেকচারও দিয়েছিলাম। জাপানীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি কথা বলার জন্য অনেকে কুপিত হয়েছিলেন। তাঁদের কোপানলে আমি দগ্ধ হইনি, শুধু বুঝতে পেরেছিলাম রাজসাহীর হিন্দুদের জাপানী-প্রেম অজ্ঞতার উপরই ভিত্তি করে মনের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এর পরেও আবার রাজসাহীতে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের নেতাজী নিরুদ্দেশ ছিলেন।

দ্বিতীয়বার যখন জাপান-সম্বন্ধে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম তখন অনেকেই আমাকে কমিউনিষ্ট পার্টির অথবা বৃটিশ সরকারের দালাল বলেছিল। দালাল মানে এজেন্ট, কিন্তু আমি ত কারো এজেন্টি করার জন্য ভ্রমণ করিনি, তবে কেন আমাকে এরা এজেন্ট বলছে? বিষয়টি আলোচনা করার মত লোকও পাচ্ছিলাম না। মনে বড়ই আঘাত লেগেছিল। আমরা জানি, জাপানী সাম্রাজ্য-বাদীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মত চতুর ছিল না, সেজন্যই বিদেশী পর্যটকের কাছে তাদের বোকামী সহজেই দৃষ্টিগোচর হত।

জাপানীদের প্রশংসাও আমি করেছি কিন্তু তাদের প্রশংসা আমাদের দেশের কারো কাছে মনঃপূত হয়নি। যখনই জাপানীদের প্রশংসা করেছি তখনই শ্রোতৃমণ্ডলী মুখ ফিরিয়ে থাকতেন। রাজসাহীতে অভিজ্ঞতা বলার পর আর কোথাও অভিজ্ঞতা বলব না ঠিক করে পথ চলছিলাম। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল কলিকাতা। আমরা একটু তাড়াতাড়ি করেই পথ চলছিলাম।

কোথাও এক রাত্রির বেশি থাকতাম না। একদিন পথেং কতকগুলি সাঁওতালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারা তিড়িং তিড়ি় করে পথ চলছিল। পদ-নিক্ষেপে মোটেই স্থিরতা ছিল না।

যাদের পদচালনে স্থিরতা এবং ধীরতা নেই, তারা বাস্তবিকই আদি যুগের অবস্থায় আছে। আদি যুগ আর বর্তমান যুগ নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিলাম না। লক্ষ্য করছিলাম তাদের চুলের বৈশিষ্ট্য। চুল সূক্ষ্ম, মসৃণ ও অতি লম্বা; এত লম্বা, আর কোন জাতির মধ্যে বেশি দেখা যায় না। চিক্-বোন্ একটু উঁচু, চোখের তারার চারিদিকটা ঘোলাটে। বক্ষ প্রশস্ত, হাত শরীরের অনুপাতে লম্বা, নিতম্বদেশ চওড়া। পায়ের গোড়ালী হতে হাঁটু পর্যন্ত সরু। আরও একটু মোটা হলে মানাত বেশ।

ছিলাম সাইকেলের উপরে, নেমে পড়লাম এবং তাদের পেছনে চলতে আরম্ভ করলাম। এরূপ ভাবে কতক্ষণ চলে আবার বাই-সাইকেলে উঠলাম; কিন্তু বিশেষ একটু কারণে আমার পেট ফুঁড়ে হাসি বেরোতে লাগ্‌ল। সে যেন পাগলের হাসি! কারণটি না বলে পারছি না।

আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু তাঁর বংশ-পরিচয় দিতে গিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের একটি স্থানের নাম বলেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ নাকি সেখান থেকে এসেছিলেন।

মানচিত্র আমার মনে অঙ্কিত ছিল, এখনও আছে। চিন্তা করে দেখলাম, বন্ধুবর-বর্ণিত স্থানের আশেপাশে কোথাও সাঁওতাল অথবা সেই শ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল না এবং বর্তমানেও নাই। তবে কি করে বন্ধুবরের আকৃতিটা সাঁওতালদের মত হ'ল? আমাদের দেশে অনেকের আকৃতি দেখলে মনে হয় তাঁরা যা বলে পরিচয় দেন, তা ঠিক নয়। সাঁওতাল-রক্ত তাঁদের শিরায় শিরায় বইছে। সাঁওতাল চঞ্চল জাত। কৃষ্টির আওতায় এসে তাদের বংশধররা ধীর এবং স্থির হয়েছে মাত্র।

মুর্শিদাবাদ

আমরা তারপর আসি মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ পৌঁছি বেলা দ্বিপ্রহরে। তখনই বহরমপুর রওয়ানা হবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু গঙ্গাতীরবাসী এক উকীলবাবুর অনুরোধে সে দিনটা মুর্শিদাবাদে থাকতে হয়েছিল। শহরের অনেক স্থানেই উর্দু অক্ষরে অনেক কিছু লেখা ছিল। উর্দু অক্ষর ভুলে গিয়েছিলাম যদিও ছেলেবেলায় মৌলবীসাহেব বাড়িতে এসে উর্দু এবং ফার্সি শেখাতেন। তবু যুক্ত অক্ষর ছাড়া অন্য অক্ষরগুলি পড়ে কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম।

বিকালবেলা এক বৃদ্ধ পাঠান আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁকে উত্তম আসনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "বলুন আপনি কি জানতে চান?"

বৃদ্ধ একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে বললাম, "আপনি যা বলতে চেয়েছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি।"

বৃদ্ধের ঠোঁট একটু কেঁপে উঠল, তারপর বললেন, "তুমি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছ দেখছি, বল ত আমি কি ভাবছি?"

আমি বললাম, "আপনি ত আর পাঠান থাকেননি একেবারে বাঙ্গালী হয়ে গেছেন, আপনার মনের ভাব বুঝতে পারব না কেন? আপনি সঙ্কোচ বোধ করছেন এই ভেবে যে, এতটা মেশামিশির পরেও যেন বাঙ্গালীদের সঙ্গে ঠিক্ মিলতে পারছেন না! আপনার বংশধরেরা হয়ত পারবে।

আপনাদের রাজত্বকালে আমাদের দেশে এত ছুৎমার্গ ছিল না। বৃটিশ রাজত্ব-সময়ে বৃটিশরা হিন্দুদের মধ্যে ছুৎমার্গ, কাষ্টইজম ভাল করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আপনাদের রাজত্বকালে যা নষ্ট হতে চলছিল, বৃটিশ তাকে তাড়াতাড়ি সজীব করতে সক্ষম হয়েছিল। পৃথিবীর কোন দেশে, কোন জাতির মধ্যে কাষ্টইজম

অথবা ছুৎমার্গ নাই। আপনি সেজন্য দুঃখিত হবেন না, সবই যাবে, আমাদের দেশও সুখের হবে।"

বৃদ্ধের আনন্দ দমন করে রাখবার ক্ষমতা ছিল না, তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। আমিই বোধ হয় সর্বপ্রথম ভারতবাসী যে বৃদ্ধকে এত বড় একটি সুসংবাদ দিতে পেরেছিল।

পরের দিনটাও থাকতে হয়েছিল। নবাব-বাড়ীতে গিয়েছিলাম। নবাব সাদর-সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মনে ছিল অহঙ্কার। তাঁর অহঙ্কার দূর করবার জন্য তাঁকে বলেছিলাম, "আমাদের দেশের সুবাদারদের বাড়িঘর দেখলে মনে হয়, তাঁরা নিতান্ত দরিদ্র। চীনের মামুলী জমিদারগণও ধনদৌলত, কার্যকলাপে আমাদের দেশের সুবাদারদের চেয়ে ঢের বেশি ধনী। এই ধরুন আগ্রার দুর্গ। আগ্রার দুর্গ চীনদেশের মামুলী জমিদারের দুর্গ হতে বড় নয়।

সুবে বাংলার সুবাদারের বংশধর আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন! কি করি, আমি কখনও 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলতে রাজী ছিলাম না। নবাবসাহেব অনেকগুলি পুরাতন জিনিস দেখিয়ে বললেন—"এমন দ্রব্য-সামগ্রী কোথাও দেখেছেন কি?"

কিন্তু সত্যি বলতে কি, কারুকার্যের দিক দিয়ে এমন কিছু তিনি আমাকে দেখাতে পারেননি, যার সঙ্গে চীনের কারুকার্যের তুলনা করা যেতে পারে। সবগুলি দ্রব্যের উপর, সবগুলি হাতিয়ারের উপর অনৈপুণ্যের ছাপ ছিল। নিজের দেশের, নিজের জাতের দ্রব্য-সামগ্রীর অপ্রশংসা করা মহাপাপ, আমি সেই মহাপাপে পাপী।

সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলা খুবই দরকার। আরব অথবা ইহুদী সভ্যতা, নরডিক অথবা ইন্দো-এরিয়ান সভ্যতা, নিগ্রো অথবা আদিবাসী সভ্যতার

মধ্যে নৈপুণ্য খুব কম দেখা যায়, যেমন দেখা যায় দ্রাবিড় এবং চীন সভ্যতার মধ্যে। তাজমহল সুন্দর কিন্তু কুড়ি হাত প্রশস্ত প্রস্তরের কাছে দুই হাত প্রস্থ প্রস্তরের সমাবেশ কোথাও দেখা যায় না। প্রত্যেকটি প্রস্তরের একটা মাপ আছে, তার মধ্যে কম বেশি নাই।

শুধু আয়তনের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে চলবে না, প্রকারভেদও দেখতে হবে। যদি কোথাও ত্রিভুজ প্রস্তর থাকে, সেখানে অযৌক্তিকভাবে চতুর্ভুজ প্রস্তরের সমাবেশ চীন অথবা দ্রাবিড় ইমারতে দেখা যায় না। দক্ষিণ-ভারত অনেকেই ভ্রমণ করেছেন, দক্ষিণ-ভারতের নৈপুণ্যের কথা অনেকেই বলেছেন কিন্তু এদিকটা সকলেই ফাঁকা রেখে চলে গেছেন। নাম অর্জনের যেমন লোভ, তেমনি রয়েছে বদনামের ভয়। শুনেছিলাম পর্যটক উভয় গুণের অনেক উর্ধ্বে; কিন্তু কার্যতঃ আমি কি করছি জানি না।

বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ হতে বহরমপুরে যাই। হিলী, বহরমপুর, এসব হল প্রসিদ্ধ স্থান। আরামের লীলাভূমি বললেও চলে। সকালে জেলখানার সামনে দিয়ে ডেটেনিউ মহাশয়দের জন্য খাদ্য-সামগ্রীর চালান দেখে আমারও জেলে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল।

১৯০৮ সাল হতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত যাঁরা জেলে ছিলেন তাঁদের প্রতি আমার দণ্ডবৎ! ক্লাস ছিল না, ছিল ঘানি আর চাবুক, ডাণ্ডা-বেড়ি ত কথায় কথায়! তারপর দেখা দিয়েছিল মাখন, ঘড়ি, কলের কলম, আরও কত কিছু! জেলে অনেকের সুখের যৌবন বয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু যাঁরা বাইরে ছিলেন, তাঁদের মনোবৃত্তি ছিল পূর্বের মত এবং তাঁদের দান চিরস্মরণীয়। একটি যুবক সারাদিন কিছু না খেয়ে চাঁদা উঠিয়ে যখন আমার হাতে দিয়েছিলেন তখন তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি পরিশ্রান্ত ছিলেন। তাঁর শরীরের অবস্থা অসাধারণ দেখে তৎক্ষণাৎ তাঁকে খাদ্য এনে দিলাম। অভিমান নয়, কপট আত্মম্ভরিতা নয়, সরল এবং খাঁটি কথা যুবকের মুখ থেকে বের হল, "উপবাস করে আমি অভ্যস্ত, ভীত হবেন না।"

চীনদেশে অনেককে উপবাসী দেখেছি, জমিতে কাজ করতে দেখেছি কিন্তু এমন সুন্দর এবং সরল ভাষা কারো মুখ থেকে বের হতে শুনতে পাইনি। ধন্য আমার দেশ, ধন্য আমার জাত! তাই মনে হয়, আমরা কখনও মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য করব না; আমরা জাগব, আমরা মানুষ হব, আমাদের দেশ আবার জগৎপূজ্য হবে। অন্য জাতের মধ্যে যার অনেক কিছু দেখা যায় না, তার অনেক কিছু আমাদের মধ্যে আছে, আমরা নিশ্চয় অমর হব।

কলিকাতার পথে কৃষ্ণনগর—বাস্তবিকই ঐতিহাসিক স্থান। বাসিন্দা সবই খাঁটি বাঙ্গালী। পথের দু'দিকে যত গ্রাম দেখতে পেলাম, সর্বত্র বাঙ্গালীর বসবাস দেখে আনন্দ হয়েছিল। লোকগুলি প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ, নাক অতিশয় পাতলা, চোখ বড় বড়, চুল চিক্কণ এবং মসৃণ, কপাল প্রশস্ত, শরীর পাতলা। প্রধান খাদ্য—ভাত, মাছ, চিঁড়া মুড়ি, দই, দুধ। অপূর্ব সমাবেশ বলতেই হবে। ইন্দো-এরিয়ানের সংখ্যা খুবই কম। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিশ্চয়ই এঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন।

আমি যখন এই ধরণের চিন্তায় বিভোর তখন আমরা শহরের মধ্যস্থলে। উপযাচক হয়ে একজন ভদ্রলোক আমাদের একটি গীর্জায় নিয়ে গেলেন। তাঁর মানে তিনি মনে করেছিলেন আমি খৃষ্টান, অতএব আমাকে গীর্জা দেখানোই তাঁর একমাত্র কর্তব্য।

চীনের গীর্জার পেছনে অপূর্ব সাজে সজ্জিত কবরখানা দেখে ভীত হয়েছিলাম। এখানে দেখলাম আরও এক অপূর্ব জিনিস! ফাদার আদেশ করছিলেন। হেসে বললাম, "আমি প্রফেটইজমের বহু উর্ধ্বে।" ফাদার কথা শুনে যেন অজ্ঞান হয়ে গেলেন! প্রফেটইজম, প্রিষ্টইজম, আরও কয়েকটি ইজমের নাম করে বললাম, "এ সবের তোয়াক্কা আমি রাখি না।"

ব্রাদার অবাক হলেন, চলে গেলেন আমাকে ছেড়ে দিয়ে।

পরের দিনটা সেখানেই থাকতে হল। কতকগুলি লোক আমার অভিজ্ঞতা শুনতে চায়। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এদের কাছে বাজে কথা বলাই ভাল হবে কিন্তু হঠাৎ আসল কথা বেরিয়ে পড়ল। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারলাম না।

তখন দেশটা ছিল বিদেশ সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত।

বিদেশের কথা শুনে অনেকের যেন ঘুম ভাঙ্গল! লক্ষ্য করলাম, আমার সংবাদ সকলে শুনতে ইচ্ছুক ছিল না। তার কারণ অতি সহজ—জলের মত পরিষ্কার। তাঁদের মনোভাব ছিল—একজন 'বিশ্বাসে'র কাছ থেকে বিদেশী সংবাদ শুনব, সে কেমন কথা?

কৃষ্ণনগরের আশেপাশে বিশ্বাস-সম্প্রদায়ে ভতি ব্র। তাঁরা সকলে খৃষ্টান, অতএব আমিও খৃষ্টান। আর একটা ভুলও করেছিলাম। খেতে বসে জলখাবারের গ্লাসটা বাঁ হাতে ধরেছিলাম। অতএব আমি নিশ্চয় খৃষ্টান!

সাবাস দেই খৃষ্টানী নির্ধারণের মাপকাঠির! মনে মনে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বের প্রশংসা করেছিলাম। যে দেশে যে প্রকারের নেতৃত্বের দরকার, সেই দেশে সেই রকমের নেতৃত্ব না হলে চলে না।

কৃষ্ণনগরের শিশু-সদন দেখতে গিয়ে বড়ই খুশী হয়েছিলাম। যত পরিত্যক্ত শিশুকে শিশু-সদনে পালন করা হয়। যত্নের অভাব ছিল না। এদিক দিয়ে পাদ্রীদের প্রশংসা যারা না করবে তারা দুরাচার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। চীনের পাদ্রীরা কবর সাজাতে উদ্‌গ্রীব, আর এখানে শিশুরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। কেন এমন হয় তার কারণ জানি না। সিষ্টারদের ধন্যবাদ দিয়ে আমরা নবদ্বীপের দিকে রওয়ানা হলাম।

নবদ্বীপ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি নবদ্বীপ। ন্যায় দর্শনের চরম উৎকর্ষ এখানেই লাভ করেছিল। বেদান্তের শেষ কথা 'জানি না' এখানেই জানবার চেষ্টা হয়েছিল। এসব হল ঐতিহাসিক কথা। পর্যটক ইতিহাস সমালোচনা করে না ; যা দেখে, তাই সে লিপিবদ্ধ করে।

নবদ্বীপে যারা তীর্থ করতে আসে, তাদের মধ্যে মণিপুরীরাই বিশেষ স্থান পেতে পারে। তারপরই সাহাশ্রেণী। কেন তারা প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে বলব, অন্ধ বিশ্বাসই তার প্রধান কারণ।

গঙ্গায় স্নান করতে যারা যায়, তারা তাদের বাঁ-দিকে একটি বাড়ি দেখতে পায়, আমিও সেই বাড়ি দেখেছিলাম এবং আকৃষ্ট হয়ে সেই বাড়িতে প্রবেশ করেছিলাম। বহির্দ্বারে লিখা ছিল মাতৃমন্দির। অনেক মা সেখানে—কেহ অশ্রু নিক্ষেপ করছিলেন, কেহ সন্তানের মায়া পরিত্যাগ করতে হবে ভেবে কম্পিত হচ্ছিলেন, আর কেহ-বা সন্তান প্রসবের অপেক্ষায় ছিলেন। এখান থেকে প্রত্যেকটি শিশুকে খৃষ্টান মিশনারীরা পাঁচ টাকায় কিনে নিয়ে প্রতিপালন করেন।

অনেকে হয়ত দুঃখিত হবেন কিন্তু মিশনারীদের সন্তান কেনার জন্য আমি খুবই আনন্দিত। কারণ, ভ্রূণ-হত্যা হতে উদ্ধার করেন মিশনারীরা। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নরমাংসভোজী কাপালিক আমার কথা শুনে কুপিত হবে বটে কিন্তু আমি তাতে শঙ্কিত হব না।

কীর্তন সুর, বাউল সুর এবং রামপ্রসাদী সুর বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি। সে ঘোর নাস্তিক হউক, কট্টর মুসলমান হউক আর নরদেহধারী নরপশু হউক, এই তিনটি সুরে তাকে মাতোয়ালা

করবেই। নবদ্বীপে যেয়ে মণিপুরীদের কীর্তন শুনে মাতোয়ালা হয়েছিলাম।

নবদ্বীপ হতে রওয়ানা হয়ে পথে এক স্বজেলাবাসী ভদ্রলোকের অতিথি হই। মিশ্র তাঁর উপাধি, হালে ভট্টাচার্য হয়েছেন। পরিচয় হওয়াতে সাদর-সম্ভাষণ হ'তে বঞ্চিত হইনি। তারপরই কালনা।

একটি দোকানে চা খাবার সময় একজন লোক বলছিল, সি. আর. দাশ একজন বাঙ্গাল। বাঙ্গাল শব্দে পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা কি বুঝায় তখন জানতাম না। শ্রীহট্টবাসীরাও বাঙ্গাল শব্দ ব্যবহার করে। তার মানে "বোকা" অর্থাৎ লোকটা কিছুই জানে না।

সি. আর. দাশের বাৎসরিক আয় ছিল পঁয়ষট্টি হাজার পাউণ্ড! তিনি কি করে বাঙ্গাল, মানে 'বোকা' হতে পারেন বুঝতে না পেরে লোকটাকে চায়ের দোকান হতে বের করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, "অস্ট্রেলিয়ার 'সাদা অস্ট্রেলিয়া' সংবাদপত্রে দেখেছি, সি. আর. দাশের বাৎসরিক আয় পঁয়ষট্টি হাজার পাউণ্ড আর তুমি তাঁকে 'বাঙ্গাল' বলছ? তুমিই বাঙ্গাল, আমরা যতক্ষণ বসে চা খাব ততক্ষণ এখানে তোমার প্রবেশ নিষেধ।"

লোকটা মাথা নত করে চলে গিয়েছিল।

পার্বতীপুর রেলওয়ে-জংশন। লোকের ভিড় লেগেই আছে। আমরা গাড়ি হতে নেমে যখন লাগেজ্ কম্পার্টমেণ্ট হতে আমাদের বাইসাইকেল আনতে যাচ্ছিলাম, তখন এক দল লোক আমাদের সঙ্গে চললো। তারা সকলেই ভদ্রলোক বলেই মনে হল কিন্তু কতক্ষণ পরই বুঝতে পারলাম, এরা সকলেই আই. বি. বিভাগের লোক।

শৈলেন একটি কথাও বলছিল না। সাইকেল নিয়ে আমরা কলোনীতে চলে যাচ্ছিলাম। দুই একজন আই. বি. পাগলের মত আমাদের পেছনে ছুটছিল। এদের পাগলামি দেখে প্রবল বেগে সাইকেল চালিয়ে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে পৌঁছি। দারজিলিং হতে তাঁর নামে একখানা পত্র এনেছিলাম।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল, ইতিমধ্যে চা খেয়ে তৃপ্ত হলাম। যে দুইজন আই. বি. আমাদের পেছনে পাগলের মত ছুটছিল, তারা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। আমাদের আশ্রয়দাতা তাদের চিনতেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে কেন ?"

"আজ্ঞে দুই একটি কথা বলে চলে যাব, রিপোর্ট ভাল লিখতে পারলে অন্তত পাঁচটা টাকা পাওয়া যাবে।"

ঘৃণার পরিবর্তে আমার দয়া হয়েছিল। আই. বি.-কে বল্লাম, "আচ্ছা লিখে নাও, আমি বলে যাচ্ছি।"

সে লিখতে আরম্ভ করল। লেখা শেষ হলে সবটা কাগজ পড়ে নিজের নাম লিখে দিলাম। যুবকের কি আনন্দ! আনন্দের কারণ, পাঁচটি টাকা পাবে। পাঁচটি টাকা পাওয়াই সবচেয়ে বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই যুবকদের পক্ষে।

সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করার পর ভারত-ভ্রমণ লিখছি, সেজন্যই বলতে পারি যা ঘৃণা করা উচিত, আমাদের দেশের লোক তাকে

ঘৃণা না করে অন্য কিছু ঘৃণা করে। হয়ত এটা আমাদের কৃষ্টি। যা বলতে যাচ্ছি তা বলতে পারছি না, ভাষার অভাব বলতেই হবে। উপসংহারে বলছি, কেউ যদি বুঝতে পারে যে, যা করা হচ্ছে তাতে দেশের ক্ষতি হবে তাহলে সে তেমন কাজ সহজে করতে চায় না। যারা করে, তারা অতীব দুর্বল প্রকৃতির লোক। তারা সমাজদ্রোহী এবং মানব-সমাজের শত্রু।

যুবকদ্বয় চলে গেল, তারপর এল অনেকগুলি যুবক, তার মধ্যে একজন ছিলেন বয়স্ক। তাঁকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ইন্‌ফরমারী করতে কি একটুও লজ্জা হয় না?"

বয়স্ক ভদ্রলোক একেবারে কাবু হয়ে গেলেন। হঠাৎ কাবু হবার কারণ ছিল; একেবারে ঠিক জায়গায় আঘাত করলে মানুষ কাবু না হয়ে যায় না।

বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, "অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা হয়ে গেছে মশাই! আমাদের জেলার বাবুর অনুগ্রহে তবু এই চাকরিটি পেয়েছি, তাতেই দিন চলে যায়। কাচ্চা-বাচ্চা খেয়ে বাঁচে।"

"এখন যা পাচ্ছেন বিড়ি বানালেও তার চেয়ে বেশি পেতে পারেন, বিড়ি বানানো কাজ কি খারাপ?"

এর উত্তর তিনি দিলেন না। বুঝলাম, বিড়ি বানানো কাজে সম্মানে আঘাত লাগে। তবুও এটা সরকারী কাজ, হাম্‌কি-তুম্‌কি করা চলে। ভেতরের সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁরা অবশ্যই জানেন, পুলিশ-বিভাগের ছোট পদবীধারীদের কি রকম শ্রীবচন শুনতে হয় তাদের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের কাছ থেকে। তাও সহ্য হয় কিন্তু বিড়ি বানানো সহ্য হয় না। এটা আমাদের কৃষ্টি বলতেই হবে! বাজে কথার মালা গাঁথ, অর্থ পাবে, বিত্ত পাবে; কায়িক পরিশ্রম কর, মান যাবে, প্রাণও যাবে।

ইন্‌ফরমারদের বিদায় করে দিয়ে আমাদের কথাই সমালোচনা আরম্ভ করলাম। পার্বতীপুর প্রকৃত পক্ষে আমাদের কাছে

জেলখানাতে পরিণত হয়েছিল। পার্বতীপুর হতে যতগুলি শড়ক বের হয়েছিল তার কোনটা পাকা ছিল না। কর্দমাক্ত পথে পথ চলা অসম্ভব, বিশেষতঃ সাইকেল নিয়ে। পুনরায় রেলগাড়ীতে যাওয়াই ঠিক হল অবশ্য আমার মতে।

শৈলেন রাজি হল না। সে বললে, তার কাছে একটি পয়সাও নাই, গাড়িভাড়া কোথা হতে পাওয়া যাবে? দ্বিতীয়ত আমার সঙ্গে কোথাও সে ভিক্ষায় যেতেও রাজি ছিল না। বুঝতে বাকি থাকল না যে, সে যে কাজে এসেছিল সে কাজ শেষ হয়েছে—এখন কলকাতায় যেতে পারলেই রক্ষা পায়।

তাকে অভয় দিয়ে বললাম, "টাকার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না শৈলেন, আমিই তার ব্যবস্থা করব।" শৈলেন মৌন অবলম্বন করল। মৌন অবলম্বন করা ছাড়া উপায় ছিল না। তার মনের কথা বলা শক্ত।

শৈলেনের এত পরিবর্তন দেখে অবাক হয়েছিলাম। তাকে বিশেষ কিছু না বলে শুধু এইটুকু বললাম, "লাট সাহেব এণ্ডারসন আমাদের দেশ শাসন করছেন না, আসলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশ শাসন করছে। আর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আমরাই সাহায্য করছি আমাদের দেশ শাসন করতে। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, অসহযোগ কর; কিন্তু কতজন অসহযোগ করছে? সবাই সহযোগ করছে আর মুখে বলছে অসহযোগ করছে।"

শৈলেন একটি কথাও বললে না। সে যেন দমিত হয়েছিল, কিছুই বলতে রাজি ছিল না। এটা হওয়া স্বাভাবিক। কোনও কাজে যদি নিষ্ফল হওয়া যায় তবে দুঃখ হয় এবং গ্লানি আসে; কিন্তু ভেবে দেখা কর্তব্য, মা বসুন্ধরা অপবিত্র রক্তে তৃপ্ত হন না। অপবিত্র হাত কম্পিত হয়, পা চলৎশক্তিরহিত হয়। একটি পদাঘাতে যে কাজ হয়, সেই স্থানে চারখানা হাত এবং আরও কিছু ব্যবহার করেও কিছু ফল হয় না। মনকে স্থির

করে যখন কর্তব্য কাজে নিযুক্ত হওয়া যায়, তখন কাজ সফল হয় তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। যা ঘটবার ঘটে গেছে, আগেই প্রতিকার করা প্রয়োজন ছিল। বৃটিশ সরকার 'এ' ডিভিশন করে দিয়ে বিপ্লবীদের সর্বনাশ, ভারতের সর্বনাশ করেছিল।

ইউরোপের এবং আমেরিকার প্রত্যেকটি রাজনৈতিক হত্যাকারী শুধু আদেশ এবং অস্ত্র পায়—প্রেরণা পায় না। প্রেরণা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করতে হয়। তখনই কাজের কৃতকার্যতা নিশ্চিতরূপে হবে বুঝতে পারা যায়। আজ চিকাগো শহরের প্রত্যেকটি পথ সোজা, পূর্বে প্রত্যেকটি রাজপথ আঁকা-বাঁকা ছিল। টেরারিষ্টদের অনুগ্রহে আজ আমরা চিকাগোকে একটি নূতন শহরে দেখতে পাচ্ছি। চিকাগোর টেরারিষ্টদের টাকা ছিল না, ভাল অস্ত্র ছিল না, ছিল কর্ম-কৌশল—যার প্রভাবে প্রত্যেক সেনেটর নিজের জীবন বিপন্ন মনে করতে বাধ্য হয়েছিল। সেনেটরগণ যখন বুঝতে পেরেছিল, তারা যদি দুষ্ট ভূম্যধিকারীদের ঘুষ পেয়ে চুপ করে থাকে, তাহলে পৃথিবী থেকে সত্বরই বিদায় নিতে বাধ্য হবে, তখনই তারা ল্যাণ্ড্ রিকুইজিশনের আদেশ দিয়েছিল; এর পূর্বে কিছুই করেনি। দুর্বলচিত্তের কাতর প্রার্থনার কোন মূল্য নাই। বজ্র-মুষ্টিতে কষে ধর, দেখবে দুনিয়ার লোক শুনছে, চিন্তা করছে।

বিকালে ক্লাবে গেলাম, সেখানেও এণ্ডারসনকে আক্রমণের কথাই সমালোচনার বিশেষত্ব ছিল। বিষয়টা যেন নিতান্ত খেলো, যার যা ইচ্ছা তাই মন্তব্য করছিল। কেহ কেহ উচ্চস্বরে বাদ-প্রতিবাদ করছিল। বেশ আরামেই কথা চলছিল। ইন্‌ফরমার এবং আই. বি. বিভাগের লোকও তাতে যোগ দিয়েছিল।

এদের তর্ক এবং বিতর্ক শুনে আমি চিন্তিত হয়েছিলাম। কারণ এণ্ডারসনকে হত্যা করতে যেয়ে অকৃতকার্য হওয়া বিষয়টি অতি নগণ্য হলেও তাই নিয়ে হৈ-হুল্লোড় চলছে! বিষয়টি অন্যের কাছে আশ্চর্যজনক নাও হতে পারে কিন্তু

আমার কাছে নূতন এবং আশ্চর্যের বিষয়ই ছিল। কারণ তার মানেই হল যারা এণ্ডারসনকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছে তারা এবং আরও একটু বেশি হয়ত' তাদের পরিবারের লোকও বিপদ্গ্রস্ত হতে পারে, এর বেশি কিছুই হবে না। সুচতুর বৃটিশ এমনি করেই আমাদের দেশের লোকদের তদানীন্তন আন্দোলন থেকে পৃথক রেখেছিল। দ্বিতীয়তঃ জমিদারের অবিচার-অত্যাচার সহ্য করে, না খেয়ে যারা মরছিল, তাদের মুখে ভাষা ছিল না, কোনও রূপ আশাও ছিল না, যাতে তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হয়। বাঙ্গালী মুসলমান ত একেবারে বিদেশীর মত টেরারিজমের দর্শকই ছিল। এটাই আমার কাছে আরও বড় করে দেখাচ্ছিল। কেন এমন হয়েছিল, তার কারণ খুজে পেতে দেরী হয়নি।

পা ভেঙ্গে স্বগ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের অনেক শিক্ষকমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তার মধ্যে ৺হাতিম উল্লা হলেন অন্যতম। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। এই আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তাঁর চাকরি গিয়েছিল, আয়ের পথ চারিদিক থেকে বন্ধ হয়েছিল। অতি কষ্টে সংসার চলত। আমাকে পেয়ে তিনি খুবই খুশী হয়েছিলেন। তিনি কোন্ পথে চলছেন জানবার জন্য চীনের মুসলমানদের সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করতে চেয়েছিলেন। আমার কাছ থেকে চীনের মুসলমানদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে বুঝতে পেরেছিলেন রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় মাইনোরিটির পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠদের সঙ্গে চলাই কর্তব্য।

বাংলায় যদিও মুসলমান মেজরিটি ছিল, সারা ভারতে ছিল মাইনোরিটি; এরূপ অবস্থায় কি করা কর্তব্য, তাই ছিল মাষ্টার মহাশয়ের বিবেচ্য বিষয়। আমার কাছ থেকে তিনি শুনলেন, মেজরিটি পার্টির সঙ্গে মাইনোরিটি পার্টির সহযোগ যদিও না থাকে তবুও বিরুদ্ধাচরণ করা কোন মতেই ভাল নয়।

আজ না হউক, ভবিষ্যতে মেজরিটি পার্টি নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে, সেজন্য চীনের মুসলিম সমাজ যাতে বিপ্লব ত্বরান্বিত হয় এবং গতি বদলায়, তারই চেষ্টা করছে।

আরও বললাম, চীনদেশে এমনও মাইনোরিটি দেখেছি যাদের সংখ্যা দুই লাখের বেশি হবে না—অবশ্য তারা মুসলিমও নয়, বৌদ্ধও নয়, প্রকৃত পক্ষে তাদের কোন ধর্মই নাই, তারাও প্রগতিশীলদের (মাও-সুতনের) জয় কামনা করে এবং পারলে সাহায্য করে। তারা জানত প্রগতিশীলদের সুব্যবহার পাবার আশাই বেশি। আমার কাছ থেকে চীনের সংবাদ শোনার পর, আমার গ্রাম্য শিক্ষক মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং আরও একবার জেলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পার্বতীপুরে চীনের কথাই বলছিলাম বেশি করে কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা'! সবই অরণ্যে রোদন হয়েছিল। পার্বতী-পুরের কলোনীতে যাঁরা বাস করছিলেন, তাঁরা সকলেই হয় রেল-কর্মচারী, নয় সরকারী কর্মচারী। সেখানে লেকচার শুনে একজন মাত্র মুসলমান আমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে অনুরোধ করেন। আগ্রহের সহিত তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি একজন রেল-কর্মচারী।

তাঁর বাসাতে যাওয়ামাত্র তিনি আমাকে না বসতে দিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "এর মানে, আপনি বলতে চান যারা উৎপীড়িত, জর্জরিত, তাদের বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়া কর্তব্য। বলুন ত সে বিপ্লবের স্বরূপ কি ?"

এ যে মহা বিপদ! মূল ধরে টান দিয়েছে লোকটি! ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের স্ত্রী এলেন। ভাবছিলাম বোর্খা-পরা হবেন। তা মোটেই নয়। পার্থক্য শুধু মাথার সিঁদুর। এতে কিছুই আসে-যায় না, কিন্তু তাঁর মুখ বিষণ্ণ এবং প্রশ্ন করতে উৎসুক। কি বলে কথা আরম্ভ করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এরূপ

মুসলমান পরিবার দেখেছি বলে মনে হয় না। ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন, তাঁর স্ত্রী আমাদের বসতে বললেন এবং তাঁদের বাড়িতে খাব কি না জিজ্ঞাসা করলেন।

এতে আমার মাথা নত হয়ে এল। নিজেকে ধিক্কার দিতে বাধ্য হলাম। বালি দ্বীপে পণ্ডিতদের মধ্যে থেকে এসেছিলাম। তারা খাঁটি হিন্দু, ভাতকে ভাত মনে করে না, প্রাণ অথবা জীবন রক্ষার প্রধান উপকরণ মনে করে। যে কেহ তাদের ভাত খেতে ডাকুক, নিশ্চয় যাবে বালির পণ্ডিত। বালির পণ্ডিত সর্বভুক, সেজন্য তাদের অবাধ গতি এবং ছোট্ট একটি দ্বীপে হিন্দুদের নিয়ম-কানুন বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। আর আমরা ভাতকে ভাত মনে করি না, যা মনে করি তার নাম মুখে না আনাই ভাল। যদি একটি ভাত কাপড়ে পড়ে তবে কাপড় ধুয়ে ফেলি। যা খেয়ে প্রাণ ধারণ করি, তাকে এত ঘৃণা আমাদের দ্বারাই সম্ভব হয়।

খাব কি না জিজ্ঞাসা করতেই আমিও অভিনব প্রথায় বললাম, "যদি খেতে দেন খেয়েই যাব কিন্তু বাসন ধুয়ে দিতে পারব না, আপনাদেরই বাসন ধুয়ে নিতে হবে; এটা যদি পারেন তবে আমরাও খেতে পারব।"

মহিলা ত অবাক! এ আবার বলে কি? বাসন ধুয়ে দিতে পারবে না?

শৈলেন আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মহিলাকে চিন্তিত না করার জন্য বললাম, "এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাদের খেতে দিয়েছিলেন, আমরা খেয়েছিলেম; কিন্তু যখন বাসন ধুতে বলেছিলেন তখন বাসন না ধুয়ে চলে এসেছিলাম। আপনারাও তাই করতে পারেন, সেইজন্য হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।"

ভদ্রলোক ভেতরের ঘর থেকে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে?"

আমি বললাম, "কি খেতে ভালবাসি জিজ্ঞাসা করছিলেন, জানিয়ে দিয়েছি মাংস-ভাত হলেই ভাল হয়।"

"তাই হবে, এখন কিছু খান, রাত্রে মাছ-মাংস ভাত হবে।"

সেখানেও সেই এক কথা, মেজরিটি এবং মাইনোরিটি! তাই নিয়ে অনেক কথা হল, তারপর আরম্ভ হল ধর্মের কথা।

আমাদের দেশে ধর্মের কথাই সবচেয়ে বড় কথা। যাঁরা ধর্মের কথা এড়িয়ে যেতে চান, তাঁরা বাস্তবকে এড়িয়ে যান। কিন্তু এড়িয়ে গেলে চলবে না। এই বিষয়টাকে বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে। ভারত-ভ্রমণকালে দেখেছি মুসলিম ধর্মকে বাদ দিয়ে কথা বলতে পারলেই যেন বক্তার প্রাণ বাঁচে! কোন্ ভয়ে ভীত হয়ে বক্তারা মুসলিম ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে কথা বলতেন, তা তাঁরাই জানেন। আমার কাছে কিন্তু মুসলিম ধর্মের সমালোচনাও বাদ পড়ত না।

কথায় কথায় বললাম, "এসব হল অবতারবাদ। হাতের ময়লা সাবান দিয়ে ধুলেই চলে যায়—অবতারবাদের প্রভাবও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে লোপ পায়। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার একটুও দরকার হয় না।"

স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে বলে উঠলেন, "বলেন কি?"

আমিও বললাম, "যা বলেছি তাই, এক চুলও কম নয়।"

ওঁরা ত অবাক! আমার ধর্ম কি জানতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁদের জানিয়ে দিলাম, "আমি কোনও অবতারকে যেমন অবহেলা করি না, তেমনি গ্রাহ্যও করি না। আমি সে দিক দিয়ে স্বাধীন, আমার নিজস্ব কিছু আছে। আপনারা মুসলমান; আমি ভাল করেই জানি আমার কথা আপনাদের ভাল লাগবে না, অতএব ধর্মের কথা উত্থাপন করবো না।"

আমার কথায় এঁরা রাগ করা দূরে থাক্, লুফে নিলেন! আমাকে বললেন, "আপনি আমাদের বাসায় চলে আসুন,

কয়েকদিন এখানে থাকুন। আপনাদের গাড়িভাড়ার জন্য সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হবে না। আমরাই গাড়িভাড়া দেব।"

বুঝতে পারিনি এঁদের এত আগ্রহ কেন এবং কোথায় আঘাত! আমি থাকতে চাইলাম কিন্তু শৈলেন যেন অপছন্দ করছিল! শৈলেনের মত-পরিবর্তনের জন্য সময়ের দরকার, সেজন্য চা খেয়ে চলে এলাম এবং বলে এলাম, রাত্রে যখন খেতে আসব তখন থাকা না-থাকার কথা বলব।

শৈলেন কোথাও থাকতে ইচ্ছুক ছিল না, সে চাইছিল তাড়াতাড়ি কলকাতায় আসতে। রাত্রে ভদ্রলোককে বলতে বাধ্য হলাম, "আমরা এখান থেকে আগামীকল্য সকালেই রওয়ানা হব।"

ভদ্রলোক বললেন, "যেখানেই যান না কেন, আমাদের বাড়ি হয়ে কলকাতায় যাবেন।"

তিনি তাঁর পিতার নাম ও গ্রামের নাম লিখে একখানা পত্র দিলেন। সেই পত্র নিয়ে আমরা চলে এলাম এবং পরদিন সকালেই রওয়ানা হলাম।

ঘুম থেকে উঠেই শৈলেনকে বললাম—"বাইরের পথ দেখা হয়েছে, চল রেল-স্টেশনে যাই। যে সামান্য টাকা হাতে আছে, তা দিয়ে বালুরঘাট পর্যন্ত যাওয়া যাবে।"

সে রাজি হল না। কি আর করা যায়? একটি গ্রাম্য পথে রওয়ানা হয়ে এক মাইলও চলতে পারিনি। কাদায় হাঁটু পর্যন্ত বসে যায়। অতি কষ্টে কোন রকমে রেল-স্টেশনে ফিরে এসে বালুরঘাটের টিকিট কিনে রওয়ানা হলাম।

বালুরঘাট

বালুরঘাট জমিদারদের যায়গা। আমার সঙ্গে যে চিঠি ছিল সেই গ্রাম বালুরঘাট হতে চার মাইল দক্ষিণে। এদিকে সাইকেল চালানো কষ্টকর ছিল না। যেমন বালুরঘাট নাম তেমনি বালির ছড়াছড়ি সর্বত্র।

চার মাইল চলার পর আমরা যে বাড়িতে পৌঁছলাম সে বাড়ি দেখে মনে হল না যে এটা মুসলমান বাড়ি। মোরগ ছিল না। পূর্বদিকে বাড়ির সম্মুখ। কোন সময়ে ধনী লোকের বাড়ি ছিল বলেই মনে হল। বাড়িতে লোকের বড়ই অভাব। ধনী মুসলমানদের বাড়িতে দাসদাসীর অভাব থাকে না। এ বাড়িতে দাসদাসী না দেখতে পেয়ে অসুবিধা বোধ করছিলাম।

কর্তা বাড়ির বাইরে এলে তাঁকে নমস্কার কি সেলাম করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। বয়স্ক লোক, উত্তম ধুতি পরা, পায়ে খড়ম, দাড়ি-গোঁফ কামানো। আমরা তাঁকে নমস্কারই করলাম। তিনি পত্রখানা হাতে নিয়ে আমাদের বসতে বললেন।

পত্রে ঠিকানা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবুও বার বার পত্রের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ যে মুসলমান বাড়ি, এখানে আপনারা থাকতে পারেন, কিন্তু –"

বলে যা বলতে ঠেকছিল আমি তা পূরণ করলাম। বললাম, "খাবও এবং তাড়াতাড়ি খেতে চাই, বেশ ক্ষিদে হয়েছে।"

বাড়ির ভেতর থেকে যে ছেলেটি এল, তার নাম প্রফুল্ল। বয়স বার তের। তার বাবা ছেলেকে চা আনতে পাঠালেন। ছেলে চলে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রফুল্ল নাম ত' মুসলমানের হয় না।"

"হাঁ তা ঠিক্। তবে আমাদের দুটো নাম হয়, একটা হিন্দু, অন্যটা মুসলিম মানে আরবী। কাগজে-পত্রে আরবী নামের প্রচলন, বাড়িতে হিন্দু নামই চলে। উপাধি 'চৌধুরী' যা সকলের মধ্যেই প্রচলিত।"

আমরা চা খাচ্ছিলাম, তারই মধ্যে আমাদের আগমনবার্তা গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলে আসছিল আমাদের দেখতে। হিন্দুরা আমাকে মুসলমান বাড়িতে দেখে অবাক হল। কয়েকজন হিন্দু তাঁদের বাড়িতে নিয়েও যেতে চাইলেন, কিন্তু কারো অনুরোধ রক্ষা না করে আমরা সেই বাড়িতেই রয়ে গেলাম।

সকলে চলে গেলে একজন মৌলানা ও তাঁর ছেলে রয়ে গেলেন। তাঁরাও থাকবেন। আমরা স্নান করতে গেলাম সামনের পুকুরে। ছোট ছোট পুঁটিমাছ আনন্দে খেলছিল। শোল মাছগুলি পুঁটিমাছ খেতে ওৎ পেতে ছিল। মানুষের সমাগমে শোলমাছ গভীর জলে ডুব দিয়ে পালিয়ে গেল আর পুঁটিমাছগুলি আমাদের চারদিকে জলের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তারই মধ্যে স্নান করতে হয়েছিল। সে স্নান যে কত আনন্দের, তা বেশি করে বলতে ইচ্ছা হয় কিন্তু এযে ভ্রমণ-কাহিনী!

স্নান করা হয়ে গেলে ভেতর-বাড়ির বারান্দায় খেতে বসলাম। একজন মহিলা ভাত দিচ্ছিলেন। মৌলবী এবং তাঁর সাথীও আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন। মনে হচ্ছিল না যে আমরা অন্যত্র খাচ্ছি! যেমন নিজের বাড়িতে খাই তেমনি খেয়ে যাচ্ছিলাম। শুধু এ কথাই আমার মনে মনে হচ্ছিল, যিনি ছুৎমার্গের সৃষ্টিকর্তা, তিনি কোন্ নরপশু!

সন্ধ্যার পর গ্রামের লোক একত্রিত হলেন। আমি গল্প আরম্ভ করলাম। সর্বপ্রথম ধর্মটাকে হাতের ময়লা বলে উড়িয়ে দিলাম। এতে অনেকেই চলে গেল। হিন্দু অতি কমই গেল, মুসলমান চলে গেল প্রায় শতকরা নব্বই জন।

এরপর আরম্ভ করলাম গল্প। গল্পের শেষ নাই। রাত প্রায় দেড়টা হল। কেউ উঠল না, আরও গল্প করি সকলের ইচ্ছা! অবশেষে নিজেই মুখ বন্ধ করলাম। সকলকে বলে দিলাম, "কালও এই গ্রামে থাকব এবং এই বাড়িতেই থাকব, আজ এখন শুতে দিন।"

কুচবিহারের পথে

সৌন্দর্যের লীলাভূমি উত্তরবঙ্গের অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করছিলাম ততই মনে হচ্ছিল এমন সুন্দর এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ যায়গা পৃথিবীতে বোধহয় অতি অল্পই আছে। হিমালয়ের পাদদেশের সমতলভূমি মানুষের চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিল উত্তর দিকে। সাধারণ লোক বুঝতেই পারে না যে ভূমি ক্রমশই উঁচু হয়ে হিমালয়ের সঙ্গে মিলনের জন্য ত্বরিৎ গতিতে এগিয়ে চলছে। হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরবঙ্গে ট্রপিকেল আবহাওয়াতে সকল রকমের ফল-ফুলের সুন্দর সমাবেশ রয়েছে।

ট্রপিকেল দেশগুলির মধ্যে যে সকল ফল-ফুল হয় তার সবটাতেই কাঁটা দেখা যায়; কিন্তু উত্তরবঙ্গে কণ্টকের সেরূপ উৎপাত নাই। আম, জাম, কাঁটাল, সুপারী যেমন দেখা যায় তেমনি নারিকেল বৃক্ষেরও অভাব নাই। সমতল ভূমির উপরে রয়েছে পিচ্ছিল কর্দম এবং তার একটু নীচেই 'ফাইন স্যাণ্ড' এবং তারপরই রয়েছে 'গ্রেভেল'। দশ হাত মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায় স্বচ্ছ জল। অবশ্য সেই জল প্রথম স্তরের। এই ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় স্তর হতে আরম্ভ করে দশম স্তর পর্যন্ত জলের চিহ্ন রয়েছে। এমন সুন্দর এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ দেশের কথা যখন ভাবি তখনই দুঃখ হয়, মানুষের আর্থিক দুর্গতি, সামাজিক অবনতি এবং ধর্মের নামে বেখাপ্পা আচার-ব্যবহার দেখে।

রংপুর হতে আমাদের যাবার কথা কুচবিহার। আমার কুচবিহার দেখার সাধও ছিল। কুচবিহারে মহারাজের বাড়ি দেখা অথবা মহারাজের দর্শনলাভ, সে ইচ্ছা কখনও ছিল না। দেখার মত অন্য কিছু ছিল, তাই আগ্রহান্বিত হয়ে চলছিলাম সে-দিকে।

দু-তিনটা গ্রাম অতিক্রম করার পর একটি গ্রামে বিশ্রামার্থ বসলাম। গ্রামের অধিবাসীদের দেখার ইচ্ছা ছিল। আমরা

যে গ্রামে বিশ্রাম করছিলাম, সেই গ্রামের লোকগুলি প্রায়ই বাদামী কালো, বেশ লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান। দাড়ি-গোঁফ আওরংজেবী ধরণে কাটা ছিল বলে পুরুষদের সৌন্দর্যের হানি হচ্ছিল নিশ্চয়ই; তবুও যে সামান্য কয়েক গাছা দাড়ি দেখতে পাচ্ছিলাম তাতেই আকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনেকটা সমাধান হয়েছিল।

পুরুষদের বুকে-পিঠে লোম, আজানুলম্বিত বাহু, সমতল চিক্‌-বোন, মুখের আকৃতি ডিম্বাকৃতি; এসব দেখে ও আরো কতকগুলি অঙ্গাকৃতি দেখে আমার শুধু 'ফাইন টাইপ' দ্রাবিড়দের কথাই মনে হচ্ছিল। ওদের ভাষা এবং উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছিল পাতলা জিহ্বায় ভারি শব্দ উচ্চারণে যে দোষ হয়, এদেরও সেই দোষ রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে পান-সুপারীর প্রচলন অত্যধিক রয়েছে। উত্তর-বঙ্গের লোক পান-সুপারী প্রচুর পরিমাণে খায় তবুও তাদের জিহ্বা কেন ভারি হয় না তার একমাত্র কারণ হল, যাদের জিহ্বাই পাতলা তারা হাজারও পান-সুপারী খাক্‌, জিহ্বার আড়ষ্টতা হয় না কোনো মতেই।

রক্তের সংমিশ্রণ যে হয়নি অথবা হচ্ছে না, তা নয়। ইন্দো-এরিয়ান অথবা সিমেটিক রক্তের সঙ্গে দ্রাবিড়-রক্তের সংমিশ্রণে যা উৎপত্তি তা যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর মোংগল রক্ত এবং দ্রাবিড়-রক্তের সংমিশ্রণে হচ্ছে দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম।

দুই দিকের গ্রাম্য জীবন বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলাম প্রত্যেক গ্রামেই কয়েকখানা তথাকথিত ধনী পরিবারের দেখা পেয়েছিলাম। বাড়ির সামনে একটি পুষ্করিণী, সামনে মস্তবড় একটা দালান, নয়ত টিনের ঘর, পেছনে অন্দর-মহল। এই ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই এক পদ্ধতি। পদ্ধতিটার একত্ব আরও সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছিলাম গ্রাম্য ধনী পরিবারগুলি দেখে তা যে ধর্মের লোকই হউক, তাঁরা হলেন গ্রামের প্রকৃত মালিক। তাঁদের আদেশ সকলেরই শিরোধার্য।

হিন্দু হলে তিনি হয় ব্রাহ্মণ, নয় কায়স্থ ; মুসলমান হলে তিনি হয় মোংগল, নয় পাঠান। এদের মধ্যে আভিজাত্যভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অভিজাত হিন্দু-মুসলমান পরিবারের মধ্যে পর্দা-প্রথাটা কারো হতে কম ছিল না।

গ্রাম্যলোক কেন যে ধনীদের প্রতি এত আনুগত্য দেখায় এবং গ্রাম্য ধনীর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে না, তার কারণ আমি জানতাম। গ্রাম্য ধনীদের প্রধান বাহন ছিলেন বৃটিশ, দ্বিতীয় বাহন ছিলেন পণ্ডিত এবং মৌলবী। কেহ যদি উপবাসী থাকত, কারো শিশু সন্তান যদি ঔষধাভাবে মারা যেত, কারো উপার্জনকারী যুবক সন্তান যদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা ঔষধে যখন-তখন মরত তবে পুরোহিতশ্রেণী সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, "এটা তোমার দুর্ভাগ্য, দুঃখ সহ্য করতে হবেই।" অথচ ঠিক সেই সময় চীনের প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে জমিদার, জোতদ্দার এবং অন্যান্য ধনী শ্রেণীকে তাড়াবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ধনী শ্রেণী গ্রামে বাস করতে সাহস করত না, তারা রিফিউজির মত শহরবাসী হতে বাধ্য হয়েছিল।

আমাদের দেশের গ্রাম্য ধনী সসম্মানে গ্রামেতেই কায়েমী স্বার্থ বজায় রেখে আনন্দে বাস করছিল। গ্রামের যে কোনো লোককে 'দশ ধারাতে' ফেলে সে গ্রাম হতে বহিষ্কার করতে পারত। হিন্দুদের মধ্যে কাষ্টইজম এত প্রকট হয়ে উঠেছিল যে হিন্দুরাই সহ্য করতে পারছিল না ; অথচ মুসলিম সরকারী কর্মচারী মাথা নত করে হিন্দুর ছুৎমার্গ ও কাষ্টইজম যে কোন্ মন্ত্রবলে সহ্য করছিলেন তা আমার জানা ছিল।

বলতাম না কিছুই কিন্তু স্কুলে-কলেজে অভিজ্ঞতা বলার সময় যদি দুই একটি কথা বল্‌তাম অমনি পুলিশী খরদৃষ্টি বিকট হয়ে আমার প্রতি পড়ত। যখনই বিশ্রাম করতাম তখনই শৈলেনকে গ্রাম্য জীবনের সামাজিক দুর্বলতার কথা বলতাম। শৈলেন

কখনো শুনত, কখনো বা শুনত না। বর্তমানে যখনই কেউ মানুষের দুঃখ-দৈন্যের কথা বলে তখনই সান্ত্বনার একমাত্র উপায় হল 'দেশ যখন কমিউনিষ্ট হবে তখন আমাদের সকল দুঃখের অবসান হবে।' তখনও সেরকম মনোভাবই সকলের অন্তরে নিহিত ছিল। যে কোন দেশপ্রেমিক দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতেন তাঁরা বলতেন, "বিপ্লব জয়যুক্ত হউক, দেশ স্বাধীন হউক, আমাদের সকল কষ্টের অবসান হবে।"

আমরা মনে করেছিলাম সেইদিনই কুচবিহার পৌঁছতে পারব, কিন্তু উল্টো হাওয়ার জন্য পথে সন্ধ্যা হয়ে যায়। পথের পাশে এক রোড-ওভারসিয়ারের সঙ্গে দেখা হয়। আমরা তাঁর অতিথি হতে চাইনি, আমরা প্রস্তাব করেছিলাম, তাঁর ঘরে রাত কাটাব মাত্র এবং যদি পারা যায় তবে চিঁড়া চর্বণ করব, অবশ্য তাও আমাদের নিজের পয়সায় কিনব। কিন্তু রোড-ওভারসিয়ার মহাশয় ছিলেন অতীব বদান্য লোক ; তিনি আমাদের খাইয়ে পাপমুক্তির উদ্যোগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর ধর্মমতে পরিব্রাজককে ভোজন করানো পুণ্য অর্জন করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শৈলেনের উপাধি ছিল দে, আমার উপাধি ছিল বিশ্বাস। তাঁর মতে আমরা উভয়ই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু যদি বিশ্ব-পর্যটকও হয়, তাহলে তাদের ভোজন করালে পুণ্য হতে পাপের সম্ভাবনাই বেশি।

তবুও অনেক চিন্তার পর রোড-ওভারসিয়ার মহাশয় বললেন, "আর কিছু না হউক দুজন লোককে ভোজন করানোর ফল ত পাব।"

প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, "আপনার পাপপুণ্য আপনার কাছে, আমরা আজ এখানে থাকব, আদেশের অপেক্ষা রাখি না। ঐ যে দেখছেন চৌকীটা, আমরা দুজন তাতে ঘুমাব, আপনি অন্যটাতে ঘুমোবেন।"

আমার কথায় ওভারসিয়ার মহাশয় একটু অস্বস্তিবোধ করলেন। তবুও কি মনে করে ডাল-ভাতের বন্দোবস্ত করে আমাকে বাইরে খেতে দিলে, শৈলেন বসল ভেতরে। খাবার শেষে আমাকে থালা ধুতে বলায় আমি থালাটা একদিকে বুট দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে বললাম, "এই নিন্ একটা টাকা, সকালে কাউকে দিয়ে ধুইয়ে নেবেন।"

আমার কাণ্ড দেখে শৈলেন হাসল, ওভারসিয়ার মহাশয় ভীত হলেন। রাত্রি আমাদের কাটল। সকালেই রওয়ানা হলাম কুচবিহারের দিকে। এ বিষয় নিয়ে শৈলেনের সঙ্গে আর কোন উচ্চবাচ্য হল না।

পথের দুপাশের বাগ-বাগিচার সৌন্দর্য মনকে চাঙ্গা করে তুলেছিল।

শরীরে শক্তি ছিল প্রচুর, মন চাঙ্গা থাকবে না ত কি? বেলা নয়টার সময় কুচবিহার রাজ্যের একজন বিশিষ্ট অফিসারের সঙ্গে পথে দেখা হয়। তিনি আমাদের থামিয়ে উপযাচক হয়ে একখানা পত্র দিলেন। পত্রে লেখা ছিল, আমাদের যেন রাজ-বাড়ির গেস্ট-হাউসে স্থান দেওয়া হয়।

তখনই রাজবাড়ি দেখার ইচ্ছা হয়। শহরে পৌঁছেই আমরা রাজবাড়িতে যেয়ে পত্র দেখানো মাত্র গেস্ট-হাউসে স্থান পেলাম। গেস্ট-হাউস ও রাজবাড়ির চত্বর দেখে মনে হয়েছিল যেন মস্ত বড় একটি ধনী চীনার বাড়িতে এসেছি! অনেক গ্রাম্য চীনা ধনীর বাড়ি কুচবিহারের রাজবাড়ি হতেও প্রশস্ত দেখেছি।

আগের দিন রাতে মশক-দংশনের জন্য ঘুম মোটেই হয়নি। ঘুম আমার বড়ই প্রিয়। স্নান করে চা খেলাম এবং সেই সঙ্গে মিঠাইএর থালা উজাড় করে শুয়ে রইলাম। শৈলেন ঘুমোয়নি, অন্যত্র চলে গিয়েছিল। বিকালে শহরের চারিদিক দেখে এলাম। কুচবিহার শহর বলতে দিঘির চারি পারই বুঝায়। দিঘির জল বেশ নির্মল। দিঘির চারি পারের দৃশ্যাবলী অতীব চমৎকার। দৃশ্যাবলী দেখে খুবই আনন্দ হল।

গেস্ট-হাউসের যে ঘরটাতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, শৈলেনের মতে তাই ছিল অত্যন্ত সুন্দর। চীন দেশের গ্রাম্য জমিদার, ত্রিশ টাকা যাঁর বাৎসরিক বেতন, তাকেও এরূপ ঘরে থাকতে দেখেছি। শৈলেনকে বলতে ভয় হচ্ছিল, সেইজন্য এই বিষয়ে চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করেছিলাম। তা ছাড়া, রাজবাড়িতে এমন একটি লোকেরও দেখা পাইনি যিনি ভ্রমণে একটুও উৎসুক ছিলেন।

রাজবাড়িতে যতগুলি কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের মুখ দেখলে মনে হ'ত না তারা সন্তুষ্ট ; বরং মনে হ'ত এরা সবাই ভীত ! কুচবিহারে টেরারিষ্ট পার্টির আড্ডাও ছিল না। সাধারণ ছাত্র-সমাজ শিক্ষার দিকেই ঝুঁকে রয়েছিল। কুচবিহার কলেজে লেকচার দেবার সময়ই তা বুঝতে পেরেছিলাম।

কুচবিহার স্টেটে এক দারুণ আইন ছিল, সেই আইনের নাম ছিল ডিপোর্টেশন। সন্দেহজনক ব্যক্তিকে যে কোন সময় স্টেট হতে বহিষ্কার করা যেত। এই নিয়ম বর্তমানে ভুটানে প্রচলিত হয়েছে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট ভুটানকে স্বাধীন রাষ্ট্রও স্বীকার করছেন না, অথচ ভারত-রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিও করছেন না। ওটোনামাস স্টেট রূপেই বজায় আছে।

এর মানে হল বর্তমানে কংগ্রেস-সরকার চান না যে এই রাজ্যে প্রগতির নামগন্ধ প্রবেশ করুক। ভারতবাসী যদি ভুটানে প্রবেশ করতে চায় তবে পারমিটের দরকার হয়। অথচ বিদেশীরা দলে দলে ভুটানে প্রবেশ করছে। তারা বলছে, সেখানে পশু এবং পাখীর গতিবিধি লক্ষ্য করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

তারা পশু এবং পাখীর গতিবিধি লক্ষ্য করুক অথবা কমিউনিষ্ট চীন-সৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য রাখুক, তাতে কিছু আসে যায় না। সত্যিকারের চিন্তনীয় বিষয় হল ভারতবাসী হয়ে ভুটানে কেন প্রবেশ করতে পারবো না ? ওটোনামাস স্টেটের বহির্বাণিজ্য কমিউনিকেশন্ এবং বৈদেশিক বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে ; সেই সূত্রে যদি কয়েকজন ভারতীয় সেখানে গিয়ে থাকেন, তাঁরাই শুধু সেখানে যেতে পারছেন।

বৃটিশ আমলে ডিপোর্টেশন আইন ভারতের অনেক দেশীয় রাজ্যেই প্রচলিত ছিল কিন্তু তত কড়াকড়ি ছিল না। লোক বুঝে আইনের প্রয়োগ হ'ত। কুচবিহারে আমাদের ডিপোর্টেশনের

ভয় ছিল না। আজ যাঁরা কংগ্রেসের সভ্য, আমরা তাঁদের মতই ছিলাম।

শুধু খাদ্যের লোভে কুচবিহারে তিনদিন ছিলাম, নয় ত একদিন থাকার মত স্থানও কুচবিহার নয়। প্রাণহীন স্থানে থাকা বা না-থাকা একই কথা।

কুচবিহার হতে যাবার পথে তিনদিন জলপাইগুড়ি থাকতে হয়েছিল। জলপাইগুড়িতে আমরা যে ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, তিনি ছিলেন বড়ই অমায়িক। আমার মনে হয়, তখনকার দিনে তিনিই ছিলেন সেখানকার রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন একমাত্র ব্যক্তি।

শিলিগুড়ি। জলপাইগুড়ি হতে আমরা যাই শিলিগুড়ি। একদিনেই সেখানে পৌঁছতে পেরেছিলাম। শৈলেনের বিশেষ তাড়াতাড়ি থাকায় পরের দিন সকালে আমরা রওয়ানা হই। সাত মাইল পথ চলতে একটুও কষ্ট হয়নি। অষ্টম মাইল হতে আর সাইকেলে বসা সম্ভব হয়নি, হেঁটে চলতে হচ্ছিল। শৈলেনের পেডেল ছোট থাকায় সে সাইকেলে বসেই চলছিল। তখন আমার সাইকেলে থ্রি স্পিড ছিল না। পাহাড়ী পথ চলার জন্য প্রায়ই পেডেল-প্লেট্ বদলাতে হ'ত। দারজিলিং যাবার সময় তা হয়ে ওঠেনি।

আমরা ক্রমেই সর্পিল পথে উঠছিলাম। যদিও কষ্ট হচ্ছিল তবুও আনন্দ হচ্ছিল। দুদিকের দৃশ্যাবলী ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছিল। যাঁরা বোটানী অবগত আছেন, তাঁদের পক্ষে শিলিগুড়ি হতে দারজিলিং পদব্রজে ভ্রমণ করাই ভাল। তাতে তাঁরা বুঝতে পারবেন ট্রপিকেল ক্লাইমেটের কেমন সুন্দর করে পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে বৃক্ষ এবং লতাপাতার চেহারা কত সুন্দরভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে !

শুধু তাই নয়, পশু-জগতেরও পরিবর্তন পথ-চলার সময় দেখতে পাওয়া যায়। কাকের ডাক শুনা যায় না, কাক দেখাও যায় না। তারপরই গরু। গরুর আকৃতি এবং প্রকৃতির পরিবর্তন দেখা যায়। মানুষের মনেও যে পরিবর্তন হয় না, তা নয়। মানুষ আপনা হতেই কম কথা বলতে আরম্ভ করে এবং কাজের পদ্ধতিও পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। আমরা সমতল ভূমিতে দেখতে পাই মানুষ বড়ই চঞ্চল কিন্তু পার্বত্যভূমিতে সেই মানুষই মন্থর এবং কর্মঠ হয়ে যায়। প্রকৃতির মাহাত্ম্য এখানেই ফুটে উঠেছে। তা বলে মাথা নত করে পেন্নাম করলেই প্রকৃতিকে জয় করা চলে

না। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়, প্রকৃতিকে পরাজয় করতে হয়, তারপর বাঁচতে হয়।

কার্শিয়াং। সকাল থেকে ভ্রমণ আরম্ভ করে সন্ধ্যার পর আমরা কার্শিয়াং পৌঁছি। রাতটা কোনও মতে কাটিয়ে পরের দিন আবার চলতে আরম্ভ করি। 'ঘুম্' পর্যন্ত হাঁটতে হয়েছিল।

ঘুম্। ঘুমে পৌঁছে মনে হয়েছিল যেন নিজের গ্রামে পৌঁছেছি! পৌষ মাসের সকালবেলা যেমন আমাদের গ্রাম ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে ঠিক তেমনি সেখানকার অবস্থা দেখে বেশ আনন্দ হয়েছিল।

ঘুম্ থেকে দারজিলিং উৎরাই। সাইকেলে বসতে পেরেছিলাম। ঘুমের আবহাওয়া ক্রমেই অপসরণ হচ্ছিল। সূর্যালোক দেখা দিয়েছিল। এটাকে বৃষ্টির পর সূর্যালোক অথবা কুয়াশা ভেঙ্গে সূর্যের উদয় বলা চলে না। যেন হঠাৎ একখানা আকাশ পেছনে রেখে নূতন এক আকাশের নীচে আমরা চলতে আরম্ভ করেছি!

আমি ধনী ছিলাম না। আমাদের উঠতে হয়েছিল ধরমশালায়। সেখানে সাতদিন যে কেহ একটানা থাকতে পারত, তারপর ধরমশালায় পরিচালকের হাতে কিছু গুঁজে দিলেই আরো কত সাতদিন যে থাকতে পারা যায়, তার দৃষ্টান্ত অনেক দেখতে পেয়েছিলাম। আমরা ছিলাম ছ' সপ্তাহ, এক সপ্তাহ স্ব-ইচ্ছায়, আর এক সপ্তাহ পুলিশের আদেশে।

দারজিলিং। দারজিলিং পৌঁছেই আমরা সর্বপ্রথম দেখা করি গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি আমার স্বজেলাবাসী ত ছিলেনই উপরন্তু তিনি তখন ব্রতচারী মুভ্মেণ্ট প্রবলভাবে চালিয়েছিলেন। ওয়াই. এম. সি. এ., বয়েজ স্কাউট, ব্রতচারী, এদের তখন একই পর্যায়ে ফেলা যেত। তাঁর সঙ্গে যে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তার একটা উদ্দেশ্যও ছিল। পুলিশ যেন আমাদের না ঘাঁটায় সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর কাছে আমাদের যাওয়া।

পরবর্তীকালে দত্ত মহাশয়ের অটোগ্রাফ অনেক পুলিশ-অফিসার দেখেছিলেন। তাঁরা মনে মনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, অনেক দিক দিয়ে সাহায্যের ভরসাও দিয়েছিলেন। অবতারবাদ এবং গড্ইজম যদিও আমার পেছনেই পড়ে থাকত তবুও বেদান্ত মঠে যেতাম, সাধু-সঙ্গ করতাম, পুলিশ বুঝুক আমরা দুষ্ট লোক নই। শৈলেন বেদান্ত মঠে প্রায়ই যেত; আমি যেতাম এক পাহাড় হতে অন্য পাহাড়ে এবং মাটি পরীক্ষা করতাম। বুঝতে চেষ্টা করতাম, দারজিলিং ধ্বসে যাবে কি দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হবে!

শৈলেন ইতিমধ্যে এক বাঙ্গালী মুসলিম ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। তিনি প্রায়ই এসে আমাদের সঙ্গে নানারকম আলোচনা করতেন। তাঁর কথাবার্তায় খুবই আনন্দ হত।

আমাদের সঙ্গে কম্বল ছিল না। এক ভদ্রলোক চারখানা কম্বল দিয়েছিলেন, তাতেও পোষাত না; তাই শরীর গরম রাখবার জন্য কস্তুরী খেয়েছিলাম। কস্তুরী বড়ই গরম জিনিস। পরে গরম ছাড়াবার জন্য কল খুলে দিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা জলে বসেছিলাম। তার ফল ভাল হয়নি, জ্বর হয়েছিল।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই শৈলেনকে বললাম, "দয়া করে এক পেয়ালা চা এনে দাও, তারপর ফ্লাওয়ার-শো দেখতে যেয়ো।"

শৈলেন সেদিন আমার কোন কথাই শুনতে চাইছিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে এক পেয়ালা চা এনে দিলে। বুঝতে পেরেছিলাম সে কি করছে এবং কোথায় যায়!

আগের দিন বিকালে যখন আমরা স্যানাটোরিয়ামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন একটি খেলার ছোট্ট বল আমার কাছে পড়ে। বলটি খেলোয়াড়দের কাছে ছুড়ে ফেলে দিয়ে শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এরা কে?"

শৈলেন বলেছিল, "জেনে লাভ নাই। বোধহয় এটাই এদের শেষ খেলা।"

আজ ফ্লাওয়ার-শো। খেতাবধারী বাঙ্গালী মাত্রই ফ্লাওয়ার-শো-তে যাবার জন্য সাজগোজ করছিলেন। একজন আই. বি. অফিসার আমাকে দেখতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "শো-তে যাবেন না ?"

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লাম, "দেখুন ত কত ডিগ্রী জ্বর হবে ?"

তিনি হাত দেখে বললেন, "দুই ত হবেই।" তারপরই শৈলেনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন ; বললাম, "হয় ত শো-তে গেছে, নয় বেদান্ত মঠে।" অফিসার মশাই বিদায় নিলেন।

বেলা তখন চারটে হবে। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। হঠাৎ বাইরে গণ্ডগোল শুনে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, বাঙ্গালী দৌড়ুচ্ছে আর নেপালী ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া করছে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে রইলাম।

এর কতক্ষণ পরই একজন পুলিশ শৈলেনকে রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে চলে গেল। তারই মুখে শুনেছিলাম, 'মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের' উপর কারা গুলি ছুড়েছিল।

বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা গভর্ণর বাহাদুরকে গুলি করে হত্যা করার প্রচেষ্টা, কম কথা নয় ?

শৈলেনের প্রথম প্রশ্নই ছিল, "শেষটায় আপনি আমাকে ধরিয়ে দিলেন ?"

কতক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলাম, "বল ত কি হয়েছে ?"

শৈলেন বললে, সে ছিল স্যানাটোরিয়ামে, তখন খেলছিল ; হঠাৎ একজন আই. বি. তাকে বললে, আমি নাকি তাকে ডেকেছি ! সে আসতে চায়নি, একপ্রকার জোর করেই তাকে নিয়ে এসেছে।

আমি বললাম, "তাহলে এখন আমরা উভয়ে একই রুমে তালা-বদ্ধ অবস্থায় আছি ! যাহোক বাইরের আর কোনও সংবাদ রাখ ?"

শৈলেন বললে, "সংবাদ আর কি ? গজনবী সবই পণ্ড করে দিয়েছে। গভর্ণর মরেনি।"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। সন্ধ্যার পর জ্বরও ছেড়ে গেল। ভয়ানক ক্ষুধা হয়েছিল কিন্তু বাইরে যাবার উপায় ছিল না।

রাত ন'টার সময় তালা খুলে একজন সার্জেন্ট এবং কয়েকজন আই. বি. অফিসার রুমে প্রবেশ করলেন। আমাদের রুম তল্লাসী হল, শরীর তল্লাসী হল। তারপর বাই-সাইকেল তল্লাসী করতে হবে। বাঙ্গালীবাবুরা সাইকেল দু'খানাকে ফ্রেম খুলে দেখতে চেয়েছিল।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের ধন্যবাদ দিয়ে সার্জেন্টকে বললাম, "একটি পিস্তল সাইকেলের ফ্রেমের ভেতর লুকিয়ে রাখা যায় না, বোধহয় আপনি বুঝতে পারেন?"

সার্জেন্ট বললেন, "সবই বুঝি কিন্তু এঁরাই হলেন আমার কর্তৃপক্ষ, আমি হলাম তাঁবেদার; যা হোক ওদের দুর্বলতাসূচক তাঁবেদারী করতে আমি রাজি নই। তবে আপনারা সাতদিন এখানেই থাকবেন, তারপর, দারজিলিং পরিত্যাগ করবেন।" আই. বি.-দে.র লক্ষ্য করে বললেন, "আমি চল্লাম, আপনাদের যা ইচ্ছা হয় করুন।" সেই সঙ্গে সার্জেন্ট আমাকে "Good night" বলতে ভুলেননি।

নিজের জাতভাই লোক তিনটিকে কিছু বললাম না, শুধু চেয়ে থাকলাম, দেখি, ওরা কি করে?

বোধহয় পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর তিনটা লোকই চলে গেল।

যাঁরা বলেন, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাকুরিজীবী বাঙ্গালী নক্‌রি বজায় রাখতে গিয়ে অন্যায় করে, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, সার্জেন্টও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাকরি করেন; তাঁর ত এত দুষ্টভাব ছিল না যেমন দেখেছিলাম বাঙ্গালী তিনটির মধ্যে? এর কারণ যদি খোঁজ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, আমাদের মানবতা বলে যে গুণ, তার অনেকটা কাষ্টইজমের কল্যাণে লোপ পেয়েছে, অন্যদিকে

পৃথিবীর অপর কোন জাতের মধ্যে কাষ্টইজম না থাকায় মনুষ্যত্বের বিকাশ দ্রুত হচ্ছে। আমরা ক্রমেই অমানুষ হচ্ছি, অন্যান্য জাতি ক্রমেই মানুষ হচ্ছে।

রাত দশটার সময় ভাতের দোকানে গিয়ে শুনলাম, নেপালীরা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে! রাস্তায় যে কোনও বাঙ্গালীকে পেয়েছে, তাকেই তারা ঠেঙ্গিয়েছে। এতে রায় বাহাদুর অথবা রায় সাহেবও বাদ যাননি।

এরপর আর সাতটি দিন কাটিয়েছিলাম অতিকষ্টে এবং সন্ত্রস্ত ভাবে। অষ্টম দিন সকালে শৈলেন বিদায় নিল, আমিও বিকালে শিলিগুড়িতে পৌঁছলাম এবং সেইদিন রাত্রেই আমরা শিলিগুড়ি পরিত্যাগ করলাম।

দারজিলিং-এর পুলিশী-তাণ্ডব যেন আমাদের আর ছুঁতে না পারে, এই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

কলিকাতার পথে

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে পৌঁছেই মনে হল, কলিকাতা আর বেশি দূরে নয়। কিন্তু হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছতে বারটা বেজে গেল—অবশ্য চন্দননগরে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ।

আমি আমার ইচ্ছায় সেখানে দাঁড়াইনি, দাঁড়িয়েছিলাম শৈলেনের ইচ্ছায়। সে বলেছিল, "এখানেই কানাইলালের বাড়ি।"

আমি সে কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। কানাইলালের কথা বলামাত্র মনে হয়েছিল রাসবিহারী বসুর কথা। তাঁর জন্মভূমিও চন্দননগরেই। বর্তমানে যেখানে লোকে আরাম করে স্নান করে, বড় পথটার উপর দিয়ে মোটর গাড়িতে বসে বড়লোকেরা হাওয়া খায়, সেখানে আমরা বসেছিলাম এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিপ্লবীদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলাম।

ঠিক সেই সময় শৈলেনকে বলি, "মনে রেখো শৈলেন, বিপ্লবীরা প্রাণ দেয় নিজের সুখের জন্য নয়, সকলের সুখের জন্য বিপ্লবী প্রাণ দিয়ে আনন্দ পায়।"

শৈলেন বললে, "আনন্দ পায় না ; কষ্ট যা হবার হয় তবুও প্রাণ দিতে ইচ্ছা হয় মানুষের দুরবস্থা দেখে। শুনে রাখুন আপনি, কোনও ইজমের কথা এখন আমাকে বলবেন না, এখনও আমাদের দেশে বিপ্লবের যুগই বর্তমান রয়েছে।"

"এখানে ইজমের কথা এল কোথা হতে শৈলেন ?"

শৈলেন বললে, "আপনি প্রায়ই গণ-বিপ্লবের কথা বলেন, চীন দেশের সামাজিক অবস্থা ও আমাদের সামাজিক অবস্থা এক নয়। আপনার লেকচার হতেই আমি বুঝতে পেরেছি, চীন দেশের লোক একই আকৃতির এবং তাদের প্রকৃতিও একরূপ।

আমাদের দেশে আকৃতি এবং প্রকৃতি এক রকমের নয়। ধর্মও বিভিন্ন রকম। আমাদের দেশে একজনকে ছুঁয়ে দিলে অন্যজনের জাত যায়। কাজেই আমাদের দেশের রাজনীতির সঙ্গে চীন দেশের রাজনীতি অথবা গণ-বিপ্লবের তুলনা করবেন না।"

জবাব দেবার মত কিছুই ছিল না। চুপ করে ভাবছিলাম, শৈলেন যা বলেছে তাই ঠিক, অনর্থক বিদেশের কথা বলে কি লাভ হবে?

শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার লেকচার শুনে কি তোমার রাগ হয় শৈলেন?"

"রাগ হয় না, কিন্তু অন্যদেশের আথিক, নৈতিক এবং স্বাধীন চিন্তাধারার কথা যখন শুনি তখন শুধু দুঃখ হয়।"

এই বলেই শৈলেন চিন্তিত ভাবে উঠে দাঁড়াল এবং আমাকেও আদেশ করল, "এবার চলুন।"

চললাম যেমন করে চলি। দু'দিকের দৃশ্যাবলী দেখছিলাম, আর দেখছিলাম ইউরোপীয়ানদের দাপট। একজন ইউরোপীয়ান অফিস হতে বের হল আর অমনি দ্বারওয়ানেরা "সেলাম হুজুর, হুজুর মাইবাপ" ইত্যাদি আরম্ভ করে দিলে! ভাবছিলাম, এটা তাদের দোষ নয়, এটা সামাজিক দোষ। সাদাকে সকলেই একটু বিশেষ চোখে দেখে।

এখনও আমাদের দেশের কালো মেয়ের বিয়ে হতে অনেক বাধা সৃষ্টি হয়। লোকে বলে, "মেয়েটি সুলক্ষণা, স্বাস্থ্যবতী, নাক-মুখ বেশ সুন্দর, চোখ দুটি যেন হরিণের চোখের মত, কিন্তু রংটা কালো।"

আমাদের দেশের তথাকথিত শত্রু অসুর। তাদের যে রূপ আমরা কল্পনা করি, তা হল কালো। অতএব শ্বেতকায় ইংরেজ হউক আর ইহুদী হউক, তারা সকলেই আমাদের পূজ্য। বৃটিশরা শ্বেতকায়,

তার উপর আমাদের শাসক। কাজেই একেবারে সোনায় সোহাগা! অতএব নিশ্চয়ই পূজ্য!

হাওড়ার কাছে এসেছি। লোকে লোকারণ্য। আমি আগে, শৈলেন পেছনে। হঠাৎ দেখলাম শৈলেন পেছনে নাই। কি আর করি, দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল অনেকক্ষণ। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর শৈলেন এল। জিজ্ঞাসা করিনি কোথায় গিয়েছিল। সেও কিছু বললে না। আবার রওয়ানা হলাম।

হাওড়ার পুল পার হয়ে আমরা চললাম হ্যারিসন্ রোড ধরে। সোজা পথ ছিল কিন্তু ভুল করে বাগবাজারের দিকে রওয়ানা হলাম। যাকেই শিয়ালদহের কথা জিজ্ঞাসা করি সেই বলে, "এগিয়ে যান।"

কতক্ষণ পর আমরা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অফিসের সামনে এলাম। দেখা হল শ্রীঅখিলচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য একজন লোক দিলেন।

আমরা এলাম সাঁইত্রিশ নম্বর হ্যারিসন্ রোডের তিনতলা বাড়িতে। একখানা রুম ঠিক হল। ভাড়া মাসিক দশ টাকা। নীচে ছিল পাইস্ সিস্টেমের হোটেল।

সাঁইত্রিশ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়ির নিশ্চয়ই কোন ইতিহাস ছিল। শৈলেন বাড়িটা ভাল করে দেখল, তারপর বললে, "এটাই সেই বাড়ি!"

"জানি না শৈলেন তুমি কোন্ বাড়ির কথা বলছ! কলকাতা-সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম। চাকরি-জীবনে কলিকাতায় এসেছি বটে কিন্তু পথে চলার সময় পরিচিত লোকের সাহায্যে পথ চলেছি। আমরা যে বাড়িতে উঠেছি তার যদি কোনও ইতিহাস থাকে তবে তুমিই জান; আমার এ-সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই।"

ইতিহাস হয়তো নিশ্চয়ই কিছু ছিল কিন্তু সে বললে না কিছুই।

সেদিন কাটল শুধু বিশ্রাম করে। পরের দিন আমরা গেলাম 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে। সেখানে সাংবাদিকরা আদর-আপ্যায়ন করলেন। শৈলেন একদিকে দাঁড়িয়ে রইল; তার বক্তব্যও ছিল না, শুনবার মতও কিছু ছিল না। কলিকাতাই তার ভ্রমণের শেষ।

বক্তব্য শেষ করে বাড়িটার চারিদিক দেখে নিলাম। নীচের তলায় দেখা হল শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন মহাশয়ের সঙ্গে। শৈলেন তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলল না। কথা যা বলবার ছিল আমি বললাম। তারপর আমরা পথে এলাম।

শৈলেন কখনও আমাকে চায়ের দোকানে ডেকে নিত না, আজ সে আমাকে একটি হিন্দুস্থানীর চায়ের দোকানে ডেকে নিয়ে বললে, "বসুন।"

সে আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করেনি। দাদা অথবা কাকা বলত না, কিছুই বলত না। সে বললে, "দুঃখের সঙ্গে বলছি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দেখে মনে হল না যে এখানে বিপ্লবীদের কোন সম্পর্ক রয়েছে।"

"এটাকে নরম ধরণের সংবাদপত্র বললেই ভাল হয়, তবে নাই-মামার দেশের চেয়ে কানা মামাই ভাল।"

শৈলেন বললে, "শ্রীযুক্ত মাখন সেন মহাশয়কে এখানে একজন বড় কেরাণীবাবুরূপে দেখব, এমন আশা কখনো করিনি।"

"আমাদের দেশে কেরাণী, উকিল, ডাক্তার, মোক্তারের ছেলেমেয়েরাই বিপ্লব আরম্ভ করেছিল সর্বপ্রথম। তুমিও কেরাণীর ছেলে, তা ভুলে যেও না।"

শৈলেন আমাকে তার জীবন সম্বন্ধে কিছুই বলেনি বটে কিন্তু রেঙ্গুনে সে কেরাণীর ছেলে হলেও তার চলাফেরা কেরাণীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ছিল না, সকলের সঙ্গেই ছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা হয়ে অমৃতবাজার এবং এড্ভান্স আফিসে যাই। সকলেই আমাকে বেশ পাবলিসিটি দিলেন, আমিও আনন্দিত হলাম। কিন্তু শৈলেন ক্রমশঃ সংবাদপত্র আফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিল, শুধু একদিন বিষ্ণু ঘোষের স্টুডিওতে যেয়ে এক সঙ্গে ফটো তুলিয়ে বলেছিল, "এটাই আমার স্মৃতিস্বরূপ রেখে দেবেন। বিপ্লবী জীবন কখন শেষ হয় বলা তো যায় না।"

মেসে ফেরবার পথে শৈলেন বললে, 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' নামে দুটো দল হয়েছে। বর্তমানে কোনোটাই বিপ্লব করে না, শুধু দল পাকায়। দুর্বলতা দেখা দিলেই দলের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে দুর্বলতা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। 'ঘটি' 'বাঙ্গাল' দুটি শব্দও বেশ ভাল করেই প্রচলিত হয়েছে। এই দুটি শব্দের পেছনে অহঙ্কার এবং বিভাগের পূর্ণ লক্ষণ বিদ্যমান।"

ঘটি-বাঙ্গাল শব্দ দুটির প্রতি আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। গ্রাম্যজীবন কাটিয়ে সোজা বিদেশে গিয়েছিলাম চাকরি করতে, আসা-যাওয়ার সময় কলিকাতা নগরী পাশ কাটিয়ে যেতে পারলেই ভাল মনে করতাম। আমার কর্মস্থান ছিল বেলুচিস্থান। ছুটিতে আসবার সময় এবং ছুটি হতে কর্মস্থলে যাবার সময় নৈহাটী হয়েই আসা-যাওয়া করতাম। শৈলেন-কথিত ঘটি-বাঙ্গাল শব্দের প্রতি গুরুত্ব মোটেই দেইনি। দ্বিতীয় কথা হল, পশ্চিমামাত্রই বাঙ্গালীকে বলত বাঙ্গাল, সেজন্য শব্দটির প্রতি গুরুত্ব দেবার ইচ্ছাও হত না।

ইতিমধ্যে একদিন দ্বিপ্রহরে মেসের দরজা খুলে শুয়েছিলাম। শৈলেন ঘরে ছিল না। তার শার্ট হাফ্‌প্যান্ট ইত্যাদি সব জড়িয়ে একটা বালিশ করে বাতাসের মধ্যে আরাম করে শুয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার যথাসর্বস্ব দিনের বেলাতেই উধাও হয়েছে!

পাসপোর্ট উপরে উঠিয়ে রেখেছিলাম অটোগ্রাফ বইটার সঙ্গে। শুধু সে দুটোই ছিল, আর কিছুই ছিল না। মনিব্যাগও উধাও! যাহোক্ পাসপোর্টখানা পেয়েই স্বস্তি বোধ করলাম। কারণ, কলিকাতার মত স্থানে নূতন করে পাসপোর্ট করানো সহজ ব্যাপার ছিল না, হয়তো পাসপোর্ট পেতাম কি না সন্দেহ।

হাতে একটি পয়সাও ছিল না। কি করে অন্নের সংস্থান করব সেই হল দুশ্চিন্তা। মনিব্যাগের মধ্যে একখানা

দলিল ছিল, সেই দলিলখানা হারিয়ে যাওয়ায় খুবই দুঃখ হয়েছিল।

কেনেডা হতে আমাকে ডিপোর্ট করা হয়েছিল। কেন ডিপোর্ট করা হয়েছিল, সেই দলিলে ছিল তার কারণ লেখা। ও রকম একখানা দরকারী দলিল হারিয়ে যাওয়ায় রাগও হয়েছিল খুব।

একটা লোক প্রায়ই আমার রুমে আসত এবং বিভিন্ন রকমের কেচ্ছার অবতারণা করত। আমার কাপড় এবং মনিব্যাগ চুরি হবার দিন থেকে সেও উধাও হয়েছিল। আমার সন্দেহ ছিল সেই লোকটাকেই। কিন্তু সন্দেহ করে আর কি করতে পারা যায়? এটা ত স্বাধীন দেশ নয়, পরাধীন রাজ্য; এখানকার আইন ভিন্ন রকমের। হয়ত বৃটিশ সরকারের বিশেষ অনুচরই এই কাজ করেছে!

সন্ধ্যার পর স্নান করে শান্ত হলাম। পয়সা একটিও ছিল না। পাইস হোটেলের কর্মকর্তা বাকিতেই খেতে দিলেন। পর দিন ছিল রবিবার। কোনও বিদ্যালয়ে লেকচার দিয়ে যে দু'পয়সা রোজগার করব, সে উপায় ছিল না।

কলিকাতাতে আমার পরিচিত লোক যাঁরা ছিলেন তাঁরা কে কোথায় থাকেন জানতাম না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল দানবীর মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর কথা। তাঁর ছেলে তাঁর সৎগুণ নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছেন, অন্তত কয়েকটি টাকা ধার পাবার সম্ভাবনা আছে নিশ্চয়ই। চললাম তাঁর বাড়িতে।

শ্রীশ নন্দী মহাশয় তখন কাছারি ঘরে বসে ছিলেন। আমার পরিচয় দিলাম এবং দশটি টাকা ধার চাইলাম। শ্রীশ নন্দী মহাশয় কোন প্রশ্ন না করে দশটি টাকা আমার হাতে দিলেন এবং বললেন, "এক পেয়ালা চা খান।"

তখনও আমার চা খাওয়া হয়নি। একজন লোক কিছু খাবার এবং এক পেয়ালা চা নিয়ে এল। চা খাওয়া হয়ে গেলে শ্রীশ

নন্দী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, "কলকাতায় এত লোক থাকা সত্ত্বেও টাকা কর্জ করতে আমার কাছে এলেন কেন?"

"বসুমতীতে পড়তাম আপনার পিতা দানবীর ছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল আপনার কথা। দানবীরের ছেলে পিতার সৎগুণ পায়, তাই মনে করে আপনার কাছে আসা।"

"টাকা ফেরত দেবার উপায় কি রয়েছে?"

"আজ রবিবার, কাল হবে সোমবার। কাল কোনও বিদ্যালয়ে নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলব এবং মজুরী বাবত অন্তত দশ টাকা পাবই। এক সপ্তাহ সময় নিয়ে টাকা ধার করেছি, এক সপ্তাহের মধ্যে অন্তত তিনটা স্কুলে লেক্চার দিতে পারব। আচ্ছা এখন যাই, আপনার কাছে আমার অভিজ্ঞতা বলার এখন সময় নাই, পুলিশ-স্টেশনে যেতে হবে, দেখা যাক পুলিশ যদি হারানো টাকার কোন সন্ধান করতে পারে।"

পুলিশ-স্টেশনে গিয়েছিলাম, ওরা আমার বক্তব্য লিখে নিয়েছিলেন কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

শৈলেন কোথায় গেছে সংবাদ নেবার জন্য পুলিশ এসেছিল। রাতে শৈলেন হোটেলে ছিল না সে কথা পুলিশকে বললাম না। 'কোথায় গেছে জানি না' বলেই বক্তব্য শেষ করেছিলাম।

সন্ধ্যার পর শৈলেন এল এবং বলল, সে সারাদিন অভুক্ত আছে। তার কথা শুনে খুবই দুঃখ হল।

স্নান করে শৈলেন খেতে গেল। খেয়ে এসে বললে, "এখানকার দাদারা সব অর্থপিশাচ, এদের মধ্যে দলাদলি হবেই। যা দেখলাম, তাতে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, এখানে কোন সংগঠন নাই, আছে শুধু ঘটি-বাঙ্গালের অহি-নকুল সম্বন্ধ!"

"এতে বৃটিশের হাত নিশ্চয়ই আছে, কি বল শৈলেন?"

"মনে হয় তাই, নতুবা বিষয়টি এত জোরদার হতে পারত না," শৈলেন বললে।

আমার সব কিছু চুরি গেছে শৈলেনকে বললাম না। শৈলেন ভয়ানক উত্তেজিত ছিল এবং 'ঘটি-বাঙ্গাল' বিবাদে কি সর্বনাশ হচ্ছিল সে কথাই বার বার বলছিল।

আমি বললাম, "এতে তোমার কর্মক্ষেত্র বেড়ে গেছে বলতে হবে, শত্রুর সংখ্যা বেড়েছে। বিশ্বস্ত লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে।"

"হাঁ বিষয়টা তাই, অনেকগুলি টাকা খরচ করতে হয়েছে এবং সারাটা রাত এই করেই কেটেছে। তবে আমাদের কাজও প্রায় শেষ হয়ে এল। নন্‌-কোঅপারেশন এবং নন্‌-ভায়লেন্স মূভমেণ্ট বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। দুঃখের সহিত বলছি, বৃটিশ সরকার এবার নূতন চাল চেলেছে। তারা এখন প্রাদেশিকতার মধ্য দিয়েই কার্যসিদ্ধ করবার চেষ্টায় আছে।"

শৈলেন পরিশ্রান্ত ছিল, মেঝের উপরই শুয়ে পড়ল। তার কাপড় কোথায় সে তা জিজ্ঞাসাও করেনি। শৈলেনের অবস্থা দেখে দুঃখ হয়েছিল কিন্তু আমার করবার মত কিছুই ছিল না।

সকালের দিকে একজন ভদ্রলোক এলেন। তিনি আমাকে জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। সন্ধ্যার পর বলতে হবে। তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়ে শৈলেনকে নিয়ে আমরা অমৃতবাজার পত্রিকা এবং আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে গেলাম। গিয়ে দেখি, তখনও কেহ অফিসে আসেননি। শৈলেন যে সাথে এসেছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল, কোনও বড়দাদার সন্ধান পাওয়া যায় কি না!

এটাকেই বলে 'মাথা খারাপ'। বড়দাদারা কি সংবাদপত্র-আফিসে বসে থাকেন? তবুও যেতে হয়েছিল, শৈলেনের অনুরোধ।

ফেরবার পথে শ্যামবাজার এ. ভি. হাইস্কুলে কিছু বলব ঠিক করে এলাম। মাষ্টার মশাইরা বলছিলেন, "ছেলেরা বড় দুষ্টু, আপনার কথা শুনবে কি না সন্দেহ।" কিন্তু লেকচার দেবার পর

মাষ্টার মশাইরা বলেছিলেন, "একটা অভিনব ঘটনা, এমন শান্ত হয়ে লেকচার শুনতে বড় দেখা যায় না।"

সপ্তাহ শেষ হবার পূর্বেই শ্রীশ নন্দী মহাশয়ের বাড়িতে টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু তিনি টাকা ফেরত নেননি। বরং বলেছিলেন, "যদি দরকার মনে করেন তবে কলিকাতার বুকের উপর আপনাকে আমি কিছু ভূমি দিতে পারি।"

মনে মনে হেসেছিলাম, মাটি আর বেটী, এ দুটোই মানুষকে আট্‌কে রাখে। মুখ ফুটে কিছুই বলিনি বটে, শুধু বলেছিলাম, "কোথাও বসবাস করার প্রবৃত্তি এখনো জেগে ওঠেনি, ক্ষমা করবেন।"

এর পরের বার যখন দেখা হয়েছিল তখন আমার অবস্থা আরও খারাপ ছিল। ইউরোপ-ভ্রমণ করে ফিরে এসেছিলাম, তখনও আফ্রিকা এবং আমেরিকা ভ্রমণ হয়নি। শ্রীশ নন্দী মহাশয় আর জমির কথা উত্থাপন করবার ফুরসুৎও পাননি। কিন্তু ঐ যে তাঁর অসময়ের দেওয়া দশটি টাকা, তা' আজও মনে আছে এবং আমরণ সেকথা মনে থাকবে।

কলিকাতা পৌঁছার পর ডায়েরিতে বিশেষ একটা তারিখে দাগ দিয়ে লিখেছিলাম: "অদ্য কলিকাতা হতে বিদায় নিলুম।"

সেই দিনটা নিকটস্থ হতে থাকল। একমাস চলে গেল। কলিকাতাতে এমন কিছু দেখতে পেলাম না যা দেখে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারি।

"আমার দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কি হচ্ছে মোটেই বুঝতে পারছিলাম না।" এই হল আমার খেদোক্তি!

কলিকাতা ওয়াই. এম. সি. নামক প্রতিষ্ঠানে স্বগ্রামনিবাসী মিঃ বি. বি. চক্রবর্তী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কোথায় বাস করতেন জানতাম না, তিনি নিজেই এসে দেখা করেছিলেন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানে কিছু বলতে অনুরোধ করেন।

আনন্দের সহিত সেখানে গিয়েছিলাম। সে যুগে ওয়াই. এম. সি.-এ:, ব্রতচারী, বয়েজ-স্কাউট ও রামকৃষ্ণ-মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত থাকলে পুলিশের 'সুনজরে' পড়বার ভয় থাকত না।

ওয়াই. এম. সি. হলে লেকচার দেবার সময় মিঃ এম. আর. বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি স্বেচ্ছায় লণ্ডনের ওয়াই. এম. সি.-এর সেক্রেটারী মিঃ সান্তোয়ানের কাছে পরিচয়-পত্র দিয়ে আমায় উপকৃত করেছিলেন।

সেই সময় শ্রীঅশোক মুখার্জি নামক এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়। অশোকবাবু দু'একদিন এখানে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে পরেশনাথ অন্যতম। রামকৃষ্ণ-মিশনের নির্মলচৈতন্য এবং স্বজেলাবাসী মিঃ দাসের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে এরা খুবই উপকার করেছিলেন। তাছাড়া পরিচয় হয়েছিল আরো অনেক লোকের সঙ্গে, তা বলে প্রত্যেকের নাম না বললেও চলবে।

সাংহাই নগরীর কমার্শিয়েল প্রেসের মত প্রেস দেখবার আশা করেছিলাম কিন্তু সেরূপ কিছু দেখতে না পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলাম। আরও মনে করেছিলাম, চীনা জাতীয়তাধারা যেমন করে নিজেদের গলদ অপসরণ করেছিল, যেমন—বেণী কাটা, স্ত্রীলোকের লৌহ-পাদুকা পরিত্যাগ ইত্যাদি,—সেরূপ উন্নতিও হয়তো দেখতে পাব; কিন্তু সেরূপ কিছুই দেখতে না পেয়ে 'মনের দুঃখে বনে যাওয়াই' ভাল হবে মনে করেছিলাম।

ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসবেন এবং দেশপ্রিয় পার্কে লেকচার দিবেন। লেকচারের দিন দুপুর থেকেই অগণিত লোক পার্কের দিকে রওয়ানা হয়েছিল, আমি রওয়ানা হয়েছিলাম চারটার সময়।

পার্কে প্রবেশ করার পরই একদল লোক এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে, আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। এরূপ ঠেলাঠেলিতে অভ্যস্ত না থাকায় হঠাৎ পড়ে যাই। লোক আমার উপর দিয়ে চলতে থাকে।

হঠাৎ একটু ফাঁক পেয়ে বাঁ হাতে মাটি ঠেলে দাঁড়িয়ে গেলাম। লোকের স্রোত আমাকে সামনে ঠেলে নিয়ে গেল। আবার যখন সুমুখ থেকে ঠেলা পড়ল তখন বিনা পরিশ্রমে পার্কের বাইরে চলে এলাম। মহাত্মা গান্ধী ইত্যবসরে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন।

বাইরে এসে মনে হয়েছিল, মৃত্যু যে হয়নি তাই যথেষ্ট, কলিকাতায় না থাকলেও চলবে।

ব্রহ্মচারী নির্মলচৈতন্য এবং মিঃ দাস আমাকে উপদেশ দিলেন, তাড়াতাড়ি যেন কলিকাতা পরিত্যাগ করি। সাথী শৈলেন রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে এবং তার গ্রেপ্তারের সঙ্গে আমারও গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা বেশি। বন্ধুরা তাই বলছিলেন।

শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "শৈলেন, তোমার অবস্থা কিরূপ ?"

শৈলেন বললে, "অবস্থা মোটেই ভাল নয়, কখন যে গ্রেপ্তার হই বলিতে পারি না। যাকে বিশ্বাস করতে চেয়েছি, একটু বাজিয়ে দেখার পরই বুঝতে পেরেছি সে পুলিশের লোক। এখন বুঝতে পেরেছি গণ-আন্দোলন ছাড়া অন্য উপায় নাই। একদিকে ঘটি-বাটির পার্থক্য ও বিবাদ চরমে উঠেছে, অন্যদিকে মুসলিমরা হিন্দুদের মোটেই বিশ্বাস করতে পারছে না। আমরা এখন অচল। বৃটিশ সরকার এই দুটো আন্দোলনে কৃতকার্য হয়েছে।

"এরপর আর কিছু বলার আছে শৈলেন ?"

শৈলেন বললে, "হাঁ, আছে। আমার কাছে পত্র দিবেন না, পত্র না পেলে আপনার ঠিকানা পাবার উপায় থাকবে না। আপনার সঙ্গে যে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না, তাই প্রতিপন্ন করে পথ চলবেন। আমার ইচ্ছা, আপনি তাড়াতাড়ি মাতৃভূমি ইণ্ডিয়া পেরিয়ে যান। বিদেশে যেয়ে অন্তত আমাদের সঠিক অবস্থা বিদেশীদের বলতে পারবেন।"

শৈলেনের সঙ্গে সেদিনই প্রকৃত বিচ্ছেদ হয়েছিল। এরপর থেকে সে কোথায় থাকত, কি করত, জানবারও চেষ্টা করতাম না।

নির্ধারিত দিনে কলিকাতা হতে রওয়ানা হবার সময় শৈলেনের রুমে যেয়ে তার কাছে বিদায় নিয়ে ব্রহ্মচারী নির্মলচৈতন্য এবং মিঃ দাস-সমভিব্যাহারে হ্যারিসন রোড ধরে হাওড়ার দিকে রওয়ানা হলাম।

রাত তখন চারটা। হোটেল হতে বের হবার সময় ঈশ্বরের নাম করিনি দেখে সাথী দুজন একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন্?"

উত্তরে বললাম, "আমি শুধু আমার আমিত্বে বিশ্বাসী।"

এঁরা আর কথা বললেন না। চিৎপুর রোডে যেয়েই তাঁদের ফিরে যেতে বললাম। তাঁরা ফিরে গেলে মনে হয়েছিল আমার পিতামহের সন্ন্যাস গ্রহণ করার কথা। আমার বাবা যখন চাকরি করতেন তখন আমার পিতামহ সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। আমার বাবা পিতামহের সঙ্গে কতদূর যাবার পর পিতামহ যখন দেখলেন যে তাঁর ছেলে পেছন নিয়েছে, তখন তিনি ঢিল ছুড়ে মেরেছিলেন পুত্রের প্রতি এবং বলেছিলেন, "এখন তুমি আমার কেউ নও।"

আমার পিতামহের এটা শ্মশানবৈরাগ্য ছিল না, অবতারবাদের প্রতি আক্রোশ হয়েছিল। বেদান্তের পণ্ডিত কি করে অবতারবাদ গ্রাহ্য করতে পারে? সমাজে থাকতে হলে অবতারবাদ মানতে হবেই। সেজন্যই আমার পিতামহ সমাজ পরিত্যাগ করেছিলেন। সে বড়ই দুঃখের কাহিনী। আজ এঁদের বিদায় করে দেবার পর অবতারবাদের কথাই বারবার মনে হয়েছিল। কিন্তু মায়াবী বাংলার মাটি এতই মধুর যে বৃন্দাবন-মথুরা এসব কি তার চেয়ে মধুর হতে পারে? যদি কেউ বলে জন্মভূমি হতেও সুখধাম আছে, তবে সে মিথ্যাবাদী, অবশ্য আমার মতে।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে চায়ের অর্ডার দেবার পর মনে এত দুঃখ হয়েছিল যে চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়ছিল। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে রওয়ানা হলাম।

শ্রীরামপুর

শ্রীরামপুরের সেবাশ্রমে আমার কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। পূর্বের কথা মত তাঁদের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বললাম, "বিশ্রাম করতে চাই বন্ধুগণ!"

কিসের জন্য বিশ্রামের দরকার সকলেই জিজ্ঞাসা করবেন।

কলিকাতা কর্মময় শহর; এখানে কাজ থাক্ বা না থাক্, মন সব সময় চঞ্চল থাকে। মনের বিশ্রাম অতি দরকার। আমার পক্ষেও মনের বিশ্রামের দরকার হয়েছিল।

শ্রীরামপুর এক অদ্ভুত জায়গা। চারিদিকে দুর্গন্ধ। আণ্ডার গ্রাউণ্ড ড্রেন না থাকায় সে দুর্গন্ধ এতই বেশি মনে হয় যে, পথ চলা কঠিন। এখানকার যাঁরা মধ্যবিত্ত অর্থাৎ যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের জীবন সত্যিকারের নূতন বলেই মনে হয়েছিল। গামছা পরে গঙ্গাস্নান, ছুৎমার্গের চরমত্ব অথচ 'চন্দনের গন্ধে' সব সময় নিমজ্জিত। কলমবাজ ও কোদালবাজ নিয়ে লোকের সংখ্যা গঠিত। কেরাণী আর মজুর, এরাই এই শহরের বাসিন্দা। এর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম শুধু এক ঘর জমিদার।

চুঁচুড়া

চন্দননগর দেখবার ইচ্ছা থাকায় সেখানেও এক রাত কাটিয়েছিলাম; কিন্তু প্রাণের সন্ধান না পেয়ে চুঁচুড়াতে প্রিয় বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত ষোড়শী সেন মহাশয়ের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। ডাক্তার সাহেব মালয়দেশে কয়েক বৎসর কাটিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম।

এখানে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এঁদের কাছে সর্বপ্রথম শুনলাম, ভূত-প্রেত যারা বিশ্বাস করে, তাদের মত মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর কেহ নাই।

ভূত-প্রেত কেন নাই জানতে ইচ্ছা হয়েছিল এবং তাদের একজনকে বললাম, "সকলেই বলে ভূত-প্রেত নাই কিন্তু বিশদ ভাবে কেউ বলতে পারে না ভূত-প্রেত কেন নাই! দ্বিতীয় কথা হল যারা ভূত-প্রেত নাই বলে, তারাই ভূত-প্রেতকে ভয় করে বেশি।"

সেই যুবক বললেন, "ঠিক বলেছেন। আপনার কথার প্রতিবাদ করার মত কিছু নাই; কিন্তু আমরা কেন ভূত-প্রেত নাই বলি, তার কারণ শোনা আপনার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারেন আঘাত এবং প্রতিঘাত করতে পারে প্রাণবন্ত বস্তু; যদি তাই হয় তবে ভূত-প্রেতেরও প্রাণ আছে। যাদের প্রাণ আছে তাদের আবাসস্থলও আছে।"

বলতে বাধ্য হলাম, "বায়ুর প্রাণ নাই, আকারও নাই; অথচ প্রাণবন্ত বস্তুর মত গতিশীল। ভূত যদি সেরূপ কিছু হয় তবে আপনারা কি বলবেন?"

যুবক বললেন, "আমাদের দেশে যাঁরা ভূতের গল্প বলেন, তাঁরা ভূত-প্রেতকে আকৃতি দিয়ে থাকেন, অনেক সময় প্রকৃতিরও সমাবেশ করেন। যার আকৃতি আছে, প্রকৃতি আছে, তার প্রাণও

আছে। যে জিনিস মানুষকে ভয় দেখাতে পারে, এক স্থান হতে অন্যস্থানে যেতে পারে, এমন কি কোন কোন গল্পকারীর মতে নাকে কথাও বলতে পারে, সেই অদ্ভুত জীব, সেই জীব থাকে কোথায়? আপনি অনেক কিছু দেখেছেন, সেরূপ জীবের সন্ধান পেয়েছেন কি?

উত্তরে 'না' বলতে হল। যুবকেরা বললেন, "এই ধরণের গালগল্পে মন দেবেন না, দেখবেন আপনার কাছে কখনও ভূত-প্রেত আসবে না।"

প্রায় দশ বৎসর পৃথিবীর সর্বত্র বেড়িয়েছি কিন্তু কোথাও ভূত-প্রেতের সন্ধান পাইনি। তার চেষ্টাও করি নাই। কারণ, আমার গন্তব্য স্থল ইউরোপ। ইউরোপে যেতে হলে যে সকল গুণ অর্জন করা দরকার অর্থাৎ স্বদেশ-সম্বন্ধে যে সকল তথ্য অবগত হওয়া চাই, সেদিকেই দৃষ্টি বেশি ছিল।

ষোড়শীবাবুর বাড়ী হতে বের হয়ে সোজা বর্ধমানের পথ ধরলাম কিন্তু একদিন বর্ধমান যাওয়ার পথে পাশেই এক অজানা গ্রামে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা হওয়ায় গ্রামে গেলাম। কিন্তু গ্রামের লোক আমাকে গ্রহণ করল না। খাকি পোশাক থাকায় পুলিশ মনে করে থাকতে দেয়নি, অবশেষে এক ডাক-বাংলোতে আশ্রয় নেই।

ডাক-বাংলোতে চারিদিকে সুন্দর বাগিচা, সামনে দিয়ে বড় রাস্তা চলে গেছে। ঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ডাক-বাংলোর রক্ষক যে, সে সকল কাজ করে দিতে ইচ্ছুক; কিন্তু সকলে তার সাহায্য নিত না।

ডাক-বাংলোতে উঠেই ডায়েরী বই আনতে বললাম। বইটা নিয়ে আসার পর নাম-ধাম লিখে দৈনিক চার্জ এক টাকা দিলাম এবং তার হাতে আর একটি টাকা দিয়ে বললাম, "ডাল-ভাতের ব্যবস্থা কর।"

লোকটি অবাক হল, আজ পর্যন্ত বোধহয় তাকে কেউ রান্না করতে বলেনি। তার রান্না-করা ভাত খাব শুনে সে আনন্দিত হয়ে কোথা হতে সুন্দর বিছানা নিয়ে এসে, উত্তম খাটের উপর পেতে দিয়ে বললে, "হুজুর, আপনি বিশ্রাম করুন, চায়ের ব্যবস্থা করছি ; সন্ধ্যার পর রান্না করব।"

তাড়াতাড়ি করে সে চা হাজির করল এবং একটা আলমিরা দেখিয়ে বলল, "এখানে বই আছে, বই পড়ুন।"

আলমিরাতে শুধু ইংলিশ পুস্তক ছিল। একখানা পুস্তক বের করে পড়তে আরম্ভ করলাম। সন্ধ্যার পূর্বে ডাক-বাংলোর চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ আরামপ্রদ মনে হয়েছিল। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা প্রকট হয়ে উঠল।

গৃহরক্ষক বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে করজোড় করে বললে, "বাবু, জাতে আমি মেথর, আমার হাতের রান্না খাবেন কি ?"

"হাঁ, খাব, ভাল করে রান্না কর।" এই বলে লোকটিকে বিদায় দিলাম। মেথরের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ; সে চলে গেল রান্না করতে।

আমি তখন তারই কথা ভাবছিলাম। পূর্ব-এশিয়ার সর্বত্র ঘুরে এলাম, কোথাও মেথর নামে কোন জাত দেখতে পাইনি। জাতি-বিভাগ শুধু হিন্দুদের মধ্যেই দেখা যায়। অভিশাপ হিন্দুদের ঘাড়েই চেপেছিল এবং এখনও চেপে আছে।

জাপানী জাহাজ 'হিয়েমারু'তে করে কেনেডা গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি, যে লোক রাত চারটার সময় জাহাজের পাইখানা পরিষ্কার করত, সেই লোকই সকালে সাতটার সময় সাজসজ্জা করে 'ব্রেকফাষ্ট' পরিবেষণ করত।

আর আমাদের দেশ ! হিংসার দাবানল চারিদিকে প্রজ্বলিত। সকালে ঘুম থেকে উঠে নিদ্রা যাবার পূর্ব পর্যন্ত আমরা হিংসার উপাসনা করি। যে আমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায়

রাখে, তার ছায়া মাড়াই না; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে আমাদের ক্ষেত চাষ করে, তাকে আমরা নীচ জাত বলি; যে মজুরী করে অন্নের সংস্থান করে, তাকে বলি কুলি। আমরাই শোষক ও কাপুরুষ; আমরাই ধনতন্ত্রবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী। আমাদের ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ এতই শক্ত যে, বৃটিশ অথবা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী আমাদের কাছে নাবালক শিশু!

রাত আটটার সময় পরিষ্কার টেবিলের উপর ডাল, ভাত, তরকারী ও কাঁচের গ্লাসে করে জল আর কাঁটা-চামচ রেখে দিয়ে মেথর বললে, "কর্তা খেতে বসুন।"

খেতে আরম্ভ করলাম। সুপক্ক অন্ন, সুসিদ্ধ ডাল এবং উত্তম তরকারী হতে 'ফ্লেভার' বের হয়ে মনকে আমোদিত করে তুলছিল। কাঁটা-চামচের সাহায্যে ভোজন সমাপন করে মেথরকে বললাম, "টেবিল পরিষ্কার করে চলে যাও, সকালে তোমাকে কিছু দেব ও যাবার পূর্বে ডাকব।"

সমস্ত রাত এক ঘুমে কেটেছিল। খাওয়াটাও হয়েছিল চমৎকার! কোথাও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলেও এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রকম খেয়েছি বলে মনে হয় না। তারপর টেবিল-চেয়ারে বসে খেলে যেমন তৃপ্তি হয়, মাটিতে বসে, মাটির সঙ্গে কথা বলে, আদিযুগের আচার-ব্যবহার বজায় রেখে চললে মোটেই সে রকম তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

বর্ধমান

পরের দিন বর্ধমান পৌঁছলাম। পুরাতন শহর বলতেই হবে। মোংগল আমলে এই শহর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বর্ধমান হতে দারজিলিং পর্যন্ত একটি রাজপথ বর্ধমানের জমিদার করিয়েছিলেন। বর্ধমানের জমিদারের উপাধি 'মহারাজ'। কিন্তু এটি 'মহারাজ' শব্দের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্ধমানে একটি হোটেলে আশ্রয় নেই। বিকালে মহারাজের বাড়ি দেখে মনে হচ্ছিল সেই মোংগল যুগের বাড়িঘর।

সেখান থেকে ফেরবার পথে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি 'চাবুক' সাপ্তাহিকের একজন কর্মী। তাঁদের আফিসে আমাকে নিয়ে বসালেন। বলবার মত কিছুই ছিল না। তাঁরা বিপ্লবী ছিলেন না, মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অহিংসবাদী ছিলেন। পুলিশ দেখলেই তাঁরা পিঠ পেতে দিতেন। কিন্তু আমি এমন কতকগুলি দেশ বেড়িয়ে এসেছিলাম, যে সকল দেশে কেউ পিঠ পেতে দিত না, লড়াই করত, এবং মরত।

আমার কাছ থেকে তাঁরা শুনলেন চীনাদের যুব-আন্দোলন। শুনে তাঁরা ভীত হয়েছিলেন। ভীতির সঙ্গে কৌতূহলের নিকট-সম্বন্ধ। পরের দিন এই পত্রিকা আমার বর্ধমানে আসার সংবাদ এবং চীনের বিপ্লবী জীবনের কয়েকটি বক্তৃতা প্রকাশিত করেছিল। কি মনে করে এক উকিল মহাশয় আমাকে পরের দিন খেতে বলেন। আমার তাড়াহুড়া ছিল না, সেজন্য তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই।

ভোজনান্তে উকিল মহাশয় আমাকে তাঁর ক্লাবে নিয়ে যান। ক্লাবে কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁদের মুখের 'এক্সপ্রেশন' দেখেই মনে হয়েছিল এঁরা আমাকে ভিখিরী

মনে করেছিলেন। অজানা ভাষা-প্রচলিত দেশে বৎসরের পর বৎসর ভ্রমণ করলে মানুষের মুখ দেখলেই মানুষ কি ভাবছে, সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করা যায়। না বসেই আমি বললাম, "আমি এখানে ভিক্ষা-পাত্র হাতে আসিনি। এই ভদ্রলোক আমাকে তাঁর ঘরে ভোজন করিয়েছেন, তাঁর অনুরোধে আপনাদের এখানে এসেছিলাম; মনে করেছিলাম আপনারা হয়তো উৎসাহী হয়ে কিছু জানতে চাইবেন; কিন্তু দেখলাম আপনারা আমার কাছ থেকে কিছু জানবার পরিবর্তে বিদায় দেবার পক্ষপাতী, অতএব বিদায়!"

কথা বলেছিলাম ইংরেজীতে; কারণ যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা ইংরেজী ভাষার ভক্ত। এরপর এঁদের কোন কথা না শুনেই হোটেলে চলে আসি।

সকালে আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবুও দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে হল। বেলা আটটার সময় রওয়ানা হয়ে একটানা আট মাইল পথ চলে দেখলাম, হনুমানদের এক বিরাট সভা বসেছে!

অনেকগুলি বাঁদর মাথা নত করে বসেছিল। আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দেব মনে করে যেমন সাইকেল থেকে নেমেছি, অমনি হনুমানদের সভাভঙ্গ হয়ে গেল। হনুমানদের শান্তিভঙ্গ করেছি মনে করে দুঃখিত হলাম। কিন্তু কি আর করা যায়, হনুমানদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগও ছিল না, তারা তখন চলে গিয়েছিল অনেক দূর।

তখন আমার গন্তব্যস্থল ছিল আসানসোল কিন্তু একদিনে এত লম্বা পথ চলা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হবে না মনে করে মাঝ-পথে কোন ডাক-বাংলোতে রাত্রি কাটাবার মনস্থ করে তাড়াতাড়ি সাইকেল চালালাম। পিচ্-দেওয়া রাস্তার ওপর সূর্যের উত্তাপ পড়ায় পিচ্ গলে গিয়েছিল। সাইকেলের টায়ারে পিচ্ লেগে

পিচ্ পিচ্ শব্দ করছিল। দু'দিকের দৃশ্যাবলীও তখন মোটেই আরামপ্রদ ছিল না।

মাইল কুড়ি যাবার পর দেখলাম, এক দল সাধু বসে আছে এবং বিশ্রাম করছে। তারা যাবে কলিকাতায়, অতএব পর্যটক বলতেই হবে। তাদের কাছে বসতে ইচ্ছা হল। গেলাম তাদের কাছে কিন্তু তারা আমাকে পছন্দ করল না। সৌজন্যতাসূচক একটি কথাও যখন তাদের মুখ থেকে বের হল না তখন সিগারেট বের করে দিলাম।

ব্যস্, তক্ষুণি একেবারে দাঁত বের করে হাসি! যেন কত পরিচিত! আপ্যায়নের আর শেষ থাকল না!

ধন্য সিগারেট! সিগারেটের মহিমা অপার! মুহূর্ত পূর্বে যারা অবজ্ঞা করেছিল, নিমেষে তাদের মন-পরিবর্তন হল। যে জিনিস মানুষের মন এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করতে পারে, সেই জিনিসের অলৌকিক শক্তি রয়েছে, বলতেই হবে।

সাধুরা আমার পরিচয় চাইল। আমার পরিচয় দিলাম। এদের মধ্যে একজন সাধু হিন্দী কথার মধ্যে দুই একটি ইংলিশ শব্দ যোগ দিচ্ছিল, তার উদ্দেশ্য যাই থাকুক আমি কিন্তু ইংলিশ শব্দ প্রয়োগে একটুও খুশী হই নাই। বললাম, পাসপোর্ট করে বিদেশ ভ্রমণ করলে ভাল হবে। সাধু বললে, সে বিদ্যাবুদ্ধি তার নাই।

কি আর বলি, শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, "এখান থেকে ডাক-বাংলো কতদূর হবে?"

"বেশি দূর নয়, এই দু' ক্রোশের বেশি নয়।"

এদিকে মাইল শব্দের প্রচলন নাই, ক্রোশ শব্দের প্রচলন রয়েছে। বুঝলাম, আরও চার মাইল গেলেই বিশ্রাম করতে পারব। আরও একটি বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম—বিহার পৌঁছুতে পারলেই ধরমশালা পাব ও স্বাধীনভাবে বিশ্রাম করার সুযোগ মিলবে। ব্রহ্মদেশ থেকে আরম্ভ করে মাতৃভূমি বঙ্গদেশ পর্যন্ত ধরমশালা নাই। না থাকবার একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রায়

পরিবারের বাড়ির সামনেই একটা করে বড় ঘর থাকে, সে ঘরে থাকা চলে ; কিন্তু আমার সেরূপ মনোবৃত্তি ছিল না।

কোরিয়া, চীন, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, শ্যাম এবং ইন্দোচীনের সর্বত্র লজিং-হাউসের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেক লজিং-হাউসে উত্তম বিছানা, ও ভাল স্নানের ব্যবস্থা থাকে ; আমি ছিলাম তাতেই অভ্যস্ত। কাজেই বাইরের ঘরে বসা, এঁদো পুকুরে স্নান করা ও ক্ষুধার্ত হয়ে অন্নের অপেক্ষায় থাকা পছন্দ করতাম না। এর উপর যদি কতকগুলি লোক ক্রমাগত প্রশ্ন তুলে হয়রান করে তবে কেমন মনে হয়? হায়রে আমার মাতৃভূমি! তবুও তুমি পেছনে থেকে টান, আর তোমার দিকেই আমার টান!

সাধুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার রওয়ানা হলাম। এত উত্তপ্ত রৌদ্রে পথ চলে ডাক-বাংলো পৌঁছে দেখলাম, ঘরটা মস্ত বড় —চারটি খণ্ডে ভাগ করা। খানসামা রয়েছে, ইউরোপীয়ানদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। চার্জ দৈনিক ছু' টাকা। ছু'টি টাকা দিয়ে পরিদর্শক-বইএ নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম।

বাবুর্চি বাঙ্গালী কিন্তু বাঙ্গালীকে গ্রহণ করা এবং যথাসাধ্য কম্ফর্ট দেওয়ার দিকে মোটেই এর মন ছিল না। লোকটিকে স্নানের জল ও চা আনতে বললাম। কিন্তু তার মুখ দেখেই মনে হল সে আমাকে চা ও জলের ব্যবস্থা করে দিবে কি না সন্দেহের বিষয়। আমিও গম্ভীর হয়ে একখানা আরাম-কেদারায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম।

কতক্ষণ পর লোকটি ইংলিশ কায়দায় চা দিয়ে বললে, "এর দাম চার আনা হুজুর, খাদ্যের দাম হবে আড়াই টাকা, কেরোসিনের দাম হবে চার আনা।" তৎক্ষণাৎ তিন টাকা দিয়ে বাবুর্চিকে বিদায় দিলাম।

আমি যে রুমটা নিয়েছিলাম, সে রুমেই বই ছিল। একখানা পুস্তকে মনোনিবেশ করলাম। পড়তে বেশ ভাল লেগেছিল। বইটা

যখন পড়ছিলাম তখন মেথর এলো এবং জল উঠিয়ে এনেছে জানাল।

কতক্ষণ পর স্নান করে খেতে বসলাম। ডাল এবং মাংস ছিল, ভাতও মন্দ ছিল না ; কিন্তু বাবুর্চি যেন সংকোচবোধ করছিল। সে বলল, "নূতন বেডশীট্ দিতে হলে আরও দু'আনা দিতে হবে।"

তৎক্ষণাৎ দু'আনা দিয়ে বললাম, "আর কিছু যদি বলার থাকে, তা বলতে পার।"

বাবুর্চি অমনি বললে, "মেথর জল উঠিয়ে দিয়েছে, তাকেও কিছু দিতে হবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কত দিতে হবে ?"

"আরও দু'আনা হুজুর !"

আরও দু'আনা দিয়ে বললাম, "তাহলে এখন তুমি যেতে পার।"

বাবুর্চি চলে গেল। বুঝলাম অপদার্থ বাঙ্গালীবাবুরা অনেক সময় চার্জ না দিয়েই বিদায় নেন, সেজন্যই নগদ মূল্যের ব্যবস্থা। শোবার পূর্ব-মুহূর্তে বাবুর্চি এসে বলল, "আপনি অম্লানবদনে যেমন করে চার্জ দিয়ে দিয়েছেন, তেমন করে আজ পর্যন্ত কোন বাঙ্গালী-বাবু পাওনা দেন নাই, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

বাবুর্চির ধন্যবাদ না পেলেও চলত। সুখের বিষয় বুঝতে পারলাম, আমার ধারণাই ঠিক।

ডাক-বাংলোতে রাত সুখেই কেটেছিল। যদি আমাদের দেশে ডাক-বাংলো ও হোটেলে বিছানা সরবরাহ-প্রথা থাকত তাহলে ভ্রমণ আরও সুখময় হত। ভ্রমণে ভারতবাসীর মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকত, মানুষ দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শিখত, মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন শক্ত হয়ে উঠত। কিন্তু সেরূপ হবার গোড়ায় আঘাত করেছিল কাস্টইজম। কাস্টইজম এনে দিয়েছিল ছুৎমার্গ আর ছুৎমার্গ এনে দিয়েছিল ঘৃণা। তার

ফলে বর্ণ-হিন্দুর ঘরে কুকুর-বিড়াল প্রবেশ করতে পারত কিন্তু তথাকথিত নীচ জাতের লোক প্রবেশ করলে ঘর পরিষ্কারের ব্যবস্থা এখনও আছে।

কবে এই দুষ্ট নিয়ম বিদায় নেবে বলা শক্ত। সেজন্য আমরা পাঁচজন মিলেমিশে একই ঘরে রাত কাটাতে পারি না। যেক্ষেত্রে আমরা এক ঘরে বাস করতে পারি না, সেক্ষেত্রে অপরের ব্যবহৃত বিছানাতে কোন মতেই ঘুমোনো সম্ভব নয়। যারা দু' কথা ইংরেজী শিখেছিল তারা নিজের পূর্বপুরুষের গোড়ামী বজায় রাখার জন্য "হেল্‌থ্‌" অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষার দোহাই দিয়ে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। ভারতীয় আবহাওয়া এরূপ দুষ্ট বুদ্ধির সহায়তা করেছিল এবং এখনও করছে।

প্রাকৃতিক সহায়তা না পেলে কাস্টইজম জন্ম নিত না। শীতপ্রধান দেশের কোথাও কাস্টইজম দেখা যায় না। মোট কথা, এক হিন্দু-অধ্যুষিত ভারত ছাড়া আর কোথাও কাস্টইজম দেখা যায় না। আমাদের দেশের মেথরদের সামাজিক এবং দৈনন্দিন অবস্থা দেখলে যে কোন বিদেশীর মাথা লজ্জায় নত হয়ে আসে কিন্তু আমাদের দেশে সুসমাজ না থাকায় লজ্জা যেমন নাই, বিদেশে যাওয়া-আসা ছিল না বলে সমাজ কাকে বলে সে-ধারণাও নাই। এ বিষয়ে হিংসুকের তর্কের শেষ নাই, অতএব বৃথা বাগাড়ম্বর করেও লাভ নাই।

মালয় দেশের পিপাং দ্বীপে পৌঁছার পর একজন শিখের ঘরে থাকতাম। প্রত্যেক দিন সকালে নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত তার ঘরে দুর্গন্ধ অনুভব করতাম। একদিন শিখকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাইয়া, বদ্‌বই কিধারসে আতাহে?" শিখ বলল, "ঘরের পেছনে চীনা মেথরেরা সর্বদাই সকালে নটা হতে দশটা পর্যন্ত স্নান করে।"

পরের দিন নির্ধারিত সময়ে মেথরদের স্নানাগারে গেলাম।

প্রকাণ্ড ঘর, এক সঙ্গে একশত লোকের শাওয়ার-বাথ্ নেবার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেকটি লোক ঘরে প্রবেশ করেই যেখানে যার নম্বর লেখা রয়েছে, সেই নম্বরের কাছে গিয়ে বিবস্ত্র হয়; বস্ত্রগুলি এবং পায়ের জুতা নম্বরের পার্শ্বে ঠেলে ফেলে দেয়। তারপর শাওয়ার-বাথ নিয়ে কলের সামনে যত্নে রক্ষিত এক টুকরো সাবান হাতে নিয়ে কলের নীচে বসে গাত্র মর্দন আরম্ভ করে দেয়।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট স্নান করার পর ঠিক বিপরীত দিকে রক্ষিত, হ্যাট, কোট, প্যাণ্ট, মোজা, নেকটাই ইত্যাদি পরে সে যখন ঘর থেকে বেরোয় তখন সে একজন পূরাদস্তুর চীনা সাহেব হয়ে গেছে! তার পরই সে চলে যায় নিকটস্থ চায়ের দোকানে।

সেখানে সর্বজাতির সমাবেশ। মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণেরও অভাব নাই। চীনা মেথর সকলের সঙ্গে একত্রে বসে চা খেয়ে নিজ নিজ ঘরে চলে যায়। পথে অথবা নিজের ঘরে কেউ তাদের ঘৃণা করে না। দেখতে পাওয়া যায়, এক ভাই মেথরের কাজ করছে, অন্য ভাই কেরাণীর কাজ করছে ও বাস করে একই সাথে, একই পরিবারে।

আমাদের দেশে মেথরদের জন্যে সেরূপ শাওয়ার-বাথ নাই, শিক্ষারও ব্যবস্থা নাই। যারা আমাদের সুখী রাখে, তাদের আমরা বাড়ির কাছেও আসতে দেই না, তাদের পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থাও করি না, অতএব আমরা যে কিরূপ "জীব" নিজেরাই তা বুঝতে পারি না। বিদেশীরা আমাদের অবস্থা সবই বোঝে কিন্তু মুখ খুলে কিছু বলে না, মুখ লুকিয়ে সকলেই হাসে।

বিকালে তিনটার সময় পৌঁছলাম আসানসোলে। পথের পাশেই একটি হোটেল দেখে তাতেই উঠলাম।

হোটেলের মালিক অতীব সজ্জন, সকলের সঙ্গেই তিনি সমব্যবহার করতেন। চা পানের পর তিনি আমাদের স্নানের ব্যবস্থা করে দিলেন। গরম জায়গায় স্নান করা খুবই আরামের। স্নান করে আরাম পেয়েছিলাম। বর্ধমানের পথে উকীল শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনি তাঁর বাসায় যেতে বললেন। না বললে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

পরের দিন সকালেই শৈলেনবাবুর বাড়ি গেলাম। সেখানে একজন এংলো-ইণ্ডিয়ান বসে ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের গল্প আরম্ভ করলেন। হঠাৎ মনে হল সেক্সটন ব্লেক যে প্রকারে ইংলণ্ডের স্থানগুলির বর্ণনা করেছেন, এই ভদ্রলোকের বর্ণনাও সেরূপ। জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ইংলণ্ড কবে ছেড়েছেন?"

ভদ্রলোক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বললেন, "আমার মাতৃভূমি ইণ্ডিয়া, এখানেই আমি জন্মেছি, মরবও এখানেই। ইংলণ্ড সম্বন্ধে শুধু বই পড়েছি, কখনও যাইনি।"

একদিকে মাতৃভূমির প্রতি প্রবল টান, অন্যদিকে পিতা-মাতার মাতৃভূমির প্রতি বিশেষ সম্মান। একাধারে দুইটি গুণ খুবই কমই দেখা যায়। সেই ভদ্রলোক পামার নামক এক ভদ্রলোকের নাম বললেন, যিনি কলিকাতা হতে বাগদাদ পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলেন। যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করি তবে অনেক সংবাদ জানতে পারব বললেন।

শৈলেনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পামার-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। রেল-বিভাগের কর্মচারী তিনি। তাঁর বাংলোর

চারিদিকের পরিবেশ দেখে মনে হল পামার সাহেব লম্বা বেতন পেয়ে থাকেন। পামারের সঙ্গে দেখা হল, তিনি তাঁর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা আমার কাছে বললেন। শেষটায় বললেন, কোয়েটা হতে ডুজদাপ পর্যন্ত রেল-ভ্রমণে তাঁর বড়ই কষ্ট হয়েছিল।

চাকরি-জীবনে কোয়েটা হতে ডুজদাপ পর্যন্ত আমিও রেলে গিয়েছিলাম এবং ফিরে আসতে হয়েছিল সেই পথেই। অতএব কোয়েটা-ডুজদাপ রেল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমারও ছিল। অন্য বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা-লাভ আমার হয়নি।

আমাদের দেশের কূপমণ্ডুক বিলাতী সাহেবদের মধ্যে যেমন মানসিক দুর্বলতা দেখা যায়, সেই দুর্বলতা পামার সাহেব দূর করতে পেরেছিলেন এবং আমার সঙ্গে বন্ধুভাবেই কথা বলে খুশী করেছিলেন।

পামারের জন্ম ইণ্ডিয়ায়। ইণ্ডিয়া হতে বিদেশে যেয়ে বসবাস করা এংলো-ইণ্ডিয়ানরা মোটেই পছন্দ করেন না বুঝতে পেরে সুখী হয়েছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে এংলো-ইণ্ডিয়ানরা যেরূপ সুখে-স্বচ্ছন্দে ইণ্ডিয়াতে বাস করতে পারেন, সেরূপ আর কেউ পারে না, এমন কি অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক পর্যন্ত এংলো-ইণ্ডিয়ানদের সুখ-সম্পদ দেখে হিংসা করতে বাধ্য হন।

কাছেই বার্ণপুর। সেখানে কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং হবে। কেরাণী, কুলি এবং সাহেবদের সমাবেশ হয়েছে। কেরাণীরা শক্তের ভক্ত এবং রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরে অভিজ্ঞ; কিন্তু রাজ-নীতিতে অংশীদার হয়ে কর্মক্ষেত্রে নামতে কেউই ইচ্ছুক নন।

কি আর বলি, এখানে কয়েক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ১৯১৯ সালে যাঁরা স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁরাই তখন বার্ণপুরে কেরাণী জীবন যাপন করার জন্য বার্ণ কোম্পানীতে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী-জীবন যদি চাগিয়ে যেতেন তবে প্রত্যেকেই হয়তো

কেউকেটা হতে পারতেন। তাঁদের অহঙ্কার এবং ইউরোপীয়ানদের প্রতি ঘৃণা দেখে মনে হচ্ছিল, ওঁরা চান শুধু বড় বড় চাকরি। বড় বড় চাকরি পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট কিন্তু যে সকল মজুর তাঁদের কলমের খোঁচায় চাকরি হতে বরখাস্ত হচ্ছিল, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটুও সতর্ক ছিলেন না, শুধু বেতন-বৃদ্ধিই এঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। অহঙ্কার এবং অনভিজ্ঞতা যাঁদের জীবনের একমাত্র সম্বল, তাঁদের সঙ্গে বেশিক্ষণ বাক্যালাপ করা চলে না। শহরে ফিরে এসে সেদিনই রওয়ানা হবার মত সময় ছিল না, নতুবা সেদিনই রওয়ানা হতাম।

দ্বিতীয়ত, কলিকাতা হতে যে টাকা সংগ্রহ করেছিলাম সেই টাকাতে আরও কয়েক সপ্তাহ চালিয়ে দেবার মত সম্বল ছিল। অর্থের অভাব না থাকলে মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছা হত না। বাস্তবিক অত্যধিক অর্থ সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করলে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে ইচ্ছা হয় না। আমারও সেই অবস্থা হয়েছিল।

সন্ধ্যার পর রেলওয়ে লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখলাম, লাইব্রেরী-রুমে কয়েকজন লোক তাস খেলছে এবং প্রত্যেকটি খেলার পরে তর্ক-বিতর্ক করে কার কোথায় দোষ, তাই জানিয়ে দিচ্ছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে লাইব্রেরী-রুমটা কোথায়?" অনিচ্ছাসত্ত্বেও একজন বললে, "এটাই লাইব্রেরী।"

বেশ ভাল লাইব্রেরী! একখানাও বই নাই অথচ নাম দেওয়া হয়েছে লাইব্রেরী! দেশের শিক্ষিত ও আভিজাত্যভাবপূর্ণ মহান্ ব্যক্তিরা তাস খেলেই দিনান্তের গ্লানি অপসরণ করছিলেন। চলে আসতে হয়েছিল রেলওয়ে-লাইব্রেরী হতে।

সকালে রওয়ানা হলাম পশ্চিমের দিকে। গন্তব্যস্থল ধানবাদ।

ধানবাদ

ধানবাদ পাহাড়িয়া অঞ্চল। আভা, লোহা এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ সেই অঞ্চলে রয়েছে জানতাম, তবুও দেরী করে অর্থাৎ পরের দিন ধানবাদ যাব ঠিক করলাম।

পথে একটি গ্রাম দেখে সেখানে না যেয়ে গ্রাম্য-পথে আরও ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, গ্রামে কালো এবং ইন্দো-এরিয়ানদের বসতি। উচ্চবর্ণের যারা তারা সকলেই ইন্দো-এরিয়ান, মুখার্জি, বানার্জি ইত্যাদি। কালো রংএর লোকমাত্রই সাঁওতাল অথবা সেই শ্রেণীর লোক। তাদের মধ্যেও কয়েক জন মুখার্জি-বানার্জির দেখা পেলাম; কিন্তু গ্রামের অবস্থা শোচনীয় এবং আমাকে অনেকেই পুলিশ মনে করে আতিথেয়তা হতে বঞ্চিত করেছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় বড় পথে আসতে হয়েছিল এবং সেইদিনই সন্ধ্যার পর ধানবাদে পৌঁছে একটি ছোট হোটেলে আশ্রয় নিয়ে স্বস্তি বোধ করি।

হোটেলের ঘরটা খুবই নীচু; কিন্তু ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম বেশ প্রশস্ত ঘর। ভেতরেই পাতকূয়া। পাশের বাড়িতে চায়ের দোকান। চা খেয়ে বিশ্রাম করার জন্য একটি কেরোসিনের বাতি ঘরে দেওয়া হয়েছিল। শোবার জন্য মাটির উপর একখানা চাটাই দিয়ে হোটেলওয়ালা বলেছিল, এর বেশি আর কিছু দেবার ক্ষমতা তার নেই।

দরকারও ছিল না। শোবার জন্য চাটাই পেয়েছি, আর কি চাই! আঙিনার মধ্যে পাতকূয়া হতে জল তুলে স্নান করে বেশ তৃপ্তি লাভ করা গেল। রাত্রে যে খাদ্য দেওয়া হল, সে খাদ্যও ছিল ভালই।

ধানবাদে বাঙ্গালীর ঘরেও মাছের ব্যবহার কম দেখা যায়।

কলাই ডাল, চড়চড়ি এবং টক রান্না হবেই। যেদিন মাছ হয়, সেদিন মনে করতে হবে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

হোটেলে রাত কাটিয়ে পরদিন একটি নির্জন ডাক-বাংলোতে চলে গেলাম। এরূপ ছোট হোটেলে থাকলে নাকি পর্যটকের ইজ্জত থাকে না। পূর্ববঙ্গ হতে যাঁরা কার্য উপলক্ষে এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন, তাঁদের মুখেই এসব বেশি শোনা যায়। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় লোক দৈনন্দিন কাজেই ব্যস্ত থাকে এবং অতিথি এলে সাধারণ রকমে যাহা করনীয় তাই করে।

নির্জন ডাক-বাংলোর চারিদিকে অনেক রকম গাছপালা। বোধ হয় ইউরোপীয়ানরা এখানে আসত এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করত; কিন্তু কি কারণে ডাক-বাংলোটা ইণ্ডিয়ানদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল!

ধানবাদে একটি মাইনিং স্কুল আছে এবং আশেপাশে মাইকার খনি থাকায় অনেক ধাতব পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। মাইনিংএ আমার অনুরাগ ছিল; কতকগুলি খনি দেখে আসার পথে একজন মাইনিং স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হয়। সাইকেলে আমার পরিচয় লেখা থাকাতে তিনি তা পড়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পর্যটক হয়ে মাইনিং-এর প্রতি অনুরাগ কেন?"

"মাইনিং সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে, সেজন্যই মাইনগুলি দেখে এলাম।"

কি জানি কি মনে করে, তিনি তাঁর কলেজে আমাকে নিয়ে গেলেন। কলেজে ছাত্রেরা তখন অধ্যয়ন করছিল অর্থাৎ পুস্তক পড়ছিল। এদের বই পড়া দেখে অবাক হলাম। বি-এস্-সি পাশ করার পর ধাতুগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে তিন মাসের বেশি সময় লাগতে পারে না। কিন্তু বললেন, চার বৎসর কলেজে পড়তে হয়, তারপর ছাত্রেরা ডিগ্রী পাবে। হাসলাম মনে মনে, কি আর বলি।

যাঁকে আমি প্রফেসর মনে করেছিলাম তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমাকে বসতে বলে ছাত্রদের একটি বড় রুমে ডেকে নিয়ে আমাকে বসালেন এবং বললেন, "আপনার মাইনিং অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিছু বলুন।"

মালয়, শ্যাম, বর্মা এবং ইন্দো-চীনের মাইনিং অভিজ্ঞতা বলার সময় বললাম, "কলিকাতায় অভ্র গালাবার কোনও কারখানা দেখতে পাইনি।" জিজ্ঞাসা করলাম, "এখান থেকে আভ কোথায় পাঠানো হয়?" উত্তরে প্রিন্সিপাল মহাশয় বললেন, "মাইকা আমাদের দেশের অন্যান্য কাঁচা মালের মত একটি কাঁচা মাল। বিদেশে পাঠিয়ে গালানো হয়।"

আমি বললাম, "যে ধাতুকে বিদেশে গালাবার ব্যবস্থা রয়েছে তার জন্য বিদ্যালয়ে কিছুই শেখানোর দরকার হয় না; এখানে শুধু মজুরের দরকার, অনর্থক আপনারা এখানে সময় নষ্ট করছেন।"

প্রিন্সিপাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললেন, "এখানকার লেবরেটরীতে মাইকা গলানো হয় এবং ছাত্রেরা নিজ হাতে তাই করে থাকে।"

তখন আমি বললাম, "এই ধরণের কাজ শিখতে একজন বি-এস্-সি ছাত্রের পক্ষে দু সপ্তাহের বেশি কোন মতেই লাগতে পারে না।"

প্রিন্সিপাল মহাশয় মহাবিপদে পড়লেন; তা দেখে আমি আমার মালয় দেশের অর্জিত অভিজ্ঞতা বলেই বিদায় নিয়েছিলাম। খনির মধ্যে আভের খনিই যা দেখা হল, কয়লার খনি একটুও দেখতে পারিনি; কিন্তু কয়লা-খনির মজুরদের দেখে মনে হচ্ছিল, খনির যারা মালিক, প্রকৃতপক্ষে তারা নিশ্চয়ই অমানুষ।

মালয় দেশের যে কোন মজুর আমাদের দেশের খনির মজুরদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় থাকে। বিদেশীরা যে সকল খনি পরিচালন

করে, তাদের মজুরের অবস্থা এদেশী মজুরদের চেয়ে অনেক ভাল। আসামের চা-বাগিচাতেও সেই একই অবস্থা। ইউরোপীয়ান পরিচালিত বাগানের কুলিরা তবুও বুঝতে পেরেছে তারা মানুষ কিন্তু আমাদের দেশবাসীদের পরিচালিত বাগানের কুলিরা মানুষ কি আর কিছু, কিছুই জানবার উপায় ছিল না।

আমাদের দেশের দুষ্ট জন্মান্তরবাদ আমাদের মা-বোনের কাল হয়েছে। কবে এই জন্মান্তরবাদ হতে রক্ষা পাওয়া যাবে বলা কঠিন। পূর্বে মনে করতাম, বৃটিশ চলে গেলে আমরা মানুষ হব। এখন দেখছি, আমরা এক পাও অগ্রসর হতে সক্ষম হইনি। জন্মান্তরবাদীরা বলে, কুলিরা অমানুষের মত কাজ করার জন্যই জন্মেছে আর বাগানের মালিক জন্মেছে এদের উপর রাজত্ব করতে।

ঝরিয়া কয়লার খনিতে সাঁওতাল এবং সেই শ্রেণীর লোক যারা বাংলা এবং পাহাড়ী ভাষা মিলিয়ে কথা বলে, তাদের প্রতি আমাদের বাবু, কনট্রাকটর ও কুলির সর্দারদের ব্যবহার দেখলে অবাক হতে হয়। একটি ছেলেকে এক গ্লাস জল আনতে বলেছিলাম। ছেলেটি ছেলেই, আর কিছু না ; কিন্তু বি-এ পাশ করা কেরাণী বলেছিল, "ছেলেটি অছুৎ জাতের লোক, অতএব তার দেওয়া জল পান করা চলবে না।"

এতে আমার বেশ রাগ হয়েছিল। প্রকাশ্যেই বলেছিলাম, "আমিও অছুৎ ; হিন্দুর অভক্ষ্য মাংস যেমন খাই, তেমনি মুসলমানের অভক্ষ্য মাংসও খাই। যাকগে, আপনার ঘরে জল খাওয়া হবে না। ছেলেটি মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, আমিও মানুষ।"

এখানেই কয়লার খনির ইতিকথা নয়। যদি কোন কেরাণীর ছেলের রোগ হয়, তবে ডাক্তারবাবু যথাসাধ্য করেন রোগ সারাতে, আর যদি কোনও কুলির ছেলের রোগ হয় তবে ডাক্তারবাবুর দর্শন পাওয়া যায় না। ডাক্তারবাবুর কাছে ধর্ম অনুযায়ী ঔষধের তারতম্য ছিল। যদি কোন খৃষ্টান কুলি অথবা মুসলমান কুলির

রোগ সারাতে যেতেন, তবে একটু ভেবে-চিন্তে ঔষধের ব্যবস্থা করতেন; কিন্তু যেই শুনলেন রোগী সাঁওতাল, অমনি মিকশ্চার দিয়ে বিদায় করেই খালাস!

কয়লার খনিতে শ্রেণী-বিভাগ নানা রকমের। ধর্ম নিয়ে শ্রেণী-বিভাগ, সমাজ নিয়ে শ্রেণী-বিভাগ, কাজ নিয়ে শ্রেণী-বিভাগ। যে সাঁওতাল কাজে ফাঁকি দেয় না, যারা মিথ্যা কথা বলে না, তাদের অত্যাচার করা ও তাদের প্রতারণা করা যেন সকলেরই অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল! কাজে সুবিধা পাবার জন্য অনেক সাঁওতাল ধর্ম-পরিবর্তন করার পর বাবুদের কাছ থেকে কিছুটা সুযোগ পাচ্ছিল বটে।

চীন দেশ ভ্রমণ করে আসার পর ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের স্থান নীচু স্তরের বলেই মনে করতাম। কেন যে করতাম তার বিশেষ কারণও ছিল। চীনা ধর্ম-মন্দিরে আমি প্রায়ই যেতাম এবং সেখানে যখন দেখতাম নানা রকমের বীভৎস ছবিকে চীনা স্ত্রীলোকেরা ভীতচিত্তে প্রার্থনা জানিয়ে বলছে, "আমাদিগকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর, ক্ষতি করো না," তখন কাগজে আঁকা দেবতার ছবির দৌরাত্ম্য দেখে দুঃখিত হতাম। নিজের আঁকা ছবি দেখে ভীত হওয়া বা সেই কাগজটার পূজা করা, সে কেমন কথা?

হয়ত অনেকে বলবেন, আমি কমিউনিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম, ধর্মদ্রোহী হয়েছিলাম। আসলে কিছুই হইনি, শুধু পুরোহিত-শ্রেণীর ভাঁওতা কোথায়, তাই বুঝতে পেরেছিলাম।

ভণ্ডামীর তাণ্ডব-লীলা চারিদিকে দেখতে পাচ্ছিলাম বলেই চীনদেশে অথবা নিজের দেশে কোথাও শান্তি পাচ্ছিলাম না।

ধানবাদে এক নূতন শব্দ শুনতে পেয়ে মনে হচ্ছিল, ভ্রমণ পরিত্যাগ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুণ্ডপাতে লেগে যাই। সেই নূতন শব্দের নাম "ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট।" নিজের দেশে থেকেও বিদেশী ছাপ না নিলে চাকরি পাওয়া যায় না।

বৃটিশ সরকারের বলা উচিত ছিল, বাঙ্গালীদের বেহারে চাকরি হবে না। এক কথায় সকল আপদের শেষ হত; তা না করে বিদেশী ছাপের সার্টিফিকেট যোগাড় করার কথা বলা হচ্ছিল। পৃথিবী হতে পাসপোর্ট এবং ভিসা লোপ হউক, এই ছিল আমার মতবাদ।

আমার মত লোক যখন বেহারে গিয়ে শুনতে পেল, ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট না হলে চাকরি হয় না, তখন বুঝতে পেরেছিলাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মানুষকে সর্বত্র ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করছে। দুঃখের সহিত বলছি, বৃটিশ যদিও আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেছে তবুও তাদের বিভেদ সৃষ্টিকারক দুরভিসন্ধিমূলক আইনগুলি এখনও রয়ে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে ধানবাদের অধিবাসীরা বাংলা ভাষায়ই কথা বলে অথচ হিন্দী অক্ষর তাদের মধ্যে প্রচলিত করার জন্য একদল লোক আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। ইষ্ট বেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলির মনোভাবের সঙ্গে এদের প্রকৃতির মিল ছিল।

এই যে কতকগুলি কথা বললাম, মনের দুঃখেই তা বলতে হল। ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের কার্যকলাপ বাঙ্গালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সহায়তা করেছে। তেমনি ভাবে বাঙ্গালী-বেহারীদের মধ্যেও বিভেদের পাঁচিল তোলা হয়েছে। বাংলা ভাষার উপর আঘাত করাও হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই। উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিষময় কাজের প্রতিক্রিয়া অপসরণ হবে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

বিদায় ধানবাদ!

ধানবাদের ডাকবাংলো-জীবন বড়ই আরামের ছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল না এখান থেকে অন্যত্র যাই ; কিন্তু বসে থাকা চলে না। বের হতে হল, ইউরোপ দেখার লোভ আমাকে ঘর হতে টেনে বের করে এনেছিল। আমাদের দেশের লেখকগণ ইউরোপের সৌন্দর্য এমনি করে লিখেছিলেন যা পড়লে ইউরোপ না দেখে উপায় ছিল না।

ধানবাদ হতে বিদায়ের রাতে ভাবছিলাম, চীন এবং জাপানে অনেক ইউরোপ এবং আমেরিকা-ফেরতা লোক দেখেছি ; তারা আমাদের দেশের বিদেশ-ফেরতাদের মত বিদেশীও হয়ে যায় নাই এবং বিদেশী শব্দ ব্যবহারও তেমন করে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও কারণ থাকতে পারে।

একবার আনন্দবাজার অফিসে যেয়ে 'ভয়ংকর' শব্দটি লিখতে হয়েছিল। একজন সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'আপনার ভয়ংকর বানান দেখে আপনাকে ভয়ংকরই মনে হচ্ছে।' শব্দের উচ্চারণ, শব্দ-বিশ্লেষণ ইত্যাদি নিয়েই সাহিত্যিক মহাশয় সব সময় সমালোচনা করতেন এবং দিনান্তে শাকান্নের শ্রাদ্ধ করে বলতেন, 'বেশ খেয়েছি!'

মনে হয় সেই যে অভ্যাস, তারই প্রতিধ্বনি বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের পড়েছিল এবং বিদেশ ভ্রমণ করে এসেও বিদেশের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি না শিখিয়ে তাঁরা বিদেশী ভাষা শিক্ষার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

ধানবাদ হতে বের হবার পর কেবলই উঁচু-নীচু পথে যেতে হচ্ছিল। পথ ধরে যারা চলছিল তাদের মধ্যে সাধুর সংখ্যাই বেশি। উত্তপ্ত গরমের মধ্যেও অনেকে হাঁটছিল। কিন্তু কোথাও একজন সাধুকে একাকী পথ চলতে দেখেছি বলে মনে হয় না। সর্বত্রই দুজন অথবা তার চেয়েও বেশি। কিন্তু দুজনে

পথ চলার সময় উপলব্ধি হয়েছিল যেন কিছুই দেখছি না, কিছুই শিখছি না। শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশে কোথাও দুজন বৃদ্ধ ভিক্ষুককে একত্রে চলতে দেখেছি বলে মনে হয় না।

মনের বিকাশ যদি করাতে হয় তবে চলতে হয় একা। ইচ্ছামত স্থানত্যাগ করা এবং ইচ্ছানুযায়ী সর্বত্র ভ্রমণ করাও যায়। শ্রমক্লান্ত সাধুদের অবস্থা দেখে দুঃখ হয়েছিল। যে শ্রম এড়াবার জন্য এঁরা গৃহত্যাগী হয়েছিলেন, পথ চলতে যেয়ে তাঁদের আরও বেশি পরিশ্রম করতে দেখে দুঃখই হয়েছিল। এঁদের না ছিল সংযম, না ছিল শিক্ষা; আমার মতই তাঁরা পথ চলছিলেন দু'খানা রুটির জন্য। আমার অবশ্য রুটির দিকে লক্ষ্য ছিল না, আমার লক্ষ্য ছিল দেখার দিকে। আমি অনেক সময়ই নিজেকে লক্ষ্য করে বলতাম, "চোখে দেখে নাও ভাল করে, দেখবার জন্যই পথে বেরিয়েছ।" কিন্তু ওঁদের লক্ষ্য ছিল শুধু রুটি, রুটি আর রুটি!

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল না মোটেই, কারো ছিল দেখার ক্ষুধা আর কারো ছিল পেটের ক্ষুধা! উভয়ের উপার্জন—শুধু ভিক্ষা। তাঁরা রুটি অথবা আটা ভিক্ষা করতেন, আমি ভিক্ষা করতাম টাকা। তাঁরা থাকতেন বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে আর আমি থাকতাম ডাক-বাংলো, ধরমশালা অথবা হোটেলে।

বেলা তখন দশটা, চায়ের গন্ধ আসছিল দূর থেকে। সেই চা খেতে যেয়ে দর্শন পেলাম গঙ্গাযাত্রী সম্প্রদায়ের। এখন তাদের কথাই বলব।

অপূর্ব অভিজ্ঞতা!—গঙ্গাযাত্রা খুবই সুন্দর কথা। গঙ্গাতীরের স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ বাতাসের মধ্যে আমগাছের নীচে চারপাইএর উপর এক বৃদ্ধ শুয়ে আছেন। তিনি গঙ্গাযাত্রা করবেন। অনেক পুণ্য করেছেন, তাই গঙ্গাযাত্রা।

প্রথম দিন তাঁকে দেখতে নাকি হাজার হাজার লোক এসেছিল।

গঙ্গাযাত্রী সকলের সামনেই 'খইনি' খেয়েছিলেন এবং দ্বিপ্রহরে পায়স ভোজনও করেছিলেন। রাত্রেও উত্তম ভোজন করেছিলেন। সবই চলছিল উত্তমরূপে কিন্তু গঙ্গাতীরের উন্মুক্ততা বৃদ্ধকে বিরক্ত করে তুলেছিল। তাঁর ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল ; কিন্তু লোকভয়ে ও সমাজের শাসানিতে ঘরে ফিরে যেতে পারছিলেন না। মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, মৃত্যুর নাম-গন্ধও নাই। তবে শরীর কিছু দুর্বল।

বৃদ্ধ একদিন শুনতে পেলেন, কয়েকজন পরামর্শ করছে। তারা বলা-কওয়া করছে, "বেশ বাবা, আজই ত' সব শেষ করা যায়। গভীর রাত্রে গঙ্গাজলে যদি চুবিয়ে ধরা হয় তবেই ঠিক ঠিক গঙ্গাযাত্রা হবে।"

বৃদ্ধের শরীরে তখনও শক্তি ছিল। তিনি মলমূত্র ত্যাগ করার নাম করে আত্মগোপন নয়, একেবারে জঙ্গলে পলায়ন করলেন। তারপর গেলেন পুলিশ-স্টেশনে। সেখানে তেওয়ারী মহারাজ সাব্-ইন্‌স্‌পেক্টর অব পুলিশ। গঙ্গাযাত্রীর উক্তি শুনেই গালি দিতে আরম্ভ করলেন, তারপর হিন্দী-উর্দু ভাষায় সুরু করলেন মাহাত্ম্য-প্রচার অর্থাৎ অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি।

গঙ্গাযাত্রী আর কি করেন, ডাইরী না লিখেই আত্মগোপনরূপ মহাপ্রস্থানের পথ অবলম্বন করলেন।

বয়স তাঁর পঁচাত্তরের উপর হয়েছিল। তার উপর গঙ্গাযাত্রাও তিনি করেছিলেন দু'শ লোকের মাঝখানে। সে লোক যদি সহসা গঙ্গাতীর থেকে অদৃশ্য হয়েও যান, তবু তাঁকে মৃতই বলতে হবে নিশ্চয়! হয়েও ছিল ঠিক তাই। যারা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর শেষকৃত্য করবার জন্য, গ্রামে এসে তারা তাঁর মৃত্যু-সংবাদই প্রচার করেছিল।

আত্মগোপন অবস্থায় তিনি নিজেও সে সংবাদ লোকমুখে শুনেছিলেন। তাঁর মৃত্যু না কি খুব সহজ ও সরল হয়েছিল! অমন সুন্দর সজ্ঞানে মৃত্যু নাকি কেবল পুণ্যাত্মাদের ভাগ্যেই হয়ে থাকে!

স্বামী শঙ্করানন্দ। মহারাজ বাবাজী শঙ্করানন্দ স্বামী হরিণ-শিশুর চামড়ার উপরে বসে গঞ্জিকা সেবন করছিলেন। কয়েকজন কালো লোক সামনে বসে রামনাম করছিল। জায়গাটা বাস্তবিকই আরামদায়ক, পেছনে মস্তবড় পাহাড়, তার উপরে বাবা পরেশনাথের মন্দির। বাঙ্গালীবাবুরা মোটর হাঁকিয়ে পরেশনাথ দেখতে এসে বাবাজী শঙ্করানন্দকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট দিয়ে গেছেন। গাঁজা হতে আরম্ভ করে সব কিছুই আনা হয়েছে। একটা মস্তবড় বটগাছ, তারই পেছনে হোগলার ঘর। ঘরের মধ্যস্থলে একখানা চারপাই। মেজেটা উত্তমরূপে মাজা-ঘষা। যদিও হোগলার ঘর তবুও শক্ত করে তৈরী এবং চারিদিকে মাটির ঢিবি থাকাতে 'লু' হাওয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারছিল না।

একটি লোক ঘরের মধ্যে মাটির হাঁড়িতে গরম জল করার পর চা ঢেলেছিল। চায়ের সুগন্ধ আমাকে টেনে নিয়েছিল সাধুর কাছে। প্রচলিত প্রথা-অনুযায়ী সাধুকে প্রণাম করতে হয়, শ্রদ্ধা জানাতে হয়। সাধুকে সেরূপ কিছুই করিনি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যখন জানতে পারলাম সাধুর নাম শঙ্করানন্দ, তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হল ; কারণ, আমারই এক কাকা—যাঁর নাম ছিল জানকীনাথ ভট্টাচার্য, তিনি পরে 'শঙ্করানন্দ' উপাধি নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে অনেক জনহিতকর কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এলোপ্যাথিক ডাক্তার। বিনা ভিজিটে রোগী দেখতেন এবং কেনা দামে রোগীকে ঔষধ দিতেন।

শঙ্করানন্দ মহারাজ আমার আগমনে এবং বেয়াদবিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেয়া মাংতাহে ?"

আমি বললাম, "পথিক আমি—পরিশ্রান্ত, এক পেয়ালা চায়ের প্রত্যাশী, দাম দিতে অক্ষম ; অর্থাৎ এই সময়ে যে মূল্য

রেস্টোরেণ্টে দিতে পারতাম, আপনাকে সেই দাম দেবার সাহস আমার নাই।"

সাধু একটু চেঁচিয়ে বললেন, "কেয়া কাম করতাহে ?"

"দুনিয়াকী মুসাফিরী করতাহে মহারাজ !"

"তব ত' তুম ব্যাসদেব! আও বয়ঠ, বিশ্রাম কর, চা পিলায়েগা, খানা ভি খিলায়েগা," ইত্যাদি বলে আমাকে চারপাই দেখিয়ে বললেন, "আরাম কর।"

বাস্তবিক আরাম। ঘরটাতে প্রবেশ করামাত্র শরীরটা ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করল। কতক্ষণ পর একটা ভাঁড়ে করে এক ভাঁড় চা দেওয়া হল। চা খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলাম; একটা বিড়ি ধরিয়ে কি চিন্তা করছিলাম, এমনি সময় সাধু ঘরে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমারা মাইবাপ জিন্দা হায় ?"

সাধুকে বললাম, "আমার বাবার মৃত্যু-সময়ে আমি সামনেই ছিলাম, মার না কি কাশীধামে গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছিল।"

"গঙ্গাপ্রাপ্তি কিরূপ একটু শুনাও ত মহামতি বেদব্যাস !"

"একটা বাড়ি ভাড়া করে আমার মা, ভাই এবং ভ্রাতৃবধূ ছিলেন। মার মৃত্যুর পর মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করা হয়েছিল।"

"নিমতলার ঘাটে কখনও গিয়েছ ?"

"না মহারাজ !"

"সেখানেও গঙ্গাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে।"

"কি জানি মহারাজ, মরণের কথা চিন্তা করি না।"

"বহুত আচ্ছা বেটা, খাও মজা কর, তুম আজ ইধারমে ঠেরেগা।"

আমিও সম্মত হলাম, এমন সুন্দর ঘর, তারপর পরেশনাথের মন্দির কাছেই। মন্দির দেখা পরিত্যাগ করেছিলাম; কিন্তু পরেশনাথের মন্দির দেখতে ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও শঙ্করানন্দ মহারাজের আকর্ষণ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল; অর্থাৎ তাঁর চারপাই, চা এবং খাদ্যই ছিল আকর্ষণের কারণ।

শঙ্করানন্দ মহারাজ দ্বিপ্রহরে উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করলেন, দই এবং ঘন দুগ্ধ আনবার জন্য গ্রামে লোক পাঠালেন। দই এবং ঘন দুধ আনার পর আমরা পাঁচজন খেতে বসলাম। একজন পরিবেষণ করার জন্য থাকলেন। পরিবেশক তাঁর খাদ্য পূর্বেই পৃথক করে রেখে দিয়েছিলেন এবং অবশিষ্ট খাদ্য পাঁচজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দিচ্ছিলেন।

খাওয়া হয়ে গেলে সাধু মহারাজ 'সিজার্স' সিগারেট ধরালেন, আমাকে একটা দিলেন। সিগারেট খাবার সময় বললেন, "বিকালে তোমার অভিজ্ঞতা বলবে, রাত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা তোমাকে শোনাবো।"

যেহেতু আমি বেদব্যাস, সেজন্য আমি চারপাই-এর উপর শুলাম ; অন্য পাঁচজন ভূমিশয্যা গ্রহণ করার পরই সাধু মহারাজের নাসিকা-গর্জন আরম্ভ হয়ে গেল।

ঘুমিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। চারটার কিছু পরে ঘুম ভাঙ্গে। হাতমুখ ধুয়ে একটু পায়চারী করবার সময় নিকটস্থ গ্রাম দেখে এলাম। গ্রামের লোক সবই কালো। শরীরের গঠন অতীব সুন্দর। নাক পাতলা এবং চোখা। গ্রামের লোক দেখে তাদের গোড়ার কথা জানবার চেষ্টা করছিলাম। তাদের ভাষা পালি ভাষার মতই, তবে বাংলা ভাষার সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে। মাঝে মাঝে দুই একটি অবোধ্য শব্দ শুনেছিলাম। বোধহয় তাই ছিল তাদের ভাষা। পালি ভাষা হয় তো পরে তারা আয়ত্ত করেছিল।

সন্ধ্যার পর আদেশ হল আর কিছুক্ষণ পর আমার পর্যটন-কাহিনী বলতে হবে। বসবার জন্য ভাল বন্দোবস্ত হল। আমি বসলাম শঙ্করানন্দজীর মুখোমুখী হয়ে। বলতে আরম্ভ করলাম অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা শুনে শঙ্করানন্দজী আনন্দিত হলেন, তারপর নিজের অভিজ্ঞতা বলতে আরম্ভ করলেন।

গত কয়েক বৎসর অর্থাৎ কালর এক যুগ তিনি ভারতের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেছেন। তার মধ্যে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং আসাম ভ্রমণ করার পর ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন। অবশেষে সরকার বাহাদুরের আদেশ নিয়ে কাবুল পর্যন্ত ভ্রমণ করে ফিরে আসেন। শঙ্করানন্দজীর দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল আমাদের দেশের লোক অন্তিমক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন করে, তাই দেখা।

মহারাজ বলতে আরম্ভ করলেন, একদা তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের দেশে ভ্রমণ করার সময় কৃষ্ণনগর নামে এক শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে এক বৃদ্ধ গঙ্গাযাত্রা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর পুত্রেরা তাঁকে নদীতীরে নিয়ে যায়। পথে তিনি তামাকও খেয়েছিলেন। বৃদ্ধকে নদীতীরে এক বৃক্ষের নীচে রাখা হয় এবং যখন যা দরকার তাই দেওয়া হতে থাকে।

বৃদ্ধ পরমানন্দে সাতদিন কাটাবার পর একদিন মত প্রকাশ করলেন যে, বাড়ীতে ফিরে যাবেন। তাঁর পুত্রেরা পিতার অভিপ্রায় শুনে দুঃখিত হল এবং একে অন্যে বলা-কওয়া আরম্ভ করল, 'নিশ্চয়ই পিতাকে ভূতে পেয়েছে, ভূত বেটা আমাদের বাড়ীতে যেয়ে কি যে অনিষ্ট করবে কে জানে?' পুত্রদের মন্তব্য শুনে অন্যান্য শ্মশানবন্ধুরা বললে, 'তোমরা একটু দূরে চলে যাও, আমরা দেখে নেব সেই ভূত কত শক্তিশালী! পুত্রেরা চলে গেলে পুত্রদের বন্ধুরা বৃদ্ধকে নদীর জলে ফেলে দিয়ে জলের নীচে চেপে ধরল।

দুর্বৃত্তেরা যখন বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটাচ্ছিল তখন পুত্রেরা ফিরে এসে পিতার দুর্দশা দেখে বললে, 'উঠিয়ে ফেল, এ যে খুন।' দুর্বৃত্তদের একজন বললে, 'কে বলছে খুন? তোমার পিতা গত পরশু মরে গেছেন, ভূত বেটা তোমার পিতার দেহ আশ্রয় করে গত দু'দিন যাবৎ আমাদের কষ্ট দিয়েছে।' তারপর দুর্বৃত্তেরা বৃদ্ধকে জলের তলা থেকে উঠিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল, তখন বৃদ্ধের শরীরে প্রাণ

ছিল না। মহাপ্রভুর দেশে যেয়ে এই উপদেশই পেয়েছিলাম, প্রাণ থাকতে যেন তথাকথিত ধর্মভাব না হয়।"

এরূপ অভিজ্ঞতা শঙ্করানন্দ মণিকর্ণিকার ঘাটে, নিমতলার ঘাটে এবং গোদাবরী-তীরে অনেক অর্জন করার পর এখন শুধু আরাম এবং আহারের মধ্যেই জীবনের লক্ষ্য সন্নিবেশিত করে রেখেছেন। প্রত্যেকটি দিন আরামেই কাটছে। তাঁর সাথীরা সকলেই একদা ছিলেন গঙ্গাযাত্রী, প্রত্যেককে শঙ্করানন্দ উদ্ধার করেছেন এবং এখন সকলেই তাঁর ভক্ত এবং প্রত্যেকের সময় সুখেই যাচ্ছে। মরণের চিন্তা কেউ করেন না; যখন কিছু ভাল লাগে না তখন স্থানত্যাগ করেন মাত্র।

শঙ্করানন্দ যে চারজনের জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলেন তাদের একজনের কিছু গুপ্তধন ছিল। সেই লোকটির ছেলেরা গুপ্তধনের সন্ধান না পেয়ে পিতাকে হত্যা করার জন্য গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করে। পিতা শ্মশানঘাটে কোনও উপায়ে অর্থাৎ শঙ্করানন্দ মহারাজের সাহায্যে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন, পরে গুপ্তধন সবই শঙ্করানন্দ মহারাজকে দান করে বর্তমানে তাঁরই সঙ্গে আছেন। সেই ভদ্রলোককে অত্যধিক মদের ভক্ত দেখে বাঙ্গালী বলেই মনে হয়েছিল কিন্তু ভুলেও তিনি একটি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করেননি।

স্বামী শঙ্করানন্দ এবং তাঁর পাঁচজন সহকারী সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মত সুন্দর বেশভূষাধারী। কারো মাথায় লম্বা চুল অথবা দাড়িগোঁফ ছিল না। প্রত্যেকের বয়সই সত্তরের কাছাকাছি তবুও তাঁদের শরীর বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। চিন্তা-ভাবনা তাঁদের ছিল না। যে মরণ এড়িয়ে এসেছেন, সেই মরণই ছিল তাঁদের একমাত্র চিন্তার কারণ। দীর্ঘায়ু হবার কোনও উপায় জানা থাকলে বলতে বললেন। দীর্ঘায়ু হবার উপায় জানা ছিল না, সেজন্য কিছুই বলতে পারিনি।

পরেশনাথের মন্দির—কতলোক সেই মন্দির দেখতে যায় তার হিসাব কে রাখে? যিশুখৃষ্টের জন্ম হবার পূর্বে অবতার পরেশ-নাথের জন্ম হয়েছিল। তিনি জীবে দয়ার কথাই বলেছিলেন। তাঁর উপদেশ মত যারা চলে, তাদের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়। প্রায় বড় বড় শহরেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। রেঙ্গুণেও তাদের দেখে এসেছিলাম। পরেশনাথের মন্দিরের কাছে এসেই পরেশনাথের উপদেশ এবং কার্যাবলীর কথা মনে হয়েছিল। চেষ্টা করে দেখব, সেই চিন্তাধারার কিছুটা লিপিবদ্ধ করতে পারা যায় কি না।

ভারতের এক শ্রেণীর লোকের কাছে পরেশনাথ অবতার অর্থাৎ Incarnation of God. ইংরেজী শব্দ কয়েকটি লিখতে হল, নতুবা কথায় জোর থাকে না। যিনি ছিলেন ঈশ্বরের অংশ, যাঁর ভক্তরা ভারতের বড় বড় শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকা অর্জন করছে, তাদের কারো কি দয়া-মায়া আছে? এদের মুখ থেকে শোনা যায়, 'পূর্বজন্মের পাপের ফলে লোক খেতে পায় না, ভাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে না' ইত্যাদি।

আমার জন্ম পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলায়। আমি কীর্তন করতে এবং কীর্তন শোনাতে অভ্যস্ত ছিলাম। সেখানেও জন্মান্তরবাদের কথাই বেশি শুনতাম; কিন্তু স্টালিনের সোভিয়েটে কি করে রাতারাতি সকলেই সুখী হতে পারল, তা কি চিন্তার বিষয় নয়? সেখানে কেউ অভাবে আছে দেখতে পাইনি। আমাদের দেশে যখন চাউলের সের দুই পয়সা ছিল তখনও লোক না খেয়ে মরত, তারই বা কারণ কি? হজরৎ মহম্মদ বলে গেছেন, যা আয় হবে তার দশ পারসেন্ট গরীব দুঃখীকে দিয়ে দেবে কিন্তু যে সকল

দেশে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচলিত, সেই দেশগুলিতে এত দারিদ্র্য কেন? অনেকে দিনান্তে একখানা রুটি খেতে পায় না, তার কারণ কি?

যাঁদের কাছে বসে এই ধরণের চিন্তা করছিলাম, তাঁরা কেউই ধর্মচর্চার ধার ধারতেন না। একজন হাত দেখতেন এবং তাঁর ফি ছিল পঞ্চাশ টাকা; অতএব তাঁদের কাছে এই ধরণের চিন্তার কথা বলা না বলা একই কথা। তাঁদের ভাষায় বলছি, 'যো কুছ্‌ দেখ্‌তা হায়, সবই বুজরকী—পয়সা রোজগার কা ফন্দি হায়।'

পরেশনাথের জন্ম নাকি কাশীতে হয়েছিল, সেখানে একটি মন্দিরও দেখেছিলাম এবং পরেশনাথের ভক্তের সংখ্যাও কম দেখতে পাইনি, তবে কেন কাশীতে দরিদ্রের সংখ্যা বেশি? জীবে দয়া যাদের মতবাদ, তাদের সামনে এতলোক উপবাস করে কেন? এতলোক রোগে কষ্ট পায় কেন? কোটিপতিরা কোটি পয়সাও দরিদ্রের জন্য দেয় না কেন? অথচ তারা পিপীলিকাকে চিনি দিয়ে সন্তুষ্ট করে, গরুর জন্য পিঁজরাপোল খোলে। কিন্তু বৃদ্ধ নরনারীর জন্য কিছুই করে না।

পরেশনাথের ভক্তরা বড় বড় ধর্মশালা করেছে বটে, সেখানে নিয়ম আছে, আইন আছে। সেই আইন মতে তিনদিনের বেশি কেহই ধরমশালায় থাকতে পারে না। রোগ হলে ত' রক্ষা নাই, ধরমশালার কাছেও যাবার উপায় নাই—এক ফোঁটা জলের আশাও করা যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে, পরেশনাথের ভক্তরা শুধু মানুষেতর জীবের সাহায্য করতেই ব্যস্ত কিন্তু যে মানুষের যথা-সর্বস্ব আইনের মারপেঁচে অপহরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে, সেই মানুষকে সব দিক দিয়ে বঞ্চনা এবং বর্জন করাই যেন এদের একমাত্র ধর্ম! এখানে অবতারবাদ সম্পূর্ণ রকমে ফেল্‌ করেছে।

আমি যখন পরেশনাথের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে এসব কথাই ভাবছিলাম, তখন একজন গঙ্গাপ্রাপ্ত সাধু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ভাবছেন বেদব্যাস?"

বলার মত কিছুই ছিল না, চুপ করেই থাকলাম। গঙ্গাপ্রাপ্ত সাধু বললেন, "পরেশনাথ দেখার কথাই ভাবছেন—কেমন নয় কি?" আমি বললাম, "অনেকটা তাই।"

গঙ্গাপ্রাপ্ত সাধু বললেন, "এসব দেখে লাভ হবে না, আমাদের সঙ্গে থেকে চা এবং দুধ খান এবং সেই সঙ্গে উত্তম খাদ্য খেতে থাকুন তবেই লাভ হবে। পরেশনাথের মতবাদ যারা মেনে চলছে, তারাই আমাদের দেশের কোটিপতি, তাদের চিন্তাধারা অন্য রকমের। কি করে টাকার সংখ্যা বাড়াবে কেবল সেইদিকেই তাদের লক্ষ্য।

বেশি কথা বলে লাভ নাই বেদব্যাস, আমাদের প্রত্যেকের বয়স সত্তরের উপরে; গঙ্গাযাত্রা করতে গিয়ে দেখেছি, আসলে গঙ্গাযাত্রা নয়, হত্যার একটা উত্তম ব্যবস্থা। নিজের ছেলে পিতার হত্যার ব্যবস্থা করে, এর চেয়ে বড় পাপ আর কি হতে পারে? পরেশনাথ দেখে লাভ নাই, আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকদিন থেকে শরীরটাকে সুস্থ করে আবার রওয়ানা হউন। যদি পারেন তবে একবার দোয়ারিকাশ্রম দেখে আসবেন। সেখানে আপনার যে অভিজ্ঞতা অর্জন হবে, সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেও সেরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন না।"

"কেন, সেখানে এমন কি আছে?" এই ধরণের প্রশ্ন করা আমার অভ্যাস ছিল না। গঙ্গাপ্রাপ্ত সাধুরাও বেশি কথা বলতেন না কিন্তু তাঁদের উপদেশ মনে রেখেছিলাম।

গঙ্গাপ্রাপ্ত সাধুরা অবতারবাদ মোটেই মানতেন না। তাঁরা বলতেন, "আরে ভাইয়া, অবতার হামলোককা মাফিকই আদ্‌মি থা, উনকা বাত ইয়াদ করনেসে কিয়া ফায়দা হোগা?"

আমাদের দেশে সাধু-সঙ্গ মাত্র আরম্ভ হয়েছিল সেজন্য বিশেষ কোনও কথা বলতে সাহস করতাম না। কিন্তু এদের সঙ্গে দুইদিন থেকে বুঝতে পেরেছিলাম সাধুদের মধ্যেও এমন কয়েকজন আছেন, যাঁরা মনের দুঃখে কষ্ট পাচ্ছেন অথচ লাল কাপড় পরিত্যাগ করতে পারছেন না।

সেরূপ একজন সাধুর সঙ্গলাভ হয়েছিল কলিকাতায়। তিনি কোনও বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন কিন্তু ভেতরের কাণ্ড দেখে তিনি দলত্যাগ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারত-ভ্রমণেই ব্যস্ত আছেন। সেই সাধুকে একদিন মাও-সুতনের জীবন-কথা বলেছিলাম। তিনি অবাক হয়ে রইলেন এবং কয়েকদিন পরে বলেছিলেন, "মহা কঠিন কাজ মাও করছেন যা আমাদের দ্বারা কখনো সম্ভব হত না।"

বাগ্‌দা

দুইদিন সাধুসঙ্গ করে বাগ্‌দা নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হই। ইচ্ছা ডান ও বাঁ-দিকের লোক দেখে যাওয়া। সকালেই উঠেছিলাম কিন্তু গঙ্গাযাত্রীদের অতি ভালবাসাতে চা না খেয়ে যেতে পারলাম না। বেলা হয়েছিল। বিদায়ের সময় কেহ আশীর্বাদ করলেন না, শুধু বললেন, "যাত্রা শুভ হউক।"

যাত্রা যে কত শুভ হয়েছিল পথে বের হয়েই বুঝতে পেরে-ছিলাম। ক্রমাগত চড়াই ঠেলে যেতে হচ্ছিল। অনেক স্থানে সাইকেল ঠেলতে হয়েছিল। পথের দু'পাশে অনেকগুলি গ্রাম দেখতে পেয়েছিলাম। গ্রামের বাসিন্দা হিন্দু মুসলমান সকলেই, মাঝে মাঝে খৃষ্টানও দেখছিলাম। আসলে এরা সবাই সাঁওতাল। হালে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান হয়েছে। আচার-ব্যবহার সাঁওতালদের মতই রয়ে গেছে।

ক্রমাগত চড়াই ঠেলে বাগ্‌দার ডাক-বাংলোতে পৌঁছি। মাত্র চৌদ্দ মাইল পথ। দু'দিকেই ছিল সামান্য রকমের বন-জঙ্গল। শালবনই বেশি। ভবিষ্যতে বিড়ি বানাতে এবং কাঠ ব্যবহারে বন থাকবে না। তবে মরুভূমি হবার সম্ভাবনা খুবই কম। প্রত্যেক গ্রামেই বৃক্ষের প্রাচুর্য দেখে আনন্দ হয়েছিল।

ডাক-বাংলোর দ্বারওয়ান বলছিল, এদিকে বিষাক্ত সাপের সংখ্যা বেশি। হবার কথাই, সবাই অহিংস হলে সাপ বাড়বেই। মনে হয়, এরা পূর্বে সাপ পূজা করত নতুবা সাপের প্রতি এত মমতা কেন ?

লজ্জার কথা—এই কালো লোকগুলির মধ্যেও অবতারবাদের গোঁড়ামি এত প্রবেশ করেছে যে, এক অবতারবাদী অন্য

অবতারবাদীর মৃত্যু কামনা করে। ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা কেউ পরিত্যাগ করতে পারে না, মানুষও পারে না, জীবজন্তু পারে না, কিন্তু পরিত্যাগ করতে পারে অবতারবাদ।

এখানের ডাক-বাংলোতে সাধারণত পাদ্রী সাহেবরাই থাকেন। প্রথমত আমাকে স্বদেশবাসী দেখে দ্বারওয়ান থাকতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। পরে যখন বুঝতে পারলো যে, দরজা পদাঘাতেই খোলা হবে তখন দ্বারওয়ানের হুঁস্ হয়েছিল। তার উপর যখন মিশনারী সাহেব ডাক-বাংলোতে প্রবেশ করেই আমার সঙ্গে করমর্দন করলে, আদিবাসী সাঁওতালের তখন আমার প্রতি শ্রদ্ধা হয়েছিল, সাহেবদের মতই ব্যবহার করছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, "শক্তের ভক্ত" সকলেই।

লোকে বলে, সাধুসঙ্গ সকলের সহ্য হয় না। আমারও কিন্তু ঠিক সেই অবস্থা। আমাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে শুনেছিলাম এবং অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও পড়েছিলাম, "ভারতভূমি পুণ্যভূমি, এখানে পাপীর স্থান নাই।" কিন্তু গঙ্গাযাত্রীদের দুঃখপূর্ণ কাহিনী শুনে সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। সাধুসঙ্গ সহ্য হচ্ছিল না।

এর পরে উত্তর ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করার সময় অনেক সাধুর সঙ্গলাভ হয়েছিল, সর্বত্র একই কথা। দীর্ঘ নিশ্বাস আর নিজের ভাগ্যকে গঞ্জনা করা ছাড়া আর কিছুই দেখতে এবং অনুভব করতে পারিনি। গয়ার কাছে রামশিলা পাহাড়ের নিকট এক সাধুকে বলেছিলাম, "একটা পয়সার জন্য এত পরিশ্রম! অর্থাৎ কৃচ্ছ্রতা না করে মজুরী করাই ভাল।"

পরেশনাথ হতে বাগ্‌দার (Bagodar) পর্যন্ত রাস্তাটা বাস্তবিকই ভয়াবহ, কেবলই চড়াই। মাঝে মাঝে দু-এক জায়গায় উৎরাই রয়েছে, সেই উৎরাইগুলিতে বেশিক্ষণ সাইকেলে বসা চলে না। পথের দুইদিকে শালবন এবং ক্বচিৎ গ্রাম পাওয়া

যায়, গ্রামের বাসিন্দা আদিবাসী। এদের ভাষা, আচার-ব্যবহার এখনও দেখতে পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়, তাদের আচার-ব্যবহার এবং আমাদের আচার-ব্যবহারে পার্থক্য মোটেই নাই। অথচ নিজেদের আমরা কত বড় মনে করি।

বাগ্‌দার ডাক-বাংলো বড়ই আরামের। চার্জ দুই টাকা, এখন বোধহয় বেড়েছে। চারিদিকের পাহাড়ী দৃশ্যাবলী বড়ই সুন্দর। রান্না করার জন্য একজন বাবুর্চিও ছিল। মোট চার টাকাতে রাত কাটিয়ে পরের দিন, হাজারীবাগের একটি বেহারী হোটেলে দৈনিক বার আনা করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম।

এখানকার আবহাওয়া বড়ই সুন্দর—উপরন্তু সব্জি, বন্যপাখী এবং মধু বড়ই সস্তা। অনেক বাঙ্গালী এখানে বাস করেন, অবশ্য তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ মোটেই হয়নি। শহরের মধ্যে একটি পাবলিক হলে কে বা কাহারা আমার কাহিনী শুনবার জন্য লেকচারের বন্দোবস্ত করেছিলেন। ঘণ্টাখানেক লেকচার দিয়ে হোটেলে ফিরে এসেছিলাম এবং ভাবছিলাম শুধু আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায়? হাজারীবাগে বসেই হাজারীবাগ সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখছিলাম।

হাজারীবাগে মাত্র একদিন ছিলাম, একদিনে কিছুই দেখা যায় না। পরের দিন আবার জি. টি. রোড ধরবার জন্য ফাঁড়ি পথে চলে বড়ই অসুবিধা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই পথ তৈরী হয়েছিল মিলিটারীদের ব্যবহারের জন্য; বোধ হয় ইউরোপীয়ান মিলিটারী সরে যাওয়ায় পথও "কালো" হয়েছিল। বার বার সাইকেল হতে নামতে হয়েছিল। পথ ছিল একেবারে কুপথ। অতি কষ্টে জি. টি. রোডে এসেই পেলাম ডাক-বাংলো। এই ডাক-বাংলোর ভাড়া দৈনিক এক টাকা এবং বাবুর্চি না থাকাতে খরচ কমই লেগেছিল।

বাস্তবিকই আমাদের মধ্যে পার্থক্যের অনুভূতি খুব বেশি। কলিকাতার বাবু সাহেবের শরীরের চামড়া এবং এদের শরীরের চামড়ায় বেশি পার্থক্য নাই। পার্থক্য শুধু ভাষায় আর "সফেদ"

কাপড়ে। কিন্তু এই পার্থক্যকে প্রকাণ্ড করে তোলা হয়েছে; নতুবা এই এলাকা জনগণের এলাকাতে পরিণত করতে কতক্ষণ?

আমাদের মনস্তুষ্টির চিন্তাধারা এবং সামাজিক নিয়মই হয়েছে আমাদের একের নম্বর শত্রু। কলিকাতায় দেখে এসেছিলাম বিপ্লবীরা আত্মগোপন করতে স্থান পাচ্ছেন না, তাঁরাই যদি এদিকে এসে এদের সঙ্গে মিশে যেতেন তবে বিপ্লব ত্বরান্বিত হত এবং বৃটিশকে তাড়াতে বেশি বেগ পেতেও হত না; আমি তাই ভাবছিলাম আর পথ চলছিলাম। বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশেছিলাম বলেই এই ধরণের চিন্তায় মনকে সব সময়েই চিন্তিত রাখত।

শোন্‌ডিরী পৌঁছবার পূর্বে আউরঙ্গাবাদ পর্যন্ত ভ্রমণ, আনন্দের অথবা দেখার মত কিছুই ছিল না। ধরমশালায় রাত্রি যাপন এবং সুযোগ মত অশিক্ষিত ধনী অথবা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টেক্‌স্ আদায়ের মত চাঁদা উঠিয়ে পথ চলা ছাড়া আর কিছুই করার মত ছিল না। আজ টেক্‌স্ বানান লিখতে যত কষ্ট পেতে হচ্ছে, টেক্‌স্ আদায় করতে তেমন কষ্ট পেতে হত না। বর্তমানে অনেকেই "ট্যাক্স" লিখতে আরম্ভ করেছেন, আমি কিন্তু সেরূপ লেখার পক্ষপাতী নই।

জোর-জবর করে অশিক্ষিত এবং শিক্ষিতদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় আমার দ্বারা সম্ভব হত, তার গোড়ায় ছিল তিনটি কারণ। প্রথম কারণ হল—আমার শরীরের মজবুত গঠন; দ্বিতীয় কারণ ছিল—মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া অনুপ্রেরণা; তৃতীয় কারণ ছিল—একজন জার্মান বলেছিলেন, "সব সময় মনে রাখবেন এই পৃথিবীতে যত লোক আছে তারা সবাই আপন জন এবং World is yours." এই তিনটি শক্তির উপর নির্ভর করে আমি পৃথিবী ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

গয়া যাবার সময় শেরঘাট নামক স্থানের কাছেই তুইটি নদী পার হতে হয়েছিল। নদী পার হয়েছিলাম, বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম এবং কষ্টের অন্ত ছিল না; কিন্তু গয়া শহর যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছিল একটিমাত্র আকর্ষণে।

সেখানে একজন পাণ্ডার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল ১৯১৩ সালে। তাঁর ছেলেরা আমাকে গয়ায় যেতে অনুরোধ করে-ছিলেন। পাণ্ডা বন্ধু প্রথম মহাযুদ্ধের পরই মারা গিয়েছিলেন; তাঁরই জায়গায় যাঁরা পাণ্ডা-কার্য সম্পন্ন করেছিলেন, তাঁদের নিমন্ত্রণ অবহেলা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, অথচ আমার মন তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তবুও আকর্ষণ, তবুও স্মৃতিপটে ফল্গু নদী, নদীর অপর তীরের গ্রাম, ক্রমাগত ভেসে আসছিল। গয়াতে মরলে নাকি অপর জন্মে গাধা হতে হয়! কিন্তু সে ভয় আমার মোটেই ছিল না।

আমার মন হতে ক্রমাগত অবতারবাদের অপসরণ হচ্ছিল। তার প্রথম কারণ হল বৌদ্ধধর্মকে লোপ করার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল, তার একটিমাত্র নিদর্শন লক্ষ্য করে।

গয়া এবং পাটনা জেলাতে ভ্রমণ করার সময় প্রত্যেক দিন সকালবেলা এক দল লোক দেখতে পেতাম। তারা প্রত্যেকের বাড়িতে ভিক্ষা করার সময় সারেঙ্গি বাজিয়ে গান গাইত। গায়করা বৌদ্ধধর্মের নিন্দাসূচক গান গাইত, সেই সঙ্গে শিব, পার্বতী, গণেশ, রাম-সীতা, হনুমানজী এবং অজাতশত্রুর গুণাবলী গেয়ে ভিক্ষা চাইত।

যে ভাষায় এরা গান গাইত, সে ভাষাকে ভোজপুরী অথবা গ্রাম্যভাষাও বলা যেতে পারে। গ্রাম্যভাষা মৈথিলী ভাষার অপভ্রংশ। বাস্তবিক মৈথিলী ভাষা পূর্ব-ভারতের অনেক ভাষারই মাতৃস্থানীয়। গায়করা প্রত্যেক বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

অর্ধঘণ্টাব্যাপী গান গেয়ে এক মুঠো আটা বা চাউলের বেশি পেত না। এতে মনে হয়, পূর্বকালে এরা বৌদ্ধধর্মবিরোধী ধনী অথবা রাজাদের কাছ থেকে উপযুক্ত সাহায্য পেত এবং পরবর্তীকালে এটা অভ্যাসগত ভিক্ষাবৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল। পরে ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করার সময় অবতারবাদের তাণ্ডব লীলার নিদর্শন দেখে নিজেদের এসব থেকে পৃথক করে নিয়েছিল।

গয়াতে যাবার সময় চব্বিশ মাইল পথ চলতে কি বিপত্তি হয়েছিল, তাই বলছি। ধীরে ধীরে পথ চলছিলাম, হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাতাস আসছিল বঙ্গোপসাগর থেকে, সে বাতাস সাইকেলটাকে বাঁ-দিকে অবিরত ঠেলছিল, তাতে সুবিধাই হচ্ছিল। কল্পনাও করতে পারিনি যে, বেহারে এমন অঝুম বৃষ্টি হয়!

মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। সড়কের দু'পাশের মাটি-কাটার গর্তগুলি ভরে গেল। প্রবল স্রোত বইতে আরম্ভ করল। ভাবছিলাম মাছের দেখা পাব কিন্তু কিছুরই দেখা পেলাম না। চপ্-চপ্, ভস্-ভস্ শব্দ করে সাইকেল চালাতে আরম্ভ করলাম। পাশের গ্রামগুলি দেখতে একটি বৃহদাকার স্তূপ মনে হচ্ছিল। পথে একটিও লোক ছিল না।

এদিকে মোটর-ট্রাক বেশ চলাচল করে, কিন্তু প্রত্যেকটি থামিয়ে দিয়ে ত্রিপলে ঢাকা দিয়ে ড্রাইভার ও তার সহকারীরা বসে ছিল। বৃষ্টিকে এরা মৃত্যুর মত ভয় করে অথচ আমি আরাম করে পথ চলছিলাম দেখে কেহ কেহ মন্তব্য করছিল, "বাঙ্গালী ভূতটা কেমন চলছে!"

আমি যে বাঙ্গালী, কপালে তা লেখা ছিল না। মনে হয়, এদের মতে বাঙ্গালীরাই আজেবাজে কাজ করে অথচ দুঃসাহসিক কাজেও আত্মনিয়োগ করে, সেজন্যই আমাকে বাঙ্গালী ভূত বলতে দ্বিধা করে নাই।

বিকেলে গয়াতে পৌঁছে একটি ধরমশালায় স্থান নিতে যাচ্ছি এমন সময় বেঙো হোটেলের মালিক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি দৈনিক বার আনা করে খাওয়া-থাকার জন্য নেবেন এই বলে ধরমশালা হতে তাঁর হোটেলে আমাকে নিয়ে গেলেন। 'বন্দ্যোপাধ্যায়' শব্দকে ইংরেজী ফ্যাশন্ করে "বেঙো" করা হয়েছিল।

ভাগলপুরের বাসিন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বড়ই উদার। তাঁর কাছে জাত-বিজাত ছিল না। যে কোনও ধর্মের লোক তাঁর হোটেলে থাকতে পারত। সেজন্য মুসলমানরা তাঁরই হোটেলে আসত বেশি করে। খাদ্যের উপাদান হতে সকল রকমের মাংস বাদ দেওয়া হয়েছিল।

এইভাবে সকল বিপদের গোড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আঘাত করেছিলেন। বাঙ্গালী ধরণে মাছ রান্না করে হিন্দুস্থানীদের দেওয়া হত না। তাদের জন্য পৃথক করে পেঁয়াজের এবং লঙ্কার প্রাচুর্য বজায় রেখে রান্না করা হত।

পরদিন সকালে রোদ উঠল। ডানা ঝাড়া দিয়ে সকলেই ঘর থেকে বের হল। আমি গয়ালী পাণ্ডার বাড়িতে গেলাম। যাত্রী না থাকাতে পাণ্ডা আমাকে ঘরানা মতে গ্রহণ করলেন। বেশ আরামের সঙ্গে কথা আরম্ভ হল। পাণ্ডার ছেলে উদার এবং শিক্ষিত। বিদেশের কথাই বেশি বলা-কওয়া হয়েছিল, সেই সঙ্গে আমাদের দেশের স্বাধীনতা কি করে পাওয়া যাবে, তাও আলোচনা হয়েছিল।

পাণ্ডার ভাই দুইবার জেলে গিয়েছিলেন। তৃতীয়বার জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়েছিলাম, তাঁকে বলেছিলাম, "জেলে যেয়ে নাম করা যায় কিন্তু সাধারণের

উপকার হয় না। বাইরে থাকুন এবং বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হউন।

১৯৪২ সালে আপনাদেরই স্বদেশীয় ভায়েরা—গয়ালী পাণ্ডারা যে বিপ্লব করেছিলেন, তার তুলনা কমই দেখতে পাওয়া যায়। বৃটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল, নিরক্ষর, নিরস্ত্র কৃষক কেমন বিপ্লব করতে পারে! চট্টগ্রামের বিপ্লব এক সপ্তাহ ছিল আর কৃষক-বিপ্লব যা বেহারে হয়েছিল, তা চলেছিল মাসের পর মাস!"

"বেশ ভাল কথা, এখন আমাদের চীনের বিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বলুন।" এই অনুরোধ একজন বাঙ্গালী করেছিলেন।

উত্তর দিয়েছিলাম হিন্দুস্থানীতে। সকলে শুনেছিল। যা বলেছিলাম তার প্রতিধ্বনি ১৯৪২ সালে বিছানায় শুয়ে সংবাদ-পত্রে পড়েছিলাম। গর্ব অনুভব করেছিলাম সেদিন। হাজারো প্রপাগেণ্ডিষ্ট যা করতে পারেনি, এক ঘণ্টার কাহিনীতে তাই হয়েছিল। এখানেই পর্যটক-জীবনের সার্থকতা।

বিপ্লব ব্যর্থ হলে তার প্রতিক্রিয়া হয়। সেই প্রতিক্রিয়া সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, স্বার্থপরতা এবং অন্যান্য প্রকারে দেখা দেয়। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাই তার প্রমাণ।

গয়ালী পাণ্ডা কখনও দান করেন না, দান গ্রহণ করেন। আমার এক ঘণ্টা কথা বলার জন্য একজন পাণ্ডা কুড়ি টাকা দিয়েছিলেন। অবাক হয়েছিলাম তাঁকে মুক্তহস্ত দেখে। যে পাণ্ডা দু'আনা পয়সার জন্য "সফল" প্রার্থীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখে, সেই পাণ্ডা কুড়ি টাকা ফেলে দিল আমার খোলা হ্যাটের মধ্যে! কম কথা নয়!

বিপ্লবের গন্ধও মাতোয়ালা। আনন্দ ও আত্মাহুতি একই সঙ্গে এনে দেয়। বিপ্লবী প্রতিদানপ্রার্থী হয় না, বিপ্লবীর শেষ দান আত্মাহুতি। কত লোক প্রাণ দিয়েছিল ১৯৪২ সালে, তাদের সকলের নাম-ধাম কি কেহ জানেন অথবা শুনেছেন? তাদের

কথা আমরা ভুলে গেছি কিন্তু ১৯৩৪ সালের জুন মাসের কথার প্রতিধ্বনি ১৯৪২ সালে হতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। শুনতে পেয়েছিলাম, জনৈক ভারতীয় পল্টনী অফিসার রেলের কুলিকে যেভাবে হত্যা করেছিল, সে রকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড সিপাই-বিদ্রোহের সময় বিদেশী বৃটিশরা পর্যন্ত করতে সক্ষম হয়নি।

মানসিক দৈন্যতা না থাকলে বোধহয় আমি আর কিছু হতাম। সেদিন বুদ্ধগয়া দেখে বেঙো হোটেলে ফেরবার পথে শুধু সে কথাই আমার মনে হচ্ছিল।

প্রথম কথা হল, এসব দেখে কি লাভ? অতীতের ঐশ্বর্য দেখে বিদ্রোহের টেকনিক্ আয়ত্ত করা যায় না, তবে কেন চার মাইল বাইক্ করে আবার ফিরে আসা? সেখানে থেকে সেখানকার লোককে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করা কি ভাল ছিল না? মনে হচ্ছিল, দেশ দেখার লোভ বুঝি সব রকম উচ্চ মনোবৃত্তি নষ্ট করে দেয়!

পাশেই একটা আখড়া। গুণ্ডাদের আড্ডা বলেই মনে হয়েছিল; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম, আমার ধারণা ঠিক নয়। এটা সাধু-সন্ন্যাসীদের আড্ডা। বুদ্ধগয়া হতে ফেরবার পথে বাঁ-দিকে পড়ে। একজন সাধু আমাকে বললেন, "তোমরা যাকে বুদ্ধগয়া বলছ সেটা কিন্তু তা নয়; দশজন অবতার ছিলেন, সেই দশজনের মধ্যে নবম অবতারের স্থান ছিল এটি। তোমরা যাকে বুদ্ধ বলে আত্মহারা হও, সেই লোকটা ছিল নাস্তিক, সেজন্যই ভারতে তার স্থান হয়নি। যত বেটা নাস্তিক, তারা সব পালিয়েছিল চীন দেশে। আমরাই হলাম আসল বুদ্ধের শিষ্য।"

এদের ভোগ-বিলাস দেখে বাস্তবিকই হিংসা হয়েছিল। কতকগুলি যুবক সন্ন্যাসী চিনি মিশিয়ে ছানা খাচ্ছিল। কতকগুলি বয়স্ক সন্ন্যাসী খাচ্ছিল দুধ। তাদের বিছানা, চালচলন, দৈনন্দিন কাজ কিছুটা দেখেই রাগ হয়েছিল। যে সাধু আমার সঙ্গে কথা

বলছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের মতে যে দশজন অবতার হয়েছেন, তাদের নাম কি সাধু বাবাজী!"

"তাও জান না! শোন বলছি।" বলেই আরম্ভ করলেন কাহিনী। কাহিনী বলা দশ মিনিটে শেষ হয় না দেখে বললাম, "এসব কাহিনী শুনবার সময় নাই—দশজন অবতারের নাম বললেই ভাল হয়।"

তখন তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "মৎস্য" তারপরই মৎস্য-অবতারের পুরাণ আরম্ভ হয়ে গেল। আমার আর ধৈর্য থাকল না। আমিই বললাম "মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ এই হলেন নয়জন। কল্কী আসবেন আমিও স্বীকার করি, কিন্তু মনে রাখবেন সাধু মহাশয়, যিনি এতগুলি অবতার সৃষ্টি করেছিলেন তিনি আপনাদের মত মোষের দুধ খেতেন না। আমার সময় নাই, তবু বলছি, শুনে রাখুন, এসব হল সৃষ্টিতত্ত্বের কথা। এর বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে।"

আমি যখন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন লক্ষ্য করলাম, সাধুর যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে তিনি সেখানেই আমাকে খতম করতেন। সুখের বিষয়, তা অন্তত সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এদিক দিয়ে বৃটিশের জয়গান গাইতে হবেই। তখন খুনী এবং খুন হয়েছে শুনলে যে কোন মানুষ কেঁপে উঠত এবং খুনী এবং খুন হতে দশ হাত দূরে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করত।

মানুষমাত্রেরই মানসিক দুর্বলতা থাকে। সাধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একেবারে চলে এলাম বিষ্ণুপাদপদ্মে। দেখছিলাম সেই পাথরটা, যার উপর আমিও ১৯১৩ সালে যবের পিণ্ডি চড়িয়েছিলাম পিতার মুক্তির জন্য, তারপর ১৯২৯ সালে পিণ্ড দিয়েছিলাম আমার ভাইপোর মুক্তির জন্য—সেই পাথর আর সেই ঘণ্টা, যে ঘণ্টাতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার নাম খোদা রয়েছে।

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বেশ আরাম পেয়েছিলাম, তারপর বেঙ্গো হোটেলে এসে আর এক বিপদের সম্মুখীন হতে হল।

কোথা থেকে এক বকাটে যুবক গত কয়েকদিন ধরে বেঙ্গো হোটেলে স্থান নিয়েছিল। প্রথম কয়েকদিন দৈনিক খরচ দিয়ে যাচ্ছিল, গত দুই দিন কিছুই দেয়নি। বেঙ্গো হোটেলের বানাজি মহাশয় হোটেল-মেম্বারদের হাতেই এর বিচারের ভার ছেড়ে দেন।

আমিও একজন সভ্য। আমার ফিরে আসার জন্য সকলেই অপেক্ষা করছিল। আসামাত্রই আর্জি পেশ্ হয়ে গেল। আমি বললাম, "যতদিন এখানে থাকব, ততদিন এই বকাটে যুবকেরও খরচ জুগিয়ে যাব।"

আগুনে বর্ষণ হওয়ায় আগুন নিভে গেল। দেখলাম যুবকের মানসিক পরিবর্তন। সে কিছুই বললে না, এমন কি আমাকে ধন্যবাদও দিল না। যুবক খায় ডাল রুটি আর সব্জী। দু'বেলায় বার আনার বেশি লাগত না, তবে সে পান খেত। প্রত্যেকটা পানের দাম এক আনা। দৈনিক কুড়িটা পান খেত।

হিসাব না করেই তার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললাম, "বন্ধু, কিছু মনে করো না, এই টাকা আমার উপার্জিত নয়, ভিক্ষালব্ধ। দরিদ্রই দরিদ্রের দুঃখ অনুভব করে, তোমার কষ্ট আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।" এর পরে আর কথা হল না।

বেলা তখন তিনটা, 'লু' হাওয়া বইছিল। ফল্গু নদীর অপর তীরে একটি মস্জিদ দেখব মনে করে পায়ে হেঁটে চললাম। ভয়ানক গরম, তার উপর নদীর বালি উত্তপ্ত। যখনই তৃষ্ণা পাচ্ছিল তখনই বালি সরিয়ে জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করছিলাম, আর মনে মনে ফল্গু নদীকে প্রণতি জানিয়ে বলেছিলাম, "বেহারের মহিমা তুমি। এদেশের মানুষ মুখে বড়ই রুক্ষ কিন্তু তাদের অন্তরে ফল্গু বয়ে যায়। অন্তর তাদের শুষ্ক নয়, একেবারে ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা!"

মস্‌জিদের কোনও বিশেষত্ব ছিল না, বিশেষত্ব ছিল স্থানীয় লোকের ভাষায়। বেহারী মুসলমান মাত্রেই পূর্বে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, এই তথ্য বের করতে সময়ের দরকার হয় না। এদের কথ্য ভাষা একেবারে না হউক মগধী ভাষার অতি কাছাকাছি। হিন্দী অথবা উর্হ্ ভাষার প্রভাব অতি অল্পই স্পর্শ করতে পেরেছে। এদের কথা শুনবার জন্যই এত কষ্ট করেছি জেনে একজন ইমাম্ শ্রেণীর লোক বললে, "বাবু, আমরা উর্হ্ বলি, উহ্ই আমাদের মাতৃভাষা।"

পর্যটক যদি মিথ্যা বলে, তা হলে সে পর্যটক হতে পারে না। স্পষ্ট করে বললাম, "এটা তোমাদের হিন্দু-বিদ্বেষ হতে বলছ। তোমাদের উপর অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে তবুও মাতৃভাষা এখনও পরিত্যাগ করতে পারনি, এবং শত চেষ্টাতেও মাতৃভাষা পরিত্যাগ করতে পারবে না।"

এই অঞ্চলে তখন মুসলিম লীগের প্রভাব খুবই ছিল। সকলেই চেষ্টা করতে চাইছিল যাতে রাতারাতি ভিন্ন জাতে পরিণত হতে পারে। এটাও হিন্দু-বিদ্বেষের পরিণাম। আমার মনে আছে, সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ স্টেশনে জলের জন্য কি বিপদে পড়েছিলাম! হাতে মগ্ দেখে "হিন্দু পানি" জল দেয়নি; তারপর গিয়েছিলাম "মুসলমান পানি"র কাছে। "মুসলমান পানি" জিজ্ঞাসা করেছিল আমি হিন্দু কি মুসলমান। যখন শুনল আমি হিন্দু তখন সেও জল না দেওয়ায় অবশেষে যেতে হয়েছিল জলের কলে। জলের কল জল ছেড়ে দিয়েছিল, সে জিজ্ঞাসা করেনি আমি হিন্দু কি মুসলমান। তাই জল খেয়ে প্রাণ বাঁচে! তখনই বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের দেশের অবতারবাদ মানুষের সঙ্গে কতটুকু শত্রুতা করছে!

পূর্বোক্ত যুবক নিরাপদে দিন কাটাচ্ছিল। তার অর্থের অভাব ছিল না। দুইদিন চলে যাওয়ার পর তৃতীয় দিন দুপুরে

একজন লোক এল এবং যুবককে বাড়িতে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করল।

যুবক কি বলেছিল জানি না। যে লোকটি যুবককে নিতে এসেছিল, সে মাটিতে মাথা রেখে আমাকে প্রণাম করল এবং আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বলল, "আপনার কাছ থেকে আমাদের বাবু এই টাকা কর্জ করেছিলেন, তাই ফেরত দিচ্ছি।"

লোকটাকে কিছু না বলে পাঁচ টাকার নোটখানা হাতে নিয়ে বাকি টাকা ফেরত দিয়ে একটুও বিলম্ব না করে হোটেলের পাওনা পরিশোধ করে ভারত-সেবাশ্রমে চলে গেলাম। ধনীর ধন দেখে ভয় হয়েছিল। পর্যটকের পক্ষে লোভ এড়ানো সবচেয়ে বড় উপাসনা। বিদায়ের সময় যুবকের সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছা হয়নি, সে পান কিনতে গিয়েছিল।

বৈষ্ণব মঠের বাবাজীরাও এক গোছের বিপ্লবী। গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে যারা পিণ্ড দান করতে এসে 'সফলে'র জন্য গয়ালী পাণ্ডার পায়ে ধরে বসে থাকে অথচ গয়ালী পাণ্ডা আরও টাকা আদায় করার জন্য মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে, সেই পাণ্ডাদের সায়েস্তা করার জন্য বৈষ্ণব মঠের সাধুরা রোজ রোজ 'প্রিচ্' করেন এবং বলেন, 'শুধু পিণ্ডদানেই পূর্বপুরুষের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।'

রাত্রি দশটা পর্যন্ত গয়ালী পাণ্ডাদের পিণ্ডি চট্‌কানোর পর বৈষ্ণব মঠের সাধুরা আমাকে ঘুমোতে দিলেন। ঘুমোবার পূর্বে বলে রাখলাম, "রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই চলে যাব; অতএব ঘটিবাটি চুরি করে পালিয়েছি অপবাদ দেবেন না। যদি অপবাদ দেন তবে আপনাদেরই বদনাম হবে। আমি বাঙ্গালী, আপনারাও বাঙ্গালী এ কথাটা মনে রাখবেন।"

তখনকার দিনে পশ্চিমের বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীকে ঘরে স্থান দিত না। বলত, "সুবে বাংলার লোক চোর হয়, দিনে খায়দায় থাকে, রাত্রে যা পায় তাই নিয়ে পালায়।"

আসল কথা হচ্ছে অন্য কিছু, যাকে বলা হয় পুলিশের ঠেলা। বাঙ্গালীর বাড়ীতে নূতন বাঙ্গালী গেলেই পুলিশ আসত। একবার তুইবার পুলিশ এলে কষ্টও হয় না, তুঃখও হয় তা, এ যেন দশ ধারার আসামী! মাসের পর মাস আসবেই। এতেও কিছু আসে-যায় না। খইনি দেওয়া চাই, তারপর যদি বাবু-সাহেব অথবা খান-সাহেবের মুখ থেকে 'হে শালা বাঙ্গালী' উচ্চারিত হবার পর সেই কথাকে মধুর বচনরূপে গ্রহণ না করা হয় তবে ত একেবারে 'দপ্তরে খাস' পাটনা হতে হুকুম এসে যায় গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানা নিয়ে!

বৈষ্ণব মঠের সাধুরা আমার ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত না হয়ে, মুখ না খুলে শুধু ঠোঁটের সাহায্যে হেসে বলেছিলেন, "আমাদের কিছু চুরি যায় না, আমরা ঘুম থেকে উঠি সকলের আগে।"

বাস্তবিকই তাই, রাতের অন্ধকার তখনও ছিল। সবেমাত্র সাইকেলটা বাইরে এনেছি এমনি সময় এক যুবক সাধু আমার হাতে কয়েকখানা রুটি এবং একটি গয়ালী পেড়া দিয়ে বললেন, "আশীর্বাদ করি।"

আশীর্বাদের খাদ্য গ্রহণ করলাম এবং সাইকেল-বাক্সে রেখে দিয়ে বললাম, "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।"

বাস্তবিক এঁরা অত্যধিক পরিশ্রম করেন। চাঁদার খাতে হাতে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা মানুষের বাড়ী বাড়ী যাওয়া কি কম কষ্ট?

পাটনার পথে বেরিয়েই এক নূতন দৃশ্য দেখতে পেলাম। একদল লোক চলছে লোটা নিয়ে। বড় রাস্তার কাছে নদী নাই, এরা স্নান করবে কোথায়?

এরা কি করে না-করে, দেখবার মত সময় ছিল না। প্রবল ইচ্ছা, সেদিনই যেন পাটনায় পৌঁছি! ইচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব হয়, ফাঁড়ি-পথে পাটনায় পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়েছিল। পথে গ্রামের লোকের আর্থিক এবং নৈতিক তুরবস্থা দেখে খুবই তুঃখ হয়েছিল।

পাটনায় পৌঁছে পিণ্টো হোটেলের সামনে সাইকেল রেখে সাহেবী হোটেলে চা খেতে ঢুকেছিলাম। এ একটা কম কথা নয়, মস্ত বড় কথা। এখানে আসতেন যত বড় বড় লোক অর্থাৎ রায় বাহাদুর ও তাদেরও upwards লোক। দারোগাবাবুর মত আমাকে দেখাত। বোধহয় সেই কারণেই একটি লোক এসেই বললে, "হুকুম হুজুর!"

ইজ্জত রাখতে হবে, বললাম, "চা আউর কেইরাস্ লাগাও।"

এটা হল সাহেবী হিন্দুস্থানী। সাহেবরা প্যাণ্ট 'লাগায়'। আউর 'লাগায়' খাকী শার্ট। আমারও তাই ছিল, আরও একটা জিনিস ছিল যাকে বলা হয় 'রুপেয়া'। চা খেয়ে একটা মহারাণী-মার্কা টাকা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আসবার সময় মোগল অথবা পাঠান সম্রাটদের পোশাকে আবৃত একটা লোক ইয়া লম্বা 'সেলাম হুজুর' বলায় বুকের ছাতি যেন ছয় হাত চওড়া হয়ে গেল! বেঁচে থাক্ আমার হাফ্‌প্যাণ্ট আর খাকী শার্ট!

বাইরে এসেই দেখতে পেলাম, একদল লোক আমার সাইকেলটা হাঁ করে দেখছে। কে সাইকেলটা চালাচ্ছে তার খবর নেবার কারো উৎসাহ নেই। সাইকেলটা যখন নিয়ে যাচ্ছি তখন একজন জিজ্ঞাসা করল, "What make cycle?"

বাংলায় বললাম, "আমার বাবার।"

একটু এগিয়ে যাবার পর পেছন থেকে একজন যুবক আমাকে ডাকলে। সাইকেল হতে নামলাম। যুবক জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"আরে ভাই, কোথায় আর যাব? দেখি যদি কোনও ধরমশালায় যেতে পারি।"

যুবক বললে, তার নাম মণীন্দ্র সমাদ্দার, এখানের বাসিন্দা, যদি ইচ্ছা করি তবে একটি বাঙ্গালী হোটেলে নিয়ে যেতে পারে।

"ধন্যবাদ দাদা, নিয়ে চলুন, ভয়ের কারণ নাই; অন্তত সপ্তাহ-খানেক খরচ চালাতে পারব। হোটেলে গিয়ে শুনলাম, হোটেলের নাম 'হোটেলে বাঙ্গালী।'

নামটা একেবারে পার্শী, ব্যাকরণে ভুল নাই। দৈনিক বারো আনা চার্জ। হোটেল যেমন তেমন কিন্তু মণী সমাদ্দারের ব্যবহার দেখে আনন্দ হয়েছিল। তিনি আমাকে টাকা দেননি, কথার মধ্যেও তেমন কিছু ছিল না; কিন্তু এই যে হোটেল দেখিয়ে দেওয়া, তাতে কত আন্তরিকতা, কত মমতা, সকলে বুঝবে না; যাঁরা পূর্বদেশ ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা বুঝবেন। মণী সমাদ্দার যদি বলতেন, "চলুন আমার বাড়ী" তবে আজ আমার ডায়েরীতে তাঁর নাম উঠত না।

সারাদিন অত্যধিক পরিশ্রম করায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠেই গেলাম গঙ্গা দর্শনে। অগণিত লোক পাপক্ষয়ার্থ মা ভাগীরথীর জলে "সীয়ারাম, জয় সীয়ারাম, রাধেশ্যাম" ইত্যাদি নামোচ্চারণ করে কানে আঙুল ঢুকিয়ে ডুব দিচ্ছিল। শ্রীরামচন্দ্র সরযূর জলে ঝাঁপ দিয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। তিনি বোধহয় সাঁতার জানতেন না কিন্তু এঁরা সবাই সাঁতারে সক্ষম এবং চতুর। শুধু কতকগুলি নারী ইয়া মোটা রূপার তাগা, বলাখ, বালা, হাতে এবং পায়ে খারু দিয়ে যখন নামতেন তখন মনে হত, মা গঙ্গা বোধহয় এদের সবাইকে নিজের কোলে টেনে নিবেন! সুখের বিষয়, সেদিন কেউ ডুবে মরেননি।

কতকগুলি কথা স্মরণ করে নারী-জাতের প্রতি শ্রদ্ধা যা ছিল তার শতগুণ বৃদ্ধি হয়েছিল যদি বলি তবে কম হবে, কোটি গুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে মনে হয়েছিল তাঁদের স্বাধীনতার কথা।

দ্বিপ্রহরে আবার এলেন সেই মণী সমাদ্দার। হাসিমুখে বললেন, "আসুন বি. এম্. কলেজে যাবেন, সেখানে কিছু বলবেন, সকলে শুনবে।"

আমি তো অবাক! একেই বলে ভদ্রলোকের অতিথি হওয়া।

গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ সেন মহাশয়, ষোড়শী হালদার মহাশয় এবং আরও অন্যান্য ভদ্রলোক আমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন। এতটুকু সম্মান আমার সহ্য করার ক্ষমতা তখনও হয়নি। মনটাকে সবল করে একদিকে বসে পড়লাম। আরম্ভ হল প্রশংসা। ভাষার ফোয়ারা! আমি অবাক হলাম। তারপর আমার পালা। বলতে আরম্ভ করলাম তো শেষ হয় না, অবশেষে মুখটা যখন শুকিয়ে গেল তখন বসে পড়লাম।

বিপ্লবীদের কথা মোটেই বললাম না। বিপ্লবী ভারতীয় হউক, রুষ হউক, বা চীনা হউক, সকলের মনোবৃত্তি একই রকমের। Disrupter (ভণ্ডুল) শ্রেণীর লোক তখন এশিয়া মহাদেশে (Excluding Russia) জন্মগ্রহণ করেনি, তখন ছিল স্পাই। স্পাই রাখত বৃটিশ এবং ফরাসী। আমেরিকা এবং বৃটেন তখন ল্যাটিন আমেরিকাতে Disrupter সৃষ্টি করছিল এবং প্রেমসে কার্যসিদ্ধি করে যাচ্ছিল। বৃটিশও ল্যাটিন আমেরিকাতে আমেরিকানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছিল, তাতে আমাদের বেশ লাভ হচ্ছিল। আমেরিকান মাত্রেই ভারতের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিল। এই ধরণের উচ্চ রাজনীতি (তখনকার দিনের পক্ষে) একটুও না বলে মামুলী কথায় সকলকে সন্তুষ্ট করতে হচ্ছিল। ভয়ও ছিল, কি জানি যদি পাসপোর্ট বাতিল হয়ে যায়! কে যাবে বিদেশী সংবাদ ঘরে এবং ঘাড়ে চাপাতে?

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বাঙ্গালী চাকুরী করেন। কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। একজন ভদ্রলোক একেবারে একটানায় কথা বললেন, "আমরা হলাম জার্মানীর প্রাশিয়ান, অর্থাৎ শাসকের সমাজ।"

কয়েকদিন পূর্বেও পথের পাশে এক বাঙ্গালী পরিবার দেখে

এসেছিলাম। উপাধিতে ঘোষ। আত্মরক্ষার্থ নিজের হাতে কাপড় বেচে দিনান্তের চাউল সংগ্রহ করেন। তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম কিন্তু বাঙ্গালী কেরাণীবাবুদের বেয়াদবি সহ্য করতে না পেরে উত্তরে যা বলেছিলাম, মণীবাবু স্বকর্ণে তা শুনেছিলেন। ক্ষুদিরাম আর মীরজাফর উভয়েই বাঙ্গালী কিন্তু পার্থক্য অনেক।

দুঃখের সহিত বলছি কলিকাতায় বৃটিশরা রাজধানী করাতে আমাদের জাতের একদিকে যেমন উন্নতি হয়েছিল তেমনি অবনতি ঘটেছিল অনেক। চাকুরিয়া মহলে আত্মম্ভরিতা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিল। যে যা নয়, সে তারই মিথ্যা কল্পনা করে আত্মপ্রশংসা করত। এর পরিণাম বর্তমানে আমরা কিছুটা অনুভব করছি, ভবিষ্যতে তারই খেসারৎ আরও দিতে হবে।

প্রাশিয়ানদের এলাকা পরিত্যাগ করার জন্য প্রাণটাই আইঢাই করছিল, শুধু মণীবাবু আমাকে পাটনাতে থাকতে বাধ্য করেছিলেন; কারণ, তাঁরই অনুকম্পায় অনেক ঐতিহাসিক স্থান ও তথ্য অবগত হয়ে আমি মনকে তৃপ্ত করেছিলাম। কয়েক মাস পূর্বে উত্তর বিহারে ভূমিকম্প হয়েছিল, তাতে পণ্ডিত জওহরলাল কোদাল কাঁধে নিয়ে যখন পথ চলছিলেন তখন একজন বৃটিশ স্পাই তাঁর হাতে একটি পিস্তল দিয়ে বলেছিল, "এর দ্বারা অনেক কাজ করতে পারবেন।" সেখানেও তিনি লেকচারই দিয়েছিলেন, মঞ্চ হতে নেমে পিস্তলদাতার সন্ধান পাননি, অবশ্য তিনি পিস্তল গ্রহণও করেননি।

কে এই দুষ্কর্ম করেছিল, কেন করেছিল, এই নিয়ে মণীবাবু আমাকে অনেক তথ্য জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ইউরোপে যেয়ে যেন ভারতীয়দের মধ্যে নকল ও আসল বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করি। বৃটিশ পলিসি-অনুযায়ী একজন আসল বিপ্লবীর পেছনে দশজন নকল বিপ্লবী (যারা স্পাইএর

কাজ করত) লাগিয়ে দিয়ে বৃটিশ সরকার সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি ; কারণ, নকল বিপ্লবীদেরও বৃটিশের বিরুদ্ধেই কথা বলতে হত। তাতে বিদেশের লোক আমাদের দুরবস্থার কথাই বেশি করে অনুভব করত। বার্লিনে যেয়ে শুনেছি, অনেক নকল বিপ্লবী পি. এইচ. ডি. নামক সাধারণ ডিগ্রী আয়ত্ত করেছিল অথচ তারা জার্মান ভাষাও ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেনি।

মণীবাবু পাটনার লোক। তাঁর সংবাদ সংগ্রহ করার আগ্রহ দেখে বলেছিলাম, কলেজ ছেড়ে দিয়ে তাঁর পক্ষে সাংবাদিক হওয়াই ভাল। মণীবাবু পরে সাংবাদিক হয়েছিলেন।

পাটনা হতে পুনরায় গয়াতে ফিরে আসবার পথে দেখলাম, একটি লোক আমার পেছনে চলেছে। লোকটি জার্মান দেশের 'প্রাশিয়ান।' সাবাস ভাই! প্রাশিয়ানরা কখনও পেছনে চলে না আগে চলা তাদের অভ্যাস। কি আর করি, একটু অপেক্ষা করে লোকটাকে ডাকলাম।

সে এল এবং নমস্কার করল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার সঙ্গ নেবার কারণ কি?"

সে দম্ভের সহিত বলল, "Order is order and that must be carried out."

সাবাস রাজভক্তি! প্রাশিয়ানরা রাজভক্ত হয় না। অবশ্য কথাটা একে বলিনি। মনের কথা মনেই ছিল, আমি শুধু রামপ্রসাদের একটা গানের শেষ পদ গাইতেছিলাম, "দিবি পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা, তবু মা বলে আর কোলে যাব না।" রামপ্রসাদী সুর বিদেশ থেকে আসেনি, এসেছিল রামপ্রসাদের গলা হতে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী করে রাখতে।

কেন গান গাইছিলাম এখন আর সে কথা মনে নাই।

গয়া এবং পাটনা দেখা হয়েছে, এবার দেখতে হবে কাশীধাম। লোকে বলে কাশীধাম, তাই আমিও বলছি।

কাশীধামের পথে

কাশীধামে অনেকবার গিয়েছিলাম, এবার বোধহয় পঞ্চমবার। অন্যান্য সময় রেলগাড়িতে চেপে গিয়েছি, এবার বাইসাইকেলে। অন্যান্য সময় কাশীতে পুণ্য অর্জনের জন্য গিয়েছি, এবার জ্ঞান অর্জনের জন্য ; অতএব লক্ষ্য বস্তুর পার্থক্য আকাশ এবং পাতাল।

গয়া হতে রওয়ানা হয়ে কয়েকদিন গ্রামে এবং ছোট ছোট শহরে অবস্থান করে এমন কিছু দেখতে পাইনি যার উল্লেখ করা যেতে পারে ; কিন্তু ছুৎমার্গের প্রখরতা এবং তারই ফলে সাধারণ মানুষের মানসিক অবনতি দেখতে হয়েছিল। বিদেশীর পক্ষে অথবা যাঁরা বিদেশে কয়েক বৎসর কাটিয়ে এসেছেন তাঁদের পক্ষেও এই বর্বরতা অসহনীয়। জল চাইলে জল দেবে বটে কিন্তু তখন আর জল-পিপাসা থাকে না।

চলার পথে একদিন জল ফুরিয়ে গেল। পথের পাশে একটি কূয়া হতে কতকগুলি স্ত্রীলোক জল ওঠাচ্ছিল, একটু দূরে একজন হিন্দুস্থানী মুসলমান খাটিয়ার উপরে বসে হুঁকো টানছিলেন আর মাঝে মাঝে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। আশে-পাশে পুরুষ লোক না দেখে তাঁরই পাশে জল চাইলাম।

লোকটি বড়ই ভদ্র। তিনি বললেন, "আমার কাছ থেকে জল পেতে হলে ঘরে যেতে হবে। এদের কাছে জল চেয়ে দেখুন ; কিছু মনে করবেন না, আমি এদেরই গ্রামবাসী।"

একজন স্ত্রীলোকের কাছে জল চাইতেই স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুম্ কোন্ হো ?"

আমি বললাম, "বাঙ্গালী হায়।"

স্ত্রীলোকটি একটু চিন্তা করে বললেন, "নজদিক নেহি, হটকে খাড়া রও।"

তাই করলাম। কতক্ষণ পর এক কলস জল এনে মহিলা বললেন, "পানি লাও।" আমি আমার কেতলী এগিয়ে দিলাম।

কেতলী জলে ভর্তি হবার পর কেতলীটা মাটিতে পড়ে যেয়ে কিছুটা জল ছিটকে মহিলার পায়ে পড়ে। অমনি মহিলা চিৎকার করে উঠে নিকটস্থ মুসলিম হিন্দুস্থানীকে ডেকে বললেন, "ভাইয়া ও ভাইয়া, বাঙ্গালীকা পানি গোড়্ লাগ গিয়া, জাত চলা গিয়া।"

মুসলিম ভদ্র লোকটি তাঁদের ভাষায় স্ত্রীলোককে বললেন, "কিছু হয়নি, লোকটা হিন্দু, তুমি পা ধুয়ে ফেল আর কলসীর জল কূয়ার কাছে ফেলো না।"

কতটুকু ঘৃণা হলে যে মানুষের মনে এরূপ প্রবৃত্তি জাগতে পারে, সে ধারণা করাও কঠিন ব্যাপার। এই রকম ব্যবহার দক্ষিণ আফ্রিকাতে অথবা আমেরিকার দক্ষিণের ষ্টেট্‌গুলিতে আমেরিকানরা নিগ্রোদের সঙ্গেও করে না।

তারপর বেলা দুটোর সময় যখন মোগলসরাই-এ পৌঁছলাম, তখন ইচ্ছা হল একটু বিশ্রাম করি। নিকটেই একটি জৈন ধরমশালায় যাওয়ামাত্র একজন দ্বারওয়ান বলল, "আসুন বাবুজী, বিশ্রাম করুন।" তারপর একখানা চারপাই দেখিয়ে দিয়ে বললে, "এটাতে বসে বিশ্রাম করুন।"

চারপাই-এর উপর বসলাম। আমার পরনে হাফ্‌প্যাণ্ট এবং নীচে আণ্ডারওয়ারও ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কতকগুলি ছারপোকা আমার শরীর বেয়ে উঠে ঘাড়ে কামড়াতে আরম্ভ করে। আমি তৎক্ষণাৎ ছারপোকাগুলি মেরে ফেললাম। তাই দেখে দ্বারওয়ান চিৎকার করে উঠল। চিৎকারের রকম দেখে আমি ভীত হলাম। নিশ্চয়ই দ্বারওয়ানের ছেলে মরেছে, নয়ত তার স্ত্রী অথবা মা গঙ্গায় ডুবেছে! কিন্তু তা নয়। ছারপোকা মেরে ফেলেছি দেখে তার এই ভয়ানক চিৎকার!

কি জানি কেন, আমার মন খুবই শান্ত ছিল। ধীরে-সুস্থিরে

জিজ্ঞাসা করলাম, "এই যে চারপাইগুলি রয়েছে, তার কি প্রত্যেকটাই ছারপোকায় ভর্তি ?"

সে বললে, "তুম খুব ধীরে বাত করতা হায়, বাকি তুম্ শালা বড় বদমাস্। তুম্ জীবহত্যা কিয়া।"

আর সহ্য করতে না পেরে লোকটাকে একটা চড় লাগিয়ে দিয়ে যে চারপাইটাতে বসে ছিলাম, তাতে আগুন লাগিয়ে দিলাম। চারপাইটার রশিগুলি বেশ করে জ্বলতে আরম্ভ করল। সুখের বিষয়, পাশের লোক কেউ দ্বারওয়ানকে সাহায্য করতে আসেনি। সকলেরই ধারণা, আমি দারোগা সাহেব; কারণ, আমার পরনে খাকী প্যাণ্ট আর খাকী শার্ট।

ধরমশালা হতে বেরোবার সময় মনে মনে বলেছিলাম, "খাকী শার্ট ও প্যাণ্ট জিন্দাবাদ!"

বৃটিশ সরকার এই ধরণের কুসংস্কারীদের আগাগোড়া প্রশ্রয় দিয়ে আসছিল। এখন বৃটিশ সরকারকে সেজন্য দোষ দিয়ে লাভ নাই। নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য আমরা যেমন নানারকমের উপায় উদ্ভাবন করি, বৃটিশ সরকারও নিজের রাজ্য বজায় রাখার জন্য সেরূপ উপায় অবলম্বন করেছিল। কিন্তু সকল দোষের গোড়ায় আমরা। আমরা কেন অবতারদের কথায় আত্মবিক্রয় করেছি? অনেকে বলবেন, অবতারগণ সেরূপ কিছু বলে যাননি। আমি বলব, অবতারদের ভাল কথা যদি সমাজদ্রোহী কাজে পরিণত হয় তবে অবতারবাদ পরিত্যাগ করাই ভাল।

ধরমশালা পরিত্যাগ করে নয় মাইল কি একটু কম পথ চলে নৌকাযোগে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে রওয়ানা হলাম। নদীর বাঁয়ে প্রকাণ্ড শস্যক্ষেত্র এবং দূরে রামনগর। ডাইনে মহানগরী বারাণসী।

বারাণসীকে মহানগরী বলার কারণ আছে। পরে সে-কথা বলা হবে। নৌকায় একটি লোক বসেছিল, সে হল চৌধুরী, ধর্মে মুসলমান। এ ছাড়া আর সবগুলি মাঝি হিন্দু। চৌধুরী এবং অন্যান্য মাঝির আকৃতি ও গঠন প্রায়ই একই রকমের। এখানে ইসলাম অথবা হিন্দুধর্ম প্রকৃতির উপর আঘাত করতে সক্ষম হয়নি।

নদী হতে মহানগরী বারাণসীর দৃশ্য অতীব সুন্দর। হাড্‌সন্ নদী হতে নিউইয়র্ক নগর দেখতে যেমন দেখায়, তার চেয়েও বেশী সুন্দর। ভারতের যেখানে যত শহর আছে, তাদের মধ্যে বারাণসীর দৃশ্য নদীতীর হতে সর্বোৎকৃষ্ট।

নৌকা ধীরে চলছিল। কতক্ষণ আসার পরই মৃতদেহ দাহ হতে দেখে মুখ ফিরাতে হল। এমন সুন্দর দৃশ্যের পাশেই শব পোড়ানো কোনো মতেই সমীচীন নহে। যদিও এতে সামাজিক নিয়ম-কানুনে আঘাত করে তবুও পুরাতনে আকৃষ্ট থেকে মণিকর্ণিকার পূর্বস্মৃতি রক্ষা করা যায় না বরং পুরাতন স্মৃতির প্রতি অশোভন আচরণ করা হয়।

দেখতে দেখতে দশাশ্বমেধ ঘাটে নামলাম, আরও অনেক যাত্রী নামল। পাণ্ডারা যাত্রীদের ঘিরে দাঁড়াল না। কেউ আমাদের নিতে এলো না, আমরা স্ব-স্ব পথ ধরলাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরেই একটি বাঙ্গালী হোটেল দেখতে পেয়ে সেখানেই উঠলাম। দৈনিক পাঁচসিকা থাকা-খাওয়ার চার্জ। দুই ঘণ্টার মধ্যেই বুঝতে পারলাম, এখানে গোয়েন্দারা কিলবিল করছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই দেখলাম একটি ডাক্তারখানা হতে কতকগুলি যুবক ঔষধ নিয়ে পালাচ্ছে; অবশেষে ডাক্তারকে পাকড়াও করে কতকগুলি পুলিশকে কোতোয়ালীতে চলে যেতেও দেখলাম। যা

কালী এবং গীতার উপাসকদের এলোমেলো করে পালাতে দেখে হাসি পেয়েছিল। বৃটিশ সরকারও হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়েই আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলছিল।

বৃটিশ যদি বুঝতে পারত এই হাসি এবং তামাসার কুফল একদিন ফলবে তবে বোধহয় এমন কিছু করত না। এটা হল আমার ধারণা ; কিন্তু বৃটিশ যা করবে, তা ঠিক হয়েছিল ১৯১৯ সালেই। লণ্ডনে যাবার পর মিঃ সকলতওয়ালা আমাকে ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বলেছিলেন।

রাত কাটিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীর উদ্দেশে চলেছি ভূতনাথের দিকে। পথে দেখা হল এক পাদ্রীর সঙ্গে। পাদ্রী গীর্জার কাছে আমাকে নিয়ে আমার নিজের ভাষায় বললেন, "টুমি দেখো আমার গীর্জায় ইট লাগাতে পানি দিয়েছি, তোমার মন্দিরে লৌ দিয়েছি।"

পাদ্রী মহাশয়কে ইংরেজীতেই কথা বলতে অনুরোধ করলাম এবং যা বলেছেন তা ব্যাখ্যা করে বলতে বললাম। পাদ্রী বললেন, "মন্দিরগুলি যারা তৈরী করেছিল তারা মজুরী পায়নি, গীর্জা তৈরী হবার সময় প্রত্যেকটি মৈজুর মজুরী পেয়েছিল।"

আমি একটু হেসে বললাম, "এটা জড়বাদীর দেশ নয় পাদ্রী সাহেব, এটা মরবাদীর দেশ। বেগার খাটানো পূর্বে প্রচলন ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। তোমরা রাজাকে সম্মান দাও আর আমরা রাজাকে ঈশ্বর মনে করি। আজই নরেশনাথের দর্শনার্থ ব্যাসকাশী যাব মনে করেছি। আপনার আর কিছু বলবার আছে ?"

পাদ্রী বললেন, "কংগ্রেসী সংবাদপত্র আফিসে যাবে টুমি আর বলবে এটা মরবাদীর দেশ !"

"বহুত আচ্ছা সাহেব, এখন নমস্কার—বিদায় !"

নিকটস্থ আত্মীয়দের বাড়ী হয়ে গুটিকয়েক সংবাদপত্র-আফিসে

যাওয়া ঠিক করে কয়েকখানা হিন্দী দৈনিকের আফিসে যেয়ে দেখলাম, সবাই গত রাত্রের ডাক্তার গ্রেপ্তারের কথাই বলা-কওয়া করছেন। তারপরই গেলাম একমাত্র বাঙ্গালী পত্রিকা, অবশ্য মাসিক, "উত্তরা" আফিসে।

সেখানেও একই কথা। তবুও স্থরেশ চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে লেখা দিতে বললেন। প্রতিজ্ঞা করলাম, লেখা দেব; কিন্তু লেখা দেবার কথা ভুলে যেতে হয়েছিল যদি বলি, তবে তা হবে মিথ্যা কথা। এরূপ করে কত লোকের সঙ্গে প্রতারণা করেছি তার ইয়ত্তা নাই।

তবুও স্থরেশ চক্রবর্তী মহাশয় বাঙ্গালী, তাঁর কথা চিন্তা না করলেও চলবে; কিন্তু বিদেশীদেরও আমি প্রতারণা করেছি। সেজন্য অনেকটা দায়ী আমি নই, দায়ী একটি সংবাদপত্র-আফিস। সেই আফিসে আমার পত্র আসত এবং আমার প্রিয় বন্ধুগণ তাই ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আনন্দ করতেন। একটা জাতির কতখানি অবনতি হলে এরূপ করা সম্ভব, তা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার নিগ্রো অনেক অপকর্ম করে কিন্তু এরূপ নিম্নস্তরের অপকর্ম কেউ করে না।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় আমেরিকা হতে একখানা পত্র পেয়ে জানতে পেরেছিলাম, আমার নামে আমেরিকান ভদ্রলোক অন্তত দশখানা পত্র দিয়েছিলেন। অবশেষে যুদ্ধের সময় আমেরিকার ইনটেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের Lalo (লালো) আমার ঘরে এসে সকল কথা শুনে যখন বন্ধুকে আমার সংবাদ দিল তখন তিনি এই নিয়ে এক প্রবন্ধ লেখেন এবং আমাকে সে কথা জানিয়ে দেন। হায়রে আমার দেশ আর জাত!

লণ্ডনে দেখেছি অনেকে অন্যের ঠিকানায় পত্র পেয়ে থাকে, তাদের পত্র একখানাও হারায় না অথবা যাঁর ঠিকানায় পত্র আসে তিনি সেই পত্রগুলি খুলে দেখেন না। আমাদের দেশে কিন্তু

উল্টো গতি! অপরের পত্র পড়তে পারলে যেন কত আনন্দ, যেন থট-রিডিংএর এক পর্যায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল!

সংবাদপত্র-আফিস পরিক্রমা করার পর সেদিনই বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণার বাড়ী দেখে একটি নর্দমার শেষ সীমা দেখার জন্য হরিশ্চন্দ্র ঘাটের দিকে রওয়ানা হই।

অনেকেই বলবেন, মন্দির দেখার পর নর্দমা দেখার তাগিদ হল কেন? শুনেছিলাম আর্যদের আসার বহুপূর্বে দ্রাবিড়রা যখন শহর গড়ত তখন মেথর-সিস্টেম ছিল না, আদিদেব মহাদেবের রাজধানীতেই সর্বপ্রথম দ্রাবিড় জাত ড্রেন-সিস্টেম প্রচলন করেছিল। সেই সিস্টেম কাশীধামে আজও বর্তমান। শ্বেতকায়রা অর্থাৎ আর্যরা যখন বনে-জঙ্গলে শব্দসৃষ্টির কাজে ব্যস্ত ছিল ও চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতিকে মাথা নত করে প্রণাম করত তখন দ্রাবিড় জাত শহর গঠন করেছিল, সমাজে বাস করত এবং শহরে নর্দমাও গড়েছিল।

পূর্বে ভারত-ভ্রমণেই লিখেছি, মানুষের মধ্যে দুইটি অনুভূতি প্রথম জাগে। একটি হল লিঙ্গ-উপাসনা অন্যটি হল যোনি-উপাসনা। কাশীধামেই সর্বপ্রথম উভয় শক্তিকে একত্রিত করে হরপার্বতীর উপাসনা আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিকগণ আমার কথা মানবেন কি না জানি না, কিন্তু বারাণসী যে পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম শহর, তা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

বর্তমানের বেবিলন দেখে অর্থাৎ বেবিলনের গঠন-প্রণালী দেখে অনেকেই তাজ্জব হয়ে যান; কিন্তু কাশীর মত ড্রেনেজ পুরাতন শহরের একটিতেও দেখা যায় না, অন্তত আমি দেখতে পাইনি। তবে কেন বেনারসকে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে গণ্য করা হল না?

সম্ভবত তার প্রথম কারণ হল, লোকের মন মহেন্‌জ-দারো এবং হরপ্পার দিকে ঢলে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, বারাণসীতে

অত্যধিক পরিমাণে মিশ্র সংস্কৃতি মাটির উপর দেখতে পেয়ে অনেকে শহরের প্রাচীনত্বের প্রতি গুরুত্ব দেননি। বরুণা এবং অসী নদীর মধ্যভাগে যদি এখনও খোদাই কাজ চলে তবে অনেক বেবিলন, অনেক মহেন্‌জ-দারো বেরিয়ে আসবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। উপরন্তু বর্তমান কাশীর অস্তিত্ব যে অতি আধুনিক, তা গঙ্গার গভীরত্ব দেখেই অনুমান হয়। অন্তত দুই শত ফুট না গেলে গ্রেভেল পাথরের দেখা পাওয়া যায় না।

দ্রাবিড় সভ্যতা বর্তমান আরব, পূর্ব ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত থেকেই সেই সভ্যতা সমুদ্র-পথে পৃথিবীর অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল অথচ প্রচারকেন্দ্র ছিল কাশী বা বেনারস। সেই প্রচার-কেন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে অনেক ইউরোপীয়ান পর্যটক বেনারসে আধুনিকতম দৃশ্য দেখে বিশেষ তত্ত্বের কথা চিন্তা করতেও পারেননি।

নর্দমার শেষ দেখা হয়নি বটে কিন্তু নর্দমার সম্বন্ধে যখন বলা-কওয়া করছিলাম তখন অনেকেই আমার কথা শুনছিলেন, যেন হারাধন পেয়েছিলেন! আমি কিন্তু আমাদের সভ্যতাকে একেবারে উপরে উঠাই নাই এবং ঝেড়েও ফেলে দেই নাই।

আজকাল উত্তর ভারতের এক শ্রেণীর লোক 'ভারতে সব ছিল' এই কথা বলে আনন্দ পায়, এটা কিন্তু খুবই দুর্বলতার লক্ষণ। রামায়ণ-মহাভারতে যেরূপ কল্পিত রূপকথা অনেক রয়েছে তেমনি অন্যান্য দেশের এবং অন্যান্য ভাষায়ও কল্পিত রূপকথার অন্ত নাই। আমাদের দেশের রথ আকাশে চড়ে বেড়াত আর আরব-দেশের কার্পেট আকাশে গমনাগমন করত। চীন দেশের একটা নগর আকাশে উঠে যথা ইচ্ছা তথা যেয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন করত। জাপান সম্রাটগণ সূর্যের বরে চোখের নিমিষে যে কোন গ্রহে যেয়ে আরাম করে ফিরে আসতেন। এর মানে, বর্তমানে

যারা বলে 'আমাদের দেশে পূর্বেও এরোপ্লেন ছিল', তাদেরই কথা এখানে বলা হচ্ছে, অন্য কিছু নয়।

বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যেয়ে মালব্যজীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "বাড়ীঘর দেখে কি মনে হচ্ছে?"

বললাম, "এটা একেবারে পুরাতন ধরণের কাজ, যেমন নালন্দা; চীন দেশে এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আছে। তবে চীনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সে দেশের ছাত্ররা মজুরের কাজ করতে ভালবাসে, এখানে ছাত্ররা মজুরের কাজ করতে ঘৃণা বোধ করে।"

মালব্যজী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। আমিও বিদায় নেই মালব্যজীর শারীরিক অবস্থা দেখে। রক্তের অভাব খুবই মনে হচ্ছিল।

এখানে থিওসফিকেল সোসাইটির আড্ডা। এনি বেসান্ত এই সোসাইটির প্রবর্তক। তিনি তাঁরই অজানিতে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছিলেন—সেই তথ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ লাহোরে লালা লাজপতরায় হলে একদিন ব্যক্ত করেছিলেন। থিওসফিকেল সোসাইটির মানেই বুদ্ধিজীবীদের মন রাজনীতি হতে অপসারণ করে এমন এক বিষয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া, যার মীমাংসাতে উপনীত হওয়া যায় না। সেই 'ভণ্ডুল' আফিসে যেয়েও নমস্কার জানিয়ে এসেছিলাম।

মানুষ যখন প্রথম উপলব্ধি করেছিল কি করে পৃথিবীতে জীব-জগতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার রূপ দিয়েছিল লিঙ্গ, তারপর যখন বুঝতে পেরেছিল যোনি ছাড়া লিঙ্গ একা সৃষ্টি করতে পারে না, তখন রূপ দিয়েছিল ভগবান সেই যুগের চিত্র। যে শহর দশ-বিশ হাজারের স্মৃতি বহন করে যাচ্ছে সেই শহরের প্রতি ঐতিহাসিকগণ অবহেলা করেছেন। বৌদ্ধযুগেও বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা সেই আদি এবং 'ক্রুড' চিন্তাধারার রূপকে নষ্ট করেনি বরং রক্ষা করেছিল।

এর পরে শঙ্করাচার্য নূতন করে যখন পুরাতন চিন্তাধারাকে পুনরায় কায়েম করণার্থ সারনাথের মন্দির ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তখন বৌদ্ধরা যেমন নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে আত্মগোপন করেছিল, ঠিক তেমনি ঔরংজেবও তারই আদি যুগের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন, আদি বিশ্বেশ্বরের বাড়ী ধ্বংস করে, হিন্দুদের হত্যা করে। অবতারবাদ যদি উৎকৃষ্ট হত তবে এরূপ ধ্বংসকাণ্ড ঘটত না।

কাশীতে পূর্বে অনেকবার গিয়েছিলাম, প্রত্যেকবারই ঔরংজেব এবং মুসলমানদের প্রতি হিংসা এবং ঘৃণার ভাণ্ড নিয়ে এসে-ছিলাম প্রসাদ রূপে ; কিন্তু এবার আর সেই মনোবৃত্তি বজায় রাখতে সমর্থ হই নাই, অবতারবাদই মানুষের শত্রু এটাই হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম কাশীধামে যেয়ে।

মানুষ সপ্তমাশ্চর্য দেখে কৃতার্থ হয়, আমি কৃতার্থ হয়েছি পৃথিবীর দুইটি পুরাতন প্রগতিশীল শহর দেখে। আসামে দেখে এসেছিলাম কামাখ্যা দেবীর বাড়ী, যেখানে যোনিই সৃষ্টির কারণ যারা বলে তাদের আদি তীর্থস্থান ; আর কাশী, যেখানে লিঙ্গই সৃষ্টির কারণ যারা বলে তাদের তীর্থস্থান। এই দুই স্থান এবং দুই চিন্তার পেছনে অবতারবাদ নাই এবং ছিল না। শঙ্করাচার্য হালে জুটেছিলেন এবং আদি চিন্তাধারার সঙ্গে নাহংবাদ যোগ করে দিয়ে আদি চিন্তাধারায় বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন মাত্র।

বেনারসের গলিপথ অতীব সঙ্কীর্ণ এবং এ বিষয় সকলেই বলে থাকেন। অধিক অনভিজ্ঞতা থাকলে যা হয়, ঘটেছে তাই। আরব দেশে এবং হল্যাণ্ডে বারাণসীর মত গলিপথ রয়েছে। অত্যধিক গরম এবং অতি শীত থেকে রক্ষা পেতে হলে অবৈজ্ঞানিক দেশে গলিপথই প্রশস্ত। বারাণসীর গলিপথের জন্য শহরের একটুও বদনাম দেওয়া যায় না, তবে ফুটপাত থাকলে বেশ ভাল হত।

কাশীধাম-সম্বন্ধে প্রবাদ আছে সেখানে কেহই অভুক্ত থাকে না। প্রবাদ-বাক্য সত্য। গোণার চারটি চাউল খাওয়াও খাওয়া বলতে হবে। সে-হিসেবে পৃথিবীর কেউই অভুক্ত থাকে না।

শিকরুল এবং রাজঘাট রেলস্টেশনে সর্বত্র ভিখিরীর দল দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেক শিশুচোর আত্মগোপন করে থাকে। কাশীধামে শিশুচোরের সংখ্যা বর্তমানে বেড়েছে কি না জানি না, কিন্তু পূর্বে কাশীর মধ্যে এমন অনেক দলবদ্ধ লোক ছিল যাদের কাজই ছিল যাত্রী-শিশুদের চুরি করে ভিক্ষা করানো।

সবই পূর্বজন্মের কর্মের ফল। ফল পেতে হবেই, অতএব চিন্তা করে লাভ নাই। এই হল আমাদের দর্শন এবং সেই অনুযায়ী আমাদের মনও গঠিত হয়েছে। আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক একমাত্র শিশুপুত্র এবং স্ত্রী নিয়ে কাশীধামে বাস করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সেই শিশুপুত্রটি চুরি যায়। তাঁকেও সেরূপই সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে পুত্র-শোকে কাতর হয়ে মারা যান।

এই প্রকার সমাজের মধ্যে জন্ম নিয়ে পর্যটক হয়ে কাশী যাবার পর মন সব সময়ই শিশু-ভিখিরীর দিকে আকৃষ্ট হত এবং আমার সাধ্যমত শিশু-ভিখিরীদের সাহায্য করেছি।

তুরকী ভ্রমণ-সময়ে শুনেছিলাম ইস্তাম্বুলের আয়া সোফিয়ার সামনেও সেরূপ শিশু-ভিখিরীর খুব ভিড় হত কিন্তু মুস্তাফা কামালপাশা তিন দিনে সেই শিশু-ভিখিরীদের ভিক্ষা-বৃত্তি লোপ করেন। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে দরবেশ-শ্রেণীর লোক শিশুদের চুরি করে এনে ভিক্ষা করাত।

মুস্তাফা কামালপাশা যদিও মার্ক্সিস্ট ছিলেন না তবুও আমাদের মত তিনি জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করতেন না। যারাই 'নসিব' বলত, তাদেরই তিনি পৃথিবী হতে বিদায় করে দেবার সময়

বলতেন, "অন্যত্র গিয়ে নসিব দেখতে হবে, বিদায় হও পৃথিবী থেকে।"

এইভাবে দরবেশ-শ্রেণীর লোক তুরকী হতে লোপ পেয়েছিল। সমস্ত ভিখিরী ছেলে-মেয়েদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার ভার সরকার গ্রহণ করেছিলেন।

যা হউক তখনো তুরকী ভ্রমণ করিনি, অতএব মনের গতি অন্য রকমই ছিল। শিশুদের প্রতি দয়া হত কিন্তু সে দয়ার্দ্র চিত্ত বেশিক্ষণ থাকত না, লোপ হয়ে যেত। তার মানেই 'দয়া' নামে যে সদ্‌গুণ আছে, তার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।

এর কারণ কি? এর কারণ হল খাঁটি দয়ার্দ্র চিত্ত যদি আমার থাকত তবে তখনই পর্যটন পরিত্যাগ করে বিপ্লবাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হত। তখন ছিলাম আমরা পরাধীন, অন্তত-পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য সক্রিয় বিপ্লবে যোগ দিতে হত। তা আমি করিনি, শুধু দেশ দেখার লোভ আমাকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল। অথবা দয়া নামক সদ্‌গুণ আমার মধ্যে পূর্বেও ছিল না এবং এখনও নাই।

সেদিন বিকালে যখন পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম তখন দেখা হয় এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে। সেই বন্ধুর নাম মহম্মদ আলী, জাতে বাঙ্গালী। তাঁকে চিনতেই পারছিলাম না। তাঁর সঙ্গে যখন ভেংকোভারে (কেনেডা) দেখা হয় তখন তাঁর গোঁফ-দাড়ি ছিল না। এবার তাঁর মুখে মুসলমানী কায়দা-মাফিক গোঁফ-দাড়ি ছাটা এবং কাটা। পরনে পাজামা কামিজ, মাথায় তুরকী টুপি, পায়ে নাগরা জুতা।

আমি তাঁকে কি করে চিনব? তিনিই আমাকে চিনলেন এবং টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কেমন আছি। অবশ্য হিন্দুস্থানীতে কথা হচ্ছিল। আমি ত' অবাক, এ লোকটা আমার সঙ্গে কথা বলছে কেন? কখনও দেখিনি।

আমার মনের অবস্থা ভদ্রলোক অনেকটা বুঝতে পেরে বললেন, "এটা ভেংকোভার নয়, কাশীধাম ; তারপর আমি একজন মুসলমান, ছুঁলে জাত যায়। মনে আছে সেই লোকটা যে তোমার জন্য এক হাজার ডলার জামিন হতে চেয়েছিল ?"

"তিনি হলেন মিষ্টার মহম্মদ আলী। তোমাকে কি সেখানে দেখেছিলাম ? আমার ত' মনে হয় না।" আমি বললাম।

মিঃ মহম্মদ আলী বললেন, "আমি রূপ বদলিয়েছি, তুমি রূপ বদলাও নি।"

আরও একটু ভাল করে দেখে বুঝলাম, এই সেই মহম্মদ আলী যিনি কেনেডা সরকারের কাছে এক হাজার ডলার জামিন হয়েও আমাকে ছাড়াতে পারেননি। তাকে আঁকড়ে ধরে বললাম, "তোমাকে আমি চিনতে পারিনি, তারপর তুমি আমাকে যে রকমে আক্রমণ করেছ, বাস্তবিক আমি সেজন্য দুঃখিত ; কিন্তু অবতারবাদ অনেক পেছনে রেখে এসেছি। এখানে দেখছি সেই পুরাতন ঐতিহাসিক তথ্য, যা নিয়ে একদিন তোমারই ঘরে কথা হয়েছিল। এখন চল আমার হোটেলে।"

"তা হয় না, আমার মত দাড়িওয়ালা মুসলমানকে তোমার হোটেলে ঢুকতে দেবে কিনা সন্দেহ, দ্বিতীয় কথা হল আমি এখনও নির্বাসিত রূপেই গণ্য। আমার পেছনে লোক লেগেই আছে। তুমিও কেনেডা হতে ডিপোর্ট হয়েছিলে কিন্তু আমি ডিপোর্ট হয়েছি রাজনৈতিক কারণে। নিজেকে সব সময় মুসলমান ছাড়া আর কিছু বলিনি। অবশেষে প্রমাণ হয়ে যায় আমি জাতে বাঙ্গালী, ধর্মে মুসলমান। ধর্ম যখন-তখন বদলানো যায় কিন্তু মরবার পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালীত্ব দূর করা যায় না। সেজন্যই ডিপোর্ট করা হয়েছিল।

স্ত্রী এবং কন্যাকে কেনেডাতেই রেখে এসেছি। বলে এসেছি যে পর্যন্ত আমাদের দেশ স্বাধীন না হয় সে পর্যন্ত কেনেডাতে ফিরে

যাবার সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু স্ত্রীর ভালবাসা, কন্যার ক্রন্দন এখনও চোখে ভাসে। কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না। উপরন্তু দেশে আসার পর হিন্দু-মুসলমানের মতানৈক্য দেখতে পেয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে কি না, তাও বুঝতে পারছি না! ইচ্ছা করলেই কেনেডাতে ফিরে যেতে পারি কিন্তু থাকতে হবে চোরের মত ; তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল, তুমি কি বল?"

"চোরের মত থাকাও কষ্টকর ; তবে একটি কাজ করতে পারেন, আমেরিকাতে যেয়ে সেখানে আপনার কন্যা ও স্ত্রীকে ডেকে আনতে পারেন।"

মহম্মদের চোখ বিস্ফারিত হল, তিনি চুপ করলেন। কতক্ষণ পর আমার হাত ধরে বললেন, "তোমার উপদেশ কাজে লাগাবার চেষ্টা করব, এখন বিদায়।"

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমেরিকাতে পুনরায় দেখা হয়েছিল। তাঁকে তাঁর স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গেই দেখেছিলাম। ইনি বুঝতে পেরেছিলেন যারা ইমিগ্রেশন আইন প্রথম প্রণয়ন করেছিল, তারা কত নির্দয়! মানুষ হয়েও তারা পশুই ছিল। তারা ছিল ইউরোপীয়ানদের পূর্বপুরুষ। আমেরিকানরাই এই আইন সর্বপ্রথম প্রবর্তন করে। আজ আমেরিকানরা আরব দেশগুলিতে টাকার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। মুসলিম আরব যাতে আমেরিকাতে না যেতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই এই আইনের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৃটিশ সরকার বাঙ্গালীদের বিদেশে গমনাগমনের বাধা সৃষ্টি করার জন্য এই আইনের কঠোরতা পূর্বদেশেও আরোপ করে।

এলাহাবাদ

পরদিন কাশীধাম হতে বিদায় নিয়ে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করে এলাহাবাদে পৌঁছি। সেখানে মুখুয্যে মহাশয়দের পরিচালিত হোটেলে থাকি এবং কয়েকটি বিশেষ স্থান—যথা অক্ষয়বট এবং ত্রিবেণী দেখে ও ত্রিবেণীতে স্নান করে, কানপুরের দিকে রওয়ানা হই। এখানে ১৯৩৬ সালে এম. এন. রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাকে তাঁর অতীত ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিল। চীন দেশে হয়ত ভুল করেছিলেন, তা বলে সারা জীবন ভুল করা চলে না।

এম. এন. রায় শ্রেণীর লোক ভুল না করে পারেন না। পূর্বেই বলেছি শিশুকে সবাই ভালবাসে; কিন্তু পৃথিবীর সকল শিশু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বিপ্লবের দরকার, সেই বিপ্লবকে আঁকড়িয়ে রেখে কাজ করে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। আজ মানবেন্দ্র রায় মহাশয় আর নাই। তিনি আমাদের জন্য যেটুকু করে গেছেন, সেজন্য মাথা নত করে তাঁর নামে শ্রদ্ধা জানাই।

এলাহাবাদে মতিলাল নেহেরুর বাড়ী। জহরলালের জন্মভূমিও এই এলাহাবাদ। এখানেই ত্রিবেণী, এখানেই অক্ষয়বট; কিন্তু আমাকে কিছুই আকৃষ্ট করতে পারেনি। এখানে আসার পরই গুরুদ্বারের এক শিখের সঙ্গে দেখা হয়। সেই শিখ স্মরণ করিয়ে দেয় ভকত সিংএর কথা আর সেই ছবিটার কথা—যে ছবি একবার চীন দেশে দেখেছিলাম।

সেই ছবিতে একদিকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের নেতারা, অন্যদিকে ভকতসিংএর ছিন্নমুণ্ড। ছিন্নমুণ্ডের পাশেই বৃটিশ পতাকা পত পত করছে আর হুমকি দিয়ে বলছে—"খবরদার, Long live Revolution উচ্চারণ করো না!"

এই ভকতসিংই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন (মুজাফর আহম্মদের মতে) 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ!' খাঁটি উর্দু, সংস্কৃত এবং আরবী শব্দের সংমিশ্রণ।

ত্রিবেণীতে স্নান করে অক্ষয়বট দেখতে গিয়েছিলাম। কিল্লাতে বৃটিশ সেপাই পাহারা দিচ্ছিল। যাত্রীদের নেড়া মাথা এবং এক বস্ত্রে অক্ষয়বটের দিকে যাওয়া সেপাইরা দেখছিল। আমি দেখছিলাম তাদের ঘৃণ্য মুখ।

অক্ষয়বট সজীব নহে, মৃত, শুষ্ক, বল্কলহীন; এবং দেখলে মনে হয় না এটা একটা বটগাছের অংশ হতে পারে। তাতেই সকলে ফুল এবং চন্দন লাগিয়ে হাতজোড় করে প্রণতি জানালো, আমিও তাই করলাম আর ভাবলাম হয়ত বটগাছই সৃষ্টির স্বুরুতে সবচেয়ে বড় গাছ ছিল যার উপর উঠে আদি মানব জীবন-রক্ষা করত এবং সেজন্যই বটগাছের এত প্রাধান্য।

নদীতে স্নান করার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং গঙ্গাস্নান করলে পাপক্ষয় হয়, স্বর্গবাস হয়, এসব প্রচলিত কথাও রয়েছে। কেন গঙ্গাস্নানের এত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তার কারণ কোরিয়া-ভ্রমণের সময় জেনেছিলাম।

কোরিয়ার পৌরাণিক তথ্যমতে কোরিয়ানরাই সর্বপ্রথম নদীতে নেমে অথবা সাগর-জলে স্নান করতে সক্ষম হয়। এখনও পৃথিবীতে এমন অনেক জাতের লোক আছে যারা স্নান করতেও ভয় পায়। বিন্ধ্যাচলের পার্বত্য জাতি তার মধ্যে অন্যতম। যারা স্নান করতে ভয় পায়, তারা নদী দেখলে আরও ভয় পাবে এটা স্বাভাবিক।

প্রয়াগে মাথা মুণ্ডনের প্রথা রয়েছে। আদিযুগে চুল রাখার প্রথা ছিল; তাতে উকুন হত, জটা বাধত। মনে হয়, এদিকের লোকই সর্বপ্রথম ক্ষুরের আবিষ্কার করে এবং যারা ক্ষৌরকর্ম করত তাদের পোষণার্থ প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। আমার

মাথা মুণ্ডন যে লোকটি করেছিল, তাকে এক টাকা চার আনা দক্ষিণা দিয়েছিলাম।

যতগুলি ক্ষৌরকার দেখেছিলাম, তাদের মধ্যে একজনের আকৃতিও ইন্দো-এরিয়ানের মত ছিল না। অথচ বিহারে, বিশেষ করে গয়াতে ক্ষৌরকারদের অনেকেরই আকৃতি ইন্দো-এরিয়ানের মতই ছিল। গুজরাত এবং কাঠিওয়ার ভ্রমণ সময়ে নাগড় ব্রাহ্মণ, মুচি, জেলে, নাপিত, ছুতার, ইন্নেসেরী মুসলমান এবং সিয়াদের চেহারার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাইনি; অথচ পেটেল, রাজপুত, আগাখানী বোড়া-মুসলমান ইত্যাদির মধ্যে বর্ণের একত্ব অথবা চেহারার সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না।

এলাহাবাদ ছাড়বার পর আমার গন্তব্যস্থল ছিল কানপুর। এলাহাবাদ শহর থেকে বের হয়ে প্রায় বার মাইল যাবার পর আর পা চলছিল না। সাইকেল পেডেল করার ক্ষমতা মোটেই ছিল না। ভাবছিলাম হয়ত সাইকেলে কোনও দোষ হয়েছে; কিন্তু সাইকেল পরীক্ষা করে দেখলাম, সাইকেলে কোন দোষই নেই। অনেক চিন্তা করে নিকটস্থ ডাক-বাংলোয় আশ্রয় নিলাম।

কিন্তু বিকেলের দিকে রক্ত-আমাশয়ের লক্ষণ একটু প্রকট হয়ে ওঠে; তখন শুয়ে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু শুয়ে থাকা সম্ভব হয়নি, বার বার মলত্যাগের জন্য উঠে যেতে হয়েছিল।

ধন্যবাদ জানাই ডাক-বাংলোর মেথরকে, সে দয়া করে গ্রাম থেকে ঘোল এনে দিলে, হাত-পায়ে সেঁক দিলে ও পরের দিন নিজের তত্ত্বাবধানে কানপুরের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছিল। এর পরিবর্তে আমি দিয়েছিলাম একটি মাত্র টাকা। এই শ্রেণীর লোককে ঘৃণা এবং হিংসা করতেই ছোটবেলা হতে শিখেছিলাম। বিপৎকালে আজ তারাই আমার বন্ধু হয়েছিল।

গাড়িতে উঠেও শান্তিতে বসতে পারিনি, ক্রমাগত পেটে ব্যথা হচ্ছিল, মাথা কন্ কন্ করছিল। তিনটার সময় গাড়ি হতে নেমে কোথায় যাই ভাবছিলাম। তারপর হঠাৎ মনে হল রামকৃষ্ণ-মিশনের কথা। সেখানে উঠেই আরাম পেয়েছিলাম, আরোগ্য হয়েছিলাম এবং ভ্রমণ করার মত শক্তি অর্জন করেছিলাম।

কানপুর

শরীরে শক্তি থাকলে রোগে সহজে কাবু করতে পারে না। কানপুর রেল-স্টেশনে পৌঁছানোর পূর্বেই কিছুটা আরাম অনুভব করি এবং গাড়ি হতে নেমে সোজা রামকৃষ্ণ-মিশনে যাই। সেখানে যেয়ে বেশ শান্তি পেয়েছিলাম। শান্তি অনেক রকমের, যথা—মানসিক শান্তি।

মিশনে যাঁরা কাজ করেছিলেন একদা তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী-ভাবাপন্ন ছিলেন। বিপ্লব থেকে একেবারে বিপরীত ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। যখনই কোন বিপ্লবী, ধর্মের ভিত্তিকে ভিত্তি করে বিপ্লবে অগ্রসর হয় তখনই তার পতন হয়; এবং সেই পতনের গ্লানি হতে নিজেকে একটু আনন্দ দেবার জন্য কোনও কিছু অবলম্বন চায়। আমি হয়েছিলাম তাঁদের সেই অবলম্বন।

সকাল-সন্ধ্যায় এঁরা প্রার্থনা করতেন, আমি তাতে যোগ দিতাম না। তাঁরাও আমাকে যোগ দিতে আদেশ করতেন না; জানতেন ভাঙব, তবুও মচ্‌কাব না। প্রায়ই তাঁরা ভ্রমণ-কথা শুনতে চাইতেন। আমিও মাও-স্তুতন এবং তাঁর সাথীদের কথাই বলতাম। লক্ষ্য করতাম এঁদের মনে বিদেশী বিপ্লবীদের উন্নতির কথা শুনে কত কষ্ট হচ্ছে! ভারতীয় সাধু লাল কাপড় পরিত্যাগ করতে ভয় পায়। আমাদের মধ্যে যেমন তালাক দেওয়ার নিয়ম নাই, ঠিক তেম্‌নি গৈরিক বস্ত্র পরিত্যাগ করারও নিয়ম নাই। এঁদের এই দুঃখের জীবন দেখে প্রাণে বেশ আঘাত লেগেছিল। তাঁদের কিছু বলিনি, বলবার সাহসও হয়নি।

কানপুরে সিপাই-বিদ্রোহের চিহ্ন বৃটিশরা লোককে দেখাবার জন্য রেখে দিয়েছিল; কিন্তু আমাদের দেশের লোক যারা নিজের দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের কোনও

চিহ্ন দেখতে না পেয়ে দুঃখ হয়নি, ক্রোধ হয়েছিল। নিজের জাতকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়েছিল, নিজেকে অপমানিত মনে করেছিলাম। নিজজাতের স্মৃতিরক্ষা করা আমাদেরই কর্তব্য।

এখানেও লোকে নদীতে স্নান করে, তর্পণ করে, পিণ্ড চড়ায় এবং চটকায়। সেই সঙ্গে যদি সিপাই-বিদ্রোহের বিপ্লবী বীরদের নামে সকলেই পিণ্ডদান করত, তর্পণ করত, তবে কত সুখের ও কত আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়াত! সিপাই-বিদ্রোহের কয়েকটা পাতকূয়া দেখে এবং বৃটিশের জয়-গরিমা-দীপ্ত দাম্ভিকতা দেখে কানপুর হতে বিদায় নিয়ে লক্ষ্ণৌ যাই।

লক্ষ্ণৌ

কানপুর হতে লক্ষ্ণৌ মাত্র চুয়াল্লিশ মাইল। পথ অতীব সুন্দর। পথের হু'দিকে মাঠ ধু-ধু করছিল। লু-হাওয়া শরীরে লাগছিল তবুও সাইকেলখানা পবনের মত উড়ে চলছিল।

কয়েকদিন পূর্বে এই পথে এক ডাকাতি হওয়ায় টহলদার পুলিশ তখন প্রায়ই দেখতে পাচ্ছিলাম। পুলিশ দ্রষ্টব্য জিনিসও নয়, চিন্তনীয় বিষয়ও নয়, আসল বিষয় ছিল ডাকাত দেখা। ডাকাত যদিও দেখতে পাইনি কিন্তু ডাকাত হতে শক্তিশালী এক অতিকায় সামাজিক শক্রর সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সেই শক্র যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে খাচ্ছে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব মনে করে দাঁড়ালাম। সেই শক্রর নাম ছুৎমার্গ।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করবেন, ছুৎমার্গরূপী দৈত্যের জয় হয়েছিল কি আমার জয় হয়েছিল? উত্তরে বলব, আমার শুধু পরাজয়ই হয়নি, পলায়ন হয়েছিল; অথচ এই দৈত্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল শহরের সন্নিকটে, যে শহরে একদা মুসলিম নবাবেরা রাজত্ব করতেন।

শহরে পৌঁছে একটি ধরমশালাতে উঠলাম। আমাকে একখানা রুম দেখিয়ে দিয়ে চার পয়সার বিনিময়ে একখানা চারপাই দেওয়া হল। স্নানাহার শেষ করে পুরাতন শাসকদের বাসভবন এবং হুর্গাদি দেখতে গেলাম। যে সকল অট্টালিকা দেখলাম, তার মধ্যে নবাবের বাড়ীই দেখতে সুন্দর, মসজিদগুলি সর্বত্র যেমন দেখায় এখানেও তদ্রূপ।

শহরে ভ্রমণের সময় পরিষ্কার করে বুঝলাম, এখানে হুই জাত লোক বাস করে। এক জাত কালো, অন্য জাত আমেরিকান মতে বর্ডারলাইনার। টেণ্ডন, কিদোয়াই শ্রেণীর লোক বর্ডার-

লাইনার আর রামা-শ্যামা হল কালো অর্থাৎ অনেকটা গোলাম বললেও দোষ হয় না।

এখানে দেখা হয় এক মির্জার সঙ্গে। অবশ্য তিনি মীরজাফরের বংশধর নন, লক্ষ্ণৌর লোক। তাঁর বাড়ীতে যেয়ে দেখলাম যত চাকর এবং চাকরাণী, সবাই কালো রঙ্গের। তারা আদেশের অপেক্ষায় সব সময় হাজির।

মিষ্টার টেণ্ডন সে সময়ে কংগ্রেসের হোমরা-চোমরা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে বাজারে দেখা হয়। তাঁর বাড়ীতেও অনেকগুলি কালো লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বুঝতে পারলাম, এদিকে ইন্দো-এরিয়ানদের কত প্রতাপ!

এক অপূর্ব রীতি সেখানে! মেথর, চামার এবং সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ঘি-মাখন বিক্রি করা হয় না। অনেক স্থানে দেখেছি, অনেকগুলি অচ্ছুৎ জলের পাইপের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে জল খাবার জন্য, অথচ তাদের মধ্যে এমন সাহস কারো হয়নি যে কলটা খুলে জল খেয়ে তৃপ্ত হয়! তারপর লক্ষ্ণৌ শহরের অন্যান্য যে বদনাম রয়েছে তা কতটুকু সত্য, জানবার ইচ্ছাও হয়নি।

এখানে কতকগুলি বিদ্যালয়ে লেকচার দিয়েছিলাম। প্রায় বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারই মুসলিম। তাঁরা আমাকে লেকচার দেবার জন্য বেশ উৎসাহ দেন এবং তাঁদের উৎসাহ পেয়ে প্রায় ছয়দিন লক্ষ্ণৌ থেকে লেকচার দেই। সর্বত্র একই চীনের কথা। মাঝে মাঝে নিজের দেশের কথা বলতেও ভুলতাম না।

এখানে পরিষ্কার করে একটি বিষয় বলা দরকার। আমি যখন ভ্রমণ করছিলাম তখন আমরা পরাধীন ছিলাম। পরাধীনতা অপসারণ করাই ছিল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। পূর্বদেশগুলি ভ্রমণ করার পর বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের দেশের ধর্মগুলিকে আশ্রয় করেই বৃটিশ ভারত শাসন করছে।

ধর্মের প্রচারক এবং সহায়ক পুরোহিত-শ্রেণী। আমাদের

দেশের পুরোহিত-শ্রেণী বিদেশী সংবাদ রাখে না পৃথিবীর লোক নৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক—সব রকমেই উন্নতির দিকে ধাবমান হচ্ছে। এক ভারত ছাড়া ছুৎমার্গের কুসংস্কার কোথাও নাই। ছুৎমার্গের সংস্কার আধুনিক, পুরাতন নহে।

বিদেশে ভ্রমণের সঙ্গে আমাদের আর্থিক এবং সামাজিক কথা যখনই বলতাম তখনই এক শ্রেণীর লোক খাপ্পা হয়ে যেত। যারা সত্যিকারের বৃটিশ এজেন্ট, তারাই আমাকে বিদেশী শব্দে ভূষিত করত। এখনও সেই প্রকার লোক আমাদের দেশের সর্বত্র দেখা যায়, তবে তারা তাদের রূপ বদলিয়েছে। তারা অনেক উন্নত ধরণের বাক্‌চাতুরীতে সিদ্ধ হয়েছে।

এই শ্রেণীর লোক পূর্বে পুরোহিত-শ্রেণীতে দেখা যেত এখন পুরোহিত-শ্রেণীর কাজ ফুরিয়েছে—আমাদের দেশ খণ্ডিত হয়েছে—তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। এখন বাকি রয়েছে স্বাধীন ভারতকে পরাধীন করার তর্কশাস্ত্রের বেড়াজাল। যাহোক, বর্তমান নিয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই; অতএব পূর্বের বিষয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল।

উত্তর-ভারতের মজুরের স্থান কানপুর। সেখানে ফিরে এসে আর রামকৃষ্ণ-মিশনে যাওয়া ভাল মনে হয়নি; মজুরদের বস্তিতে এক রাত্রি থেকে, পরের দিন আগ্রার দিকে রওয়ানা হই।

কাল্‌পী

একদিনেই কাল্‌পী নামক স্থানের নদীতটে এলাম। এক ডাক-বাংলোতে একটাকা দক্ষিণা দিয়ে রাত কাটাবার স্থবিধা করা গেল। স্থানটাও গরম নয়। লু-হাওয়ার অত্যাচার কম থাকায় রাত্রে স্থনিদ্রা হল।

পরদিন সকালে একদল কালো লোক মাছ নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে চারআনা দিয়ে একটা বড় রুই মাছ কিনে নিলুম। তারপর ডাক-বাংলোয় চলে গিয়ে ডাক-বাংলোর চাকরের সাহায্যে মাছ রান্না করে খেয়ে নিলুম।

ডাক-বাংলোর চাকর আমাকে বলল, "বাবু, এদিকের ভদ্রলোকেরা ভুলেও মাছ খায় না—সে হিন্দু বা মুসলমান যাই হউক; কিন্তু কলিকাতা হতে সাহেব এলে এখানে মাছ না খেয়ে যায় না; আর তুমি হলে বাঙ্গালী, তোমার খাদ্যই হল মাছ। আমরা হলাম আদিবাসী, আমরাও মাছ খাই।"

তারপর সে এমন আরও কিছু বলল যা ভ্রমণ-কাহিনীতে লেখা যায় না এবং রুচিবান্ পর্যটক তা ভাবতেও পারেন না।

এই লোকটির নির্দেশ মত নদীতীরের পথ অবলম্বন করে, যে সকল গ্রামের সে নাম দিয়েছিল, সেই গ্রামগুলির ডাক-বাংলোয় থেকে অতি অল্প পরিশ্রমে আগ্রায় পৌঁছি।

গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ আরম্ভ করলাম। গ্রামের নীরবতা, পবিত্রতা, বিশুদ্ধ আবহাওয়া আমার মনকে চাঙ্গা করে তুলল। গ্রামের মধ্যে এক ঘর মিশির ব্রাহ্মণ আর সবাই অচ্ছুৎ অথবা আদিবাসী। মিশির ঠাকুর সকালে উঠেই গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ীতে যান এবং সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর এক মুঠো আটা দক্ষিণাস্বরূপ আদায় করেন। কারো বাড়ীতে যদি কেউ অস্থস্থ হয় তবে গ্রাম্য পুরোহিত মিশির ঠাকুরকে ঔষধের

ব্যবস্থা করতে হয়। সেজন্য যদি গ্রামান্তরে তাঁকে যেতে হয়, তাতেও তিনি বাধ্য। ঝগড়া-বিবাদ হলে তিনিই মীমাংসা করেন। পুরোহিত অর্থাৎ মিশির ঠাকুর কোথাও ইন্দো-এরিয়ান, কোথাও মিশানো, কোথাও শ্যামবর্ণ। গ্রামের প্রাণ—মিশির ঠাকুর।

গ্রামের মুসলমানেরাও মিশির ঠাকুরের আদেশ মান্য করে এবং সকালে এক মুষ্টি চাউল অথবা আটা দিয়ে আশীর্বাদ নেয়। গ্রামাঞ্চলে মৌলবী দেখা যায় না। মৌলবী বাস করেন শহরে।

এদিকে মুসলমানদের মধ্যে একটিও ইন্দো-এরিয়ান দেখতে পাওয়া যায় না। সকলেই আদিবাসী। আদিবাসীদের মধ্যে দুইটি ধর্ম বর্তমান; কিন্তু তৃতীয় ধর্ম প্রবেশ করতে আরম্ভ করায় গ্রামবাসীর পুরাতন রীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। সাহস করে যারা নূতন ধর্মের মধ্যে এসে পড়ছিল, তারা শিক্ষার দিকে বেশ এগিয়ে চলছিল এবং ক্রমাগতই দেশাত্মবোধ হারিয়ে ফেলছিল।

আদিবাসীদের শরীরের রং কিন্তু নিগ্রোদের মত কৃষ্ণবর্ণ নয়। মাঝে মাঝে মাত্র দুই একজন লোক দেখেছি যাদের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু তাতে বেশ লাবণ্যমাখা। চুল, দাঁত, মুখের গঠন একেবারে তীক্ষ্ণ, নাক পাতলা এবং খাঁটি নরডিকদের মত। এই ধরণের লোক খুবই কম এবং তারা নিজেদের চিন্তায় নিজেরাই বিভোর।

অন্যদিকে এরা উদ্ভিদতত্ত্ব বেশ ভাল জানে এবং সাপকে পেলেই হত্যা করে। সাপ-উপাসনা কিম্বা কোন রকম উপাসনায় তাদের মন বসে না। মদ এবং মাংস খেতে যেমন ভালবাসে, দুধ সেরূপ পছন্দ করে না, অথবা সন্তানাদি বেশি করে হউক তাও পছন্দ করে না। এদের কোনও বিশেষ গোষ্ঠী নাই, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। এই ধরণের লোককে চা খাওয়াবার প্রলোভন দেখিয়ে অথবা সিগারেট দিলেও নেয় না দেখে তাজ্জব হয়েছিলাম। আদিবাসী প্রবৃত্তি এদের মধ্যে খুব কমই দেখতে পেয়েছিলাম।

আগ্রা

এর পর আগ্রা যেন আমাকে আবার নতুন করে আকর্ষণ করতে লাগলো! আগ্রাতে আরও একবার গিয়েছিলাম এবং আগ্রার তাজমহল এবং অন্যান্য নিকটস্থ স্থান দেখেই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। এবার যমুনা নদীর ওপারে থেকে গেলাম।

শহরে আসতে ইচ্ছা না হবার প্রথম কারণ হল শহর গরম। দ্বিতীয় কারণ, সন্ধ্যার পরও কিছু দেখার ইচ্ছা। আমাকে যারা স্থান দিয়েছিল, তারা হল আহীর। আহীর যমুনাতে মাছ ধরে এবং শহরে বিক্রি করে। যে আহীরের ঘরে ছিলাম, তাকে দৈনিক বার আনা পয়সা দিতাম, পরিবর্তে সে দু'বেলা পেট ভরে মাছ-ভাত খাওয়াত। এর চেয়ে সুখময় জীবন পর্যটকের পক্ষে আর কি হতে পারে? আমি হলাম বাঙ্গালী, উত্তম মাছ-ভাতেই তৃপ্ত।

যদি থাকবার এবং খাবারের ভাবনা না থাকে তবে সুচিন্তা আপনা হতেই আসে। একদিন তাজমহল দেখতে গেলাম। কি সুন্দর দৃশ্য! তাজমহলের তুলনা শুধু তাজমহলের সঙ্গেই করা যায়। দৃশ্য মনোরম এবং তাজমহলের কিছুটা দেখামাত্র নির্মাণকর্তা এবং নির্মাণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা আপনি এসে গেল।

বেলা ঠিক এগারোটা। একদল বাঙ্গালী তাজমহল দেখতে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমিও যোগ দিলাম। সকলেই সাহজাহান এবং মমতাজের কবরের উপর মোমবাতি জ্বালিয়ে নমস্কার করলেন। আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম মাত্র। কয়েকজন আরম্ভ করলেন ডি. এল. রায়ের তাজমহল কবিতার আবৃত্তি। শুনতে ভালই লাগল। ডি. এল. রায়ের সবগুলি নাটক প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল, অতএব এঁদের বেশ ভালই লেগেছিল।

কতকগুলি বাঙ্গালী মুসলমানও সেই সঙ্গে ছিলেন। দেখলাম, এঁদের কেউ কোনরূপ মন্তব্য না করে অথবা মোমবাতি না জ্বালিয়ে একেবারে চলে গেলেন আঙ্গিনাতে। তাঁরা যেখানে গেলেন সে দৃশ্যটা কিন্তু আমার চোখেও পড়েনি। তাজমহলের উপরে যে তিনটি কলসী রয়েছে, সেই তিনটি কলসীর আয়তন অনুযায়ী পাথর দিয়ে চিত্র আঁকা রয়েছে। একজন পায়ে হেঁটে দেখলেন, তাঁর আঠার ধাপ হল নীচেকার কলসীর দৈর্ঘ্য।

বড়ই দুঃখের সহিত বলছি তাজমহলের সর্বনিম্ন কলসী কতবড় বুঝতে পেরে খুবই বিস্ময় বোধ হল। তাজমহল দেখার মত কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের এক আশ্চর্যে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে আরম্ভ করলাম।

প্রথমত জেনে নিলাম, তাজমহলের শ্বেত পাথর কোথা হতে এসেছিল। জানতে পারলাম, জয়পুর, দাক্ষিণাত্য, আফগানিস্থান, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশ হতে আসে। সেগুলি ছিল একশত হাত লম্বা ও সেই অনুযায়ী চওড়া। প্রত্যেকখানি পাথর পুরুও ছিল অনেকটা। কোন কোন পাথর এর চেয়ে দশগুণ বড়ও ছিল। গম্বুজগুলির প্রত্যেকখানা পাথর একেবারে নিটোল এবং প্রত্যেকখানা পাথর বহুদূর হতে আনা হয়েছিল।

তিনদিন শুধু পাথর আনার ইতিহাসই শুনতে হল। তারপর খরচের তালিকা অবশ্য তেমন কিছু মনে হল না; কিন্তু যখন মজুরের মৃত্যু এবং পাথর চাপা পড়ে কত লোক ইহলোক হতে বিদায় নিয়েছে শুনতে লাগলাম, তখন ডি. এল. রায়ের 'সাজাহান' আমার কাছে ভাবপ্রবণতার ফোয়ারা বলেই মনে হল। আমি তাজমহলের নাম দিলাম 'রক্তমহল' এবং সেকথা প্রথম বললাম যে আহীরের বাড়ীতে ছিলাম তার কাছে; ভ্রমণ শেষ করার পর সেকথা বলেছি কয়েকজন বাঙ্গালী মুসলমানের কাছে, আর আজ বলছি আমার এই ভ্রমণ-কাহিনীতে।

তাজমহল দেখা শেষ করে যখন দিল্লীর দিকে রওয়ানা হলাম তখন শুধু মনে হল এই সেই তাজমহল যার নাম শুনেও লোকে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে। এটা হবার কথাই। আমাদের দেশে এখনও শ্রমের মূল্য নাই, পূর্বেও ছিল না।

দিল্লীর দিকে

আগ্রা হতে মথুরা পর্যন্ত যে রাজপথ গিয়েছে, সে পথ বাস্তবিকই পরিব্রাজকদের উপভোগ্য। হেঁটে এবং বাইসাইকেলে যে কেহ এই পথে চলতে পারে। একদিকে নদী, অন্যদিকে অগণিত গ্রাম।

এদিকের গ্রামগুলি কিছুটা উন্নত; প্রিমিটিভ্ স্টেজ পার হয়ে একপা এগিয়ে গেছে দেখলেই বোঝা যায়। এখন বোধহয় আরও উন্নত হয়েছে।

এমন সুন্দর পথে চলার সময় এটাই লক্ষ্য করেছি, পথের দু'পাশের গ্রামাঞ্চলের লোকের মধ্যে বাংলাদেশের মত পর্দাপ্রথা অথবা ঘোমটা-দেওয়া স্ত্রীলোক বড়ই কম; তা ছাড়া স্ত্রী-পুরুষের দূরত্বও কমই দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের উচ্চ চাহনি; স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষদের সম্মান বেশ অনুভব করা যায়।

শত শত বৎসর মুসলিম রাজত্বে বাস করেও এরূপ স্বাধীনতা কোন্ শক্তিতে এরা বজায় রেখেছিল, তাই ভেবে একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম।

মথুরা-বৃন্দাবন

বিকালে মথুরা পৌঁছে একটি হোটেলে স্থান নিলুম। দক্ষিণা মাত্র একটাকা। হোটেলটি নদীর কাছে অবস্থিত। সন্ধ্যার সময় নদীর জলের সামনে দাঁড়িয়ে আরতি করা দেখছিলাম। আমায় তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল আর্য অথবা নবাগত শ্বেতকায়দের নদী-ভক্তির কথা। আরতি অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর।

ঘাটের কাছেই কতকগুলি কচ্ছপ বিচরণ করছিল। দেখে বড়ই ঘৃণা হল। এদের কেন প্রতিপালন করা হচ্ছে এবং কেন এদের শ্রদ্ধা করা হয়, জিজ্ঞাস্য বিষয় বটে। এটা যেন স্মার্ণা বন্দরের কচ্ছপ-মিছিল! স্মার্ণা বন্দরে বর্তমানে আর মিছিল চলে না; তুরুকগণ কচ্ছপ-মাংস খায় না কিন্তু কচ্ছপ হত্যা করে এবং কুৎসিত-দর্শন জীবের মৃতদেহ ইহুদী ও খৃষ্টানদের বাড়িতে উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দেয়। এখানেও সেরূপ ব্যবস্থা করলেই ভাল হয়।

বৃন্দাবনে আরও ভয়াবহ কচ্ছপ দেখা যায়। সে কচ্ছপ মানুষকে আক্রমণ করে এবং অনেক সময় কামড়ায়। বৃন্দাবনের ইন্দো-এরিয়ান্‌রা বলে, যারা পাপী তাদেরই শুধু কচ্ছপে কামড়ায়। পাপ-পুণ্যের অভিজ্ঞতা এদের পৃথক ধরণের; অতএব বলবার কিছুই নেই।

পরের দিন দেখলাম, একটি লোক একটা কাককে বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখানে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা কাকের মাংস খায়। যে লোকটি কাক বিক্রি করতে এসেছিল, তার শরীরের বর্ণ ঘন শ্যাম, চোখ বড়, আজানুলম্বিত বাহু, পদ যুগল স্কট্‌দের মত লম্বা এবং নিটোল, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। চুলগুলি একেবারে অস্ট্রিক ধরণের। দেখেই মনে হল, এই লোকটি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের

বংশধর। আজ আমরা খাদ্য-বিচার করি, শ্রীকৃষ্ণের সময়ে খাদ্য-বিচার ছিল না। হতে পারে তাঁর বংশধরেরা পূর্ব নিয়ম বজায় রেখেছে।

এখানেই আমার কৃষ্ণদর্শন শেষ হল না, পরের দিন সকালে বৃন্দাবন চলে গেলাম এবং কোনও হোটেলে না থেকে এক ব্রজবাসীর বাড়ীতে থাকলাম। বিকালে গোবিন্দজীর বিধ্বস্ত মন্দির দেখে বড়ই দুঃখ হল। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শ্রীকৃষ্ণ যিনি কুরুপাণ্ডবের বংশ সেই সঙ্গে যাদবকুল ধ্বংস করেছিলেন, তাঁর নামের যে মন্দির, ঔরংজেব সেটি ভেঙ্গে ফেলেছেন! বড়ই পরিতাপের কথা।

তারপরই মনে হল ঔরংজেব খাঁটি মোংগল। কালো লোকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা না থাকারই কথা, অতএব তাঁর পক্ষে গোবিন্দজীর মন্দির ভেঙ্গে ফেলা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

মানব-জাতির সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাদা এবং কালোতে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল। সেই সংঘর্ষ চলবে যে পর্যন্ত উভয় জাত মিলে গিয়ে একত্ব প্রাপ্ত না হয়। অর্জুনের মত লোকও যে বর্ণ-শংকরের ভয়ে ভীত ছিলেন, সে সংবাদ আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের কথামালার মধ্যে পেয়েছি। বর্তমানেও তার ঢেউ চলছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মার্কিন মুল্লুকে। এখনও শ্রীকৃষ্ণের কর্ম শেষ হয়নি। এখনও আমরা দশ হাজার বৎসর পেছনেই পড়ে আছি।

বৃন্দাবনের প্রধান প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল ভক্তি-চিন্তাধারার প্রভাব এবং সেই সঙ্গে সাদা এবং কালোর সংমিশ্রণ। শ্রীরাধা সাদা, শ্রীকৃষ্ণ কালো, এই নিয়েই গানের এবং কবিতার সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের দেশের কীর্তন সকল ভাবপ্রবণতাকে ছাড়িয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে বলতেই হবে। আমরা গানে 'ওস্তাদ' ও লেকচারে 'ওরেটার' কিন্তু কাজে পশ্চাৎপদ, এই যা গুণ!

উত্তর ভারতের সর্বত্র স্ত্রীলোক এবং পুরুষদের মধ্যে দূরত্ব বেশ

অনুভূত হয়। যদিও উভয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ, তবুও হিমালয়ের মত পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত যেন উভয় শ্রেণীর মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু বৃন্দাবনে সেরূপ কিছুই মনে হয় না। গ্রাম্য লোকের মধ্যে পর্দাপ্রথা যেমন নাই, তেমনি ব্যাভিচার আছে বলেও মনে হয় না।

সন্ধ্যার পর কয়েকটি কুঞ্জে গিয়েছিলাম। যাবার পূর্বে মনে করেছিলাম সেখানে যেয়ে বন-উপবন-শোভিত কুঞ্জ দেখতে পাব। আসলে সেরূপ কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। কুঞ্জ মানে একটি মন্দির। বসবার স্থান প্রশস্ত, সামনেই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। শ্বেতপাথরের রাধার মূর্তিতে সজীবতা মোটেই অনুভব হয় না। কালো পাথরের কৃষ্ণ-মূর্তিতে বেশ লাবণ্য দেখতে পাওয়া যায়। শ্বেতপাথর দিয়ে শ্রীরাধার মূর্তি যতগুলি দেখেছি, সর্বত্র একই নির্জীবতা লক্ষ্য হয়। যদি একটু হরিদ্রাযুক্ত পাথর নিয়ে শ্রীরাধার মূর্তি গড়া হত, তাহলে সম্ভবত ভালই হত।

প্রত্যেকটি কুঞ্জে ভক্তি-রসের চর্চা করা হয়—কোথাও গানে, কোথাও কথকতায়, আবার কোথাও পদ্যে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং গুণগ্রাহীরা বিষয়-বস্তুকে এতই ফাঁপিয়ে তুলেছেন যে, আসল কৃষ্ণের কথা পরিত্যাগ করে নূতন আর এক কল্পিত কৃষ্ণের কথাই বলা হয় বেশি করে। এটা ভাষার দোষ নয়, কথকতার দোষ নয়, এই দোষ ভক্তিমার্গের। ভক্তি দুর্বলতার চিহ্ন, অবাস্তবই হল তার মূল ভিত্তি। এক্ষেত্রে সমালোচনা বৃথা।

কুঞ্জ বেড়িয়ে আসার পথে পথচারীর কথা শুনে মনে হয়েছিল, যতক্ষণ এঁরা মন্দিরে থাকেন ততক্ষণই ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় দেন।

বৃন্দাবনের অলিগলি পথেও বেশ আনন্দই হয়েছিল। এটা বোধহয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে মেলামেশা করারই সুফল। বৃন্দাবনে রাত দশটার পরও দলে দলে স্ত্রীলোককে বেড়াতে দেখা যায় কিন্তু কোথাও কোন যুবতীর পেছনে যুবকদের ঘুরে

বেড়াতে দেখা যায় না। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যখন পিকিনে থাকতে স্বাধীনতার কথা বলতেন, তখন তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার নিদর্শনস্বরূপ বৃন্দাবনকে দেখিয়ে দিতেন। বৃন্দাবনে এসে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখতে পেয়ে আমার মন আনন্দে নেচে উঠেছিল। বৃন্দাবনের তথাকথিত ছোটলোকেরা সেজন্য ধন্যবাদের পাত্র।

বেনে শ্রেণীর লোকের মধ্যে কয়েকজন উন্মত্ত যুবক দেখেছি। তাদের উন্মত্ততা তথাকথিত ছোট জাতের লোক দেখলেই লোপ পায়; কারণ, তারা নিজের হাতে আইনের মানদণ্ড গ্রহণ করে এবং আধ-পাগলা ব্যবসায়ী পুত্রদের 'গাট্টা' মেরে ঠাণ্ডা রাখে। বৃন্দাবন পাণিপথ নয়। পাণিপথের কথা পরে বলা হবে।

বৃন্দাবনের আর একটি বৈচিত্র্য রয়েছে। দু'টুকরা কাঠের মধ্যে তাল উঠিয়ে সেই তালে তালে নৃত্য করা শুধু বৃন্দাবনেই দেখা যায়। গান তাতে নাই, কিন্তু এমন প্রাণমাতানো নৃত্য অনেক সময় বিদিশা করে দেয়! অবশ্য বিদিশা হবার মত অনুভূতি থাকা চাই। শরীরের উত্তপ্ত রক্ত বড়ই তাল পছন্দ করে। রক্ত সজীব এবং চলন্ত; সেই সজীব এবং চলন্ত রক্ত-স্রোতে খঞ্জরী যখন তরঙ্গের সৃষ্টি করে তখন মনে হয়, হাজার বোতল মদের নেশা ঐ খঞ্জরীতে জমাট বেঁধে আছে!

বৃন্দাবনে আসার পর একদল লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁরা আমাকে মুরাদাবাদ যেতে অনুরোধ করেন এবং সেখানে যাবার রেলভাড়া দিয়ে দেন। আমার রেলভাড়া দ্বিগুণ; কারণ, বাইসাইকেলের ভাড়া একজন মানুষের ভাড়ার সমান ছিল।

বৃন্দাবনের 'প্রেম মহাবিদ্যালয়' একটি বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্র। এই শিক্ষাক্ষেত্রের স্থাপয়িতা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবী খাতায় নাম লিখিয়ে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর স্টেট সরকারী তরফ থেকে পরিচালিত হত এবং তাঁরই এক ছেলেকে বৃটিশ সরকার গদিতে বসিয়েছিলেন।

আরামের স্থান ছিল বটে কিন্তু কি কারণে এখানে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী এবং মারাঠি গুপ্তচরের বিশেষ উৎপাত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে সংযুক্ত প্রদেশের অন্য কোনও শহরে তত স্পাই দেখতে পাইনি যত স্পাই এই ধর্মস্থান বৃন্দাবনে দেখতে পেয়েছিলাম। অপরিচিত লোক আমার কাছে সকলেই কিন্তু বিশেষ পরিচিত লোককে যেন ভুলে গিয়েছিলাম! সেরূপ লোক আমার চারদিকে ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের কল্যাণে এখানে চা-বিস্কুট খেয়ে বড়ই তৃপ্ত হয়েছিলাম।

মুরাদাবাদ

তিনদিন বৃন্দাবনে কাটিয়ে আবার মথুরাতে যেয়ে গাড়ীতে বসলাম, উদ্দেশ্য মুরাদাবাদ যাওয়া। দেখলাম এবং বুঝলাম, কেউ আমার পেছন নেয়নি। নিশ্চিন্ত মনে মুরাদাবাদ পৌঁছে একটি ধরমশালাতে আশ্রয় নেবার পরই একজন যুবক কোথা থেকে এল এবং আমার পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করল। বুঝলাম, এদেরই কেহ আমাকে এখানে আসার খরচ দিয়েছিল।

সন্ধ্যার পর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে সেদিনের ডায়রী লিখছিলাম, এমনি সময় তিনজন লোক এলেন এবং নিজেদের বিছানা পেতে বসে পড়লেন। তাঁদের জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল, চীন দেশের কমিউনিষ্টরা কি করে মানুষের সহানুভূতি অর্জন করেছে?

আমি বললাম, "এর উত্তর অতি সহজ বন্ধুগণ! চীনা সৈন্যদের মধ্যে সহানুভূতি বলে যে সদ্‌গুণ, তা মোটেই ছিল না। তারা লুণ্ঠন করত, লোককে হত্যা করত, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিত। কিন্তু চু-তের সৈন্য গ্রামে প্রবেশ করেই দেখত মানুষের অভাব কোথায়? অভাব মিটিয়ে দেবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করত। যেমন, এক গ্রামে গিয়ে তারা দেখল অনেকের ঘরের চাল ভেঙ্গে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ তারা ঘর-মেরামতে লেগে গেল, কেহ কেহ চলে গেল জমির মাটি ওলট-পালট করতে। যারা তাঁতের কাজ জানত, তারা লেগে যেত তাঁতের কাজে।

গ্রামের লোক দেখত এরা চমৎকার লোক, দুই ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের চেহারা বদলিয়ে দিল! এই করেই চীনের চু-তে সাধারণের সহানুভূতি অর্জন করেছেন।"

এইমাত্র বলেই আমি চুপ করলাম। যাঁরা আমার কথা শুনতে এসেছিলেন, তাঁরাও চুপ করতে বাধ্য হলেন।

“সিপাই থা” এই কথাই তাঁরা একটু পরে বলতে আরম্ভ করলেন। দুঃখের বিষয়, তখনকার দিনে মাঝে মাঝে ‘অমৃতবাজার’ পত্রিকাতে চীন-সম্বন্ধে দুই একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হত; কিন্তু সে সব পড়ে চীনের আভ্যন্তরিক অবস্থা কেউ বুঝতে পারত না।

তার পরের প্রশ্ন, “সাধারণ লোক কি করে সময় কাটায়?”

“এরও উত্তর অতি সাধারণ। যেমন করে আমরা দিন হবার পর রাত কাটাই তেমনি করে তারাও সময় কাটায়, তবে দৃষ্টির পার্থক্য রয়েছে। আমরা যেমন করে ভাগ্যদেবীর আরাধনা করি, হাত দেখাই, সৌভাগ্য কবে আসবে জানতে চাই, চীনের লোক তা করে না।”

আমার কথা এঁদের মোটেই ভাল লাগল না, উঠে চলে গেলেন। আমিও স্নান করতে বেরুলাম। স্নানান্তে ডাল-রুটি খেয়ে অন্যান্য দিনের মত ঘুমিয়ে রইলাম। রাত তখন দশটা হবে, এমনি সময়ে হঠাৎ একজন কেরাণী এলেন। তিনি ধরমশালাতে কে কে এসেছে, কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে জানতে চাইলেন। তাঁকে উত্তর দিয়ে, ফরমে নাম দস্তখৎ করে আবার শুয়ে পড়লাম।

পরের দিনও থাকতে হল। যাঁরা গাড়ীভাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের আদেশ। বারটার পর ধরমশালা হতে বের হলাম এবং কংগ্রেস-অফিসে যেয়ে বসলাম। কংগ্রেস-অফিসে যাওয়া মহাবিপজ্জনক কাজ। কংগ্রেস-অফিস তখন সকলের অর্থাৎ সকল রকম মতাবলম্বীর। পুলিশও কংগ্রেসকর্মী হয়ে কংগ্রেস-অফিসে ঘোরাফেরা করত।

সেখানে অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হল। অনেকে ভ্রমণ-কথা শুনতে চাইলেন। কিছু না বললে চলে না, তাই বললাম কিছুটা। এদিকের মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ লোকই কংগ্রেসের কাজ করছিলেন। ধনীরা একেবারে পাঁচ হাত দূরে থাকতেই পছন্দ করতেন।

মুরাদাবাদ কংগ্রেস-অফিস বড়ই উত্তেজনাপূর্ণ; তাতে বিপ্লবী, ভাবুক, সমাজসেবী, ধার্মিক এবং কমিউনিষ্ট, সকলেরই একত্র সমাবেশ দেখে রাজনীতির গুরুত্ব অতি অল্পই অনুভব হয়েছিল।

রাজনীতিতে ধর্মপ্রচারক অথবা সমাজসেবীর স্থান থাকতে পারে না। কমিউনিষ্ট এবং বিপ্লবীদের একত্র সমাবেশও অর্থহীন। উভয়ের গতিপথ ভিন্ন রকমের। বিপ্লবীদের সম্পর্ক সাধারণ মানুষের সঙ্গে কম থাকে, কমিউনিষ্টরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ডুব দিয়ে থাকে। বিপ্লবী সাময়িক, কমিউনিষ্ট চিরন্তন। এদের একত্রে ওঠাবসা দেখে হাসি পেয়েছিল কিন্তু কারো কাছে কিছুই বলতে সাহস হয়নি। এটা যেন একটা আড্ডা অথবা জগাখিচুড়ি!

কমিউনিষ্ট মতাবলম্বীদের প্রতিই রাগ হয়েছিল বেশি, এরা যেন সখের বাক্যবাগীশ! তাদের মিলনস্থান হবে সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে। অতি বিপ্লবী, অতি দেশভক্ত, অতি ধার্মিক এদের পাশ দিয়ে চলাফেরা করতেও কমিউনিষ্টদের দেখা যায় না, তবে কেন এরা এখানে আড্ডা গেড়েছে? এই রকম নানা চিন্তায় মনটা দমে গিয়েছিল। সেই সভাতেই বলে এলাম, আগামীকল্য সকালে এখান থেকে বিদায় নেব। কেউ আপত্তি করল না অথবা আর একদিন থাকতেও বলল না।

মুরাদাবাদ থেকে গাজিয়াবাদ পৌঁছতে মাঝে একদিন থাকতে হয়েছিল। গাজিয়াবাদ হতে কয়েক মাইল পথ বালির ওপর দিয়ে চলতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, পথের ছু'দিকে নলের আবাদ ছিল। পথের ওপর নল ভেঙে পথ চলতে যে কত কষ্ট, সকলে তা বুঝতে পারবে না। সেজন্য দিল্লীতে পৌঁছে ছুটো দিন শুধু শুয়ে থেকেই শরীরের অবসাদ দূর করতে হয়েছিল।

দিল্লী

বিকেলে যখন দিল্লীর দিকে যাচ্ছিলাম তখন একদল গোয়ালা সাইকেলে করে দুধ নিয়ে দিল্লীর দিকে আসছিল। আমিও তাদের সঙ্গেই চলছিলাম।

আমাদের দেশে জাত-বিচার থাকায় গোয়ালাদের বাই-সাইকেল ব্যবহার করা দেখে অনেকের চোখ টাটাচ্ছিল। পথের পাশে এক 'চানা ভাজার' দোকানী আমাকে সে কথাই বলছিল।

দোকানী জাতে ক্ষেত্রী। সে বলছিল, "কি আর বলি বাবু, সময়ের পরিবর্তন হয়েছে! আহীর দুধ বিক্রি করছে, গোয়ালা সাইকেলে শহরে যাচ্ছে, আরও কয়েক বৎসর পরে দেখব চামার পাল্কীতে করে রাজপথে ভ্রমণ করছে!" ক্ষেত্রী মানে যে চাষা হয়, ক্ষেত্রী নিজে তা জানত না, সে মনে করত ক্ষেত্রী মানে ক্ষত্রিয়।

ক্ষেত্রীর উক্তি শুনে তাকে কিছুই বলিনি, শুধু মনে হচ্ছিল এটাই আমার দেশ, এই দেশে থেকে শুধু বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের মনোবৃত্তি অপসারণ করে সেই মনোবৃত্তিকে পরিবর্তন করতে হবে। বিপ্লবই বুঝতাম ভাল, সেইজন্য বিপ্লবের কথাই বার বার মনে হচ্ছিল। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, "Long Live Revolution" মানে কি!

স্বাধীন হয়ে যাওয়া, আর্থিক উন্নতি করা, সবই হয় বিপ্লবের সাহায্যে; কিন্তু মানসিক পরিবর্তনের বিপ্লব ভয়াবহ এবং কঠিন। ১৯০৮ সালে "চাকরের কৃপায় চীনের মুক্তি" নামক প্রবন্ধে ৺মহেন্দ্রনাথ দে, এম্-এ, বি-এস্-সি, লিখেছিলেন, "Depressed Class-এর উন্নতি করতে বৃটেনের মত উন্নত দেশেও দুই শত বৎসর লাগবে।"

ইংলণ্ডে যেয়ে ডিপ্রেস্‌ড্‌ ক্লাস কোথায় রয়েছে এবং তারা কোন্‌ পর্যায়ের মনোভাবে বিরাজ করছে জানতে চেয়েছিলাম। জেনেছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম ৺মহেন্দ্র দে মহাশয় যা বলেছিলেন, তার সবটাই ঠিক। ইংলণ্ডের ধনীরাই হল আভিজাত্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং দারিদ্র্য হল তার অন্যদিক। আমাদের দেশে সেরূপ নয়, আমাদের দেশের অবস্থা পৃথক।

আমেরিকাতে যাবার পর একজন শিলেটি মুসলমান বলেছিলেন, "দেশে যাব কেন বাবু? এখানে তবুও আমি মানুষ বলে পরিচিত; কিন্তু স্বদেশে যদি আমি এক কোটি টাকা নিয়েও ফিরে যাই তবু আমার পরিচয় 'গোলামের ছেলে' ছাড়া আর কিছুই হবে না। 'গোলামের ছেলে' শোনার মত মনোবৃত্তি আর নাই। দেশে ফিরে যাব না, মরতে হয় বিদেশে মরব, উপবাস করে মরব, তবুও দেশে ফিরব না।"

চানা ভাজা খেয়ে ক্ষেত্রীর দোকান হতে সোজা কাশ্মীরী গেইট দিয়ে চাঁদনী চক্‌ হয়ে কয়েকজন বাঙ্গালী যুবকের সহায়তায় একটি বাঙ্গালী মেসে পৌঁছলাম। মেস্‌ পুরাতন এবং দিল্লীর অন্তঃস্থলে অবস্থিত থাকায় সুবিধা হয়েছিল। দিল্লীর পুরাতন মসজিদ, সম্রাটের প্রাসাদ, ঐতিহাসিক তথ্য নূতন করে জানবার মত ইচ্ছা না থাকায় কয়েকদিন মেসে বিশ্রাম করাই ভাল হবে মনে করেছিলাম।

এর পরেই ইচ্ছা হল দিল্লী শাখার গদর পার্টির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে। এঁদের কথা শুনবার জন্যই দিল্লীতে এসেছিলাম। এঁরা ধর্মীয় পার্থক্য কতটুকু পরিত্যাগ করতে পেরেছেন, বৃহত্তর স্বার্থ কতটুকু বোঝেন ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম। আমি ভারতবাসী, যদি নিজের দেশের সংবাদ না জানি তবে বিদেশে যেয়ে কি বলব?

মহাত্মা গান্ধীকে লর্ড উইলিংডন জেলে পুরেছিলেন এবং

কংগ্রেসের সমস্ত নেতারাই তখন প্রায় জেলে ছিলেন। বাংলার 'টেরারিষ্টদের' প্রতি কড়া পাহারা ছিল। কমিউনিষ্টদের নাম-নিশানাও তখন ছিল না। উইলিংডন এক নূতন রামরাজত্ব স্থাপন করেছিলেন!

তখন বাংলার টেরারিষ্ট নাই কিন্তু বাঙ্গালী স্পাই শহর ছেয়ে রয়েছিল। যেখানে যেতাম, এক কি ততোধিক যুবক সব সময়ই আমার সঙ্গে চলত। তাদের অর্থে চা-বিস্কুট হতে আরম্ভ করে সিনেমা পর্যন্ত উপভোগ করতাম। মেসের খরচও বিনা পয়সায় চলছিল। চারদিকেই তখন সুখের রাজত্ব। বাঙ্গালীমাত্রেই আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত। বাঙ্গালী-ক্লাব ছিল নম্বর ওয়ান্ আড্ডাখানা। তাস, পাশা, দাবা অনবরত চলছিল। কলিকাতা হতে দিল্লী পর্যন্ত বাইসাইকেলে করে অনেক বাঙ্গালী যুবক পৌঁছেছিলেন। তাঁদের নিয়েও বেশ আমোদ-প্রমোদ চলছিল।

যদি বুঝতাম এটা ভাঁওতা, লর্ড উইলিংডনকে হত্যার ফাঁদ মাত্র, তাহলে সুখীই হতাম; কিন্তু এটা সত্যিকারের আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গান আর হল্লা। পশ্চিমা শিখ, হিন্দু আর মুসলমানরা বেশ আনন্দে মগ্ন ছিল এই ভেবে যে, বাঙ্গালী বাবুরা দেশ স্বাধীন করবে। এদিকে গুরুদ্বারে শিখ-সম্প্রদায় চঞ্চল হয়ে উঠছিল। তাদের ধর্মীয় উস্কানী দিচ্ছিল স্টেট্স্‌মেন্; লাহোরে মুসলমানদের উস্কানী দিচ্ছিল সিভিল এবং মিলিটারী গেজেট। নন্-কোঅপারেশন্ মুভমেন্ট অনেকটা শিথিল হয়েছিল, লোকের মনে আর উদ্দীপনা ছিল না। মিঃ জিন্না কংগ্রেস থেকে বের হয়ে মুসলীম লীগ গড়েছিলেন। লর্ড উইলিংডন তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাজিমাৎ করেছেন ভেবে সকলেই উৎফুল্ল এবং আনন্দিত ছিলেন।

আঘাত এবং প্রতিঘাত দুটি শব্দ আছে। পৃথিবীর যে কোন জাতের ইতিহাস পড়লেই এই সত্য বুঝতে পারা যায়। সামান্য আঘাতের পরেই প্রচণ্ড আঘাত আসবে, তার ফল ভবিষ্যতে

আরও প্রচণ্ড হবে। বৃটিশ সরকার তা বুঝতে পেরে দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

বেঙ্গলী ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। চাঁদনী চকে একটি বাঙ্গালীর সন্দেশের দোকানে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতাম। সেখানে অনেকগুলি পাঞ্জাবী আসত। তাদের মধ্যে উৎপীড়িত রাজনৈতিকের সংখ্যাই বেশি। একদিন বাঙ্গালীবাবুটি যিনি দোকানের মালিক, তিনি আমাকে সন্দেশ খেতে নিমন্ত্রণ করলেন এবং আমার পরিচয় দেবার সময় যে যে দেশ ভ্রমণ করে এসেছিলাম তার ফিরিস্তি উচ্চকণ্ঠে পড়ে সকলকে শোনাতে কসুর করেননি।

এই ঘটনার পরই আমার সঙ্গে পাঞ্জাবীরা কথা বলতে আরম্ভ করেছিল। এদের অতি উৎসাহ, অল্প জেনে সবজান্তা এবং বৃটিশ সরকারকে কাবু করতে কতক্ষণ—এসব ফাঁকা কথা আমার কাছে মোটেই ভাল লাগছিল না। এদের দৃষ্টি ছিল জাপানের দিকে। জাপান এদের স্বাধীনতা এনে দেবে, জার্মানী সাহায্য করবে ইত্যাদি মনোবৃত্তি মনে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল।

যারা জাপান দেখেনি বা জাপানীদের ইতিহাস জানে না, তারাই এরূপ মনোভাব পোষণ করে। একদিন এদেরই একজনকে গোপনে বলে দিলাম, বৃটিশ সরকার যেমন সাম্রাজ্যবাদী, জাপানীরা তেমনি উগ্র সাম্রাজ্যবাদী (National Socialist). জাপানীরা তাদের চেয়ে একচুল কম সাম্রাজ্যবাদী নয়।

যাঁর কাছে কথা বলছিলাম, তিনি ন্যাশনেল সোসিয়েলিষ্ট কাকে বলে অথবা উগ্র সাম্রাজ্যবাদী কি, কিছুই জানতেন না। তখন বাধ্য হয়ে বোঝাতে হয়েছিল উগ্র সাম্রাজ্যবাদী এবং ন্যাশনেল সোসিয়েলিষ্ট একই কথা। তবুও লোকটার মনোভাব একটুও পরিবর্তিত না হতে দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম। ক্রমে ক্রমে এদের আড্ডায় যাওয়াও বন্ধ হয়েছিল। আমার যা জ্ঞাতব্য বিষয় তাই জেনে তৃপ্ত হয়েছিলাম।

শরীর তখনও দুর্বল ছিল; কয়েকদিন পূর্ণ বিশ্রামের পর নূতন দিল্লীতে এক ভদ্রলোকের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেখানে বিশ্রাম উত্তম রূপেই হয়েছিল।

পূর্বেই বলেছি, পুরাতন ইমারত, দিল্লীর বাদশাহের প্রাসাদ আমার কাছে তামাসার বিষয় ছিল। পিকিন যাঁরাই দেখেছেন তাঁদের কাছে লালকিল্লা এবং সম্রাটের প্রাসাদ হাস্যকর বলেই মনে হবে। দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদ দেখিয়ে অনেকে বলেন, এত বড় বিল্ডিং পৃথিবীতে ক'টা আছে? পিকিনের 'ফরবিডেন্ সিটির' 'হেভেন্ টাওয়ার' এর চেয়ে বড় বলেই মনে হয়। পৃথিবীর পুরাতন বিল্ডিং-এর কিছু দেখেছিলাম বলেই তুলনা করতে সক্ষম হলাম।

দিল্লী ছেড়ে যাবার সময় হল। একদিন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পাণিপথের দিকে রওয়ানা হতে হল। দিল্লীর আভিজাত্য আমাকে আটকিয়ে রাখতে পারল না। মাঝে মাঝে মনে হত একটা পারসী কবিতা। একজন গাইড বলেছিল, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে এখানে আছে। কবিতা পারসী ভাষায় দিল্লীর কোনও দেওয়ালে লেখা আছে, তারই অনুবাদ করে সে আমাকে শুনিয়েছিল। তখনকার দিনের পক্ষে বোধহয় এটাই ছিল স্বর্গ। এই ধরণের কথা মনে হলেই আপনা হতে হাসি পেত আর ভাবতাম কবি ঠিকই বলেছেন, Ignorance is bliss.

দিল্লী হতে রওয়ানা হয়ে সোনেপথ নামক স্থানে এসেই বসলাম একটি মস্ত বড় দীঘির ধারে। লোকজন নাই। আশে-পাশে একটি গ্রামও দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, এই দীঘির বাঁধানো ঘাটেই আজ বিশ্রাম করা যাবে, স্নানেরও বেশ সুবিধা রয়েছে। সর্বপ্রথম স্নান করে সিঁড়িতে বসে প্রায় ধ্যানমগ্ন হতে চলছিলাম। এখানে 'ধ্যান' কাকে বলে বলছি। যাকে আমরা বলি গভীর চিন্তায় মগ্ন, তাকেই বলা হয় ধ্যানমগ্ন।

ঠিক সেই সময় এক সাধু আমাকে ডাকলেন। সাধু মানেই

পরনির্ভরশীল, এর আবার ডাকাডাকি কিসের? তবুও জিজ্ঞাসা করলাম, "কি চাই? তোমার পর্ণকুটিরে চা পাওয়া যাবে কি?"

সাধু সহাস্য বদনে বললেন, "সব ঠিক, শুধু তুমি এলেই হয়।"

গেলাম সাধুর ঘরে, দেখলাম চায়ের কাপ হতে ধোঁয়া উঠছে। একটি পেয়ালা দেখিয়ে সাধু বললেন, "এটা তোমার, অন্যটা আমার।" উভয়ে চা খাবার পর সাধুকে একটি সিগারেট দিয়ে বললাম, "নিন, এটা আপনার।" সাধু সিগারেট নিয়ে, সিগারেটের কাগজটা ফেলে দিলেন, তামাকটুকু মুখে দিলেন। বুঝলাম এটাই হিন্দুস্থানীদের প্রথা।

সিগারেট ফুঁকবার সময় চিন্তা করছিলাম এখানেই মোংগল, পাঠান, রাজপুত, মারাঠারা যুদ্ধ করেছিল, বোধহয় এখানেই কুরু এবং পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। সবই 'বোধহয়'-এর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সঠিকতা একটুও অনুভব করতে পারছিলাম না। সাধুও আনমনে কি চিন্তা করছিলেন! হঠাৎ সাধু বললেন, "তুমি বড়ই কামুক।"

আমি হেসে ফেললাম এবং বললাম, "কৃষ্টিতে আবদ্ধ কামকে কামনা বলে, কাম নয়। আমার তাই আছে, এসব বাজে কথা বলে লাভ হবে না সাধু মহারাজ!"

আমার হাতের মধ্যে এমন কতকগুলি চিহ্ন আছে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে না, যেমন ভ্রমণ-চিহ্ন কামনা-চিহ্নকে একেবারে কেটে রেখেছে। বোধহয় সাধু মহাশয় সেই চিহ্ন দেখেই বাহবা অর্জন করতে চাইছিলেন। চা খেতে ডেকে আনাও ফন্দিবিশেষ। ভাবছিলেন, একেবারে শিষ্য করে ফেলবেন; কিন্তু আমার মানসিক অবস্থা অন্য স্তরে চলে গিয়েছিল, সাধু মহাশয় তা অবগত ছিলেন না।

একটি টাকা দিয়ে বললাম, "ডাল-রুটির ব্যবস্থা করুন মহারাজ,

ভোজন-পর্ব এখানেই সমাপ্ত করা যাবে।" একটি টাকা পেয়ে সাধু খুশী হলেন এবং ভোজনের ব্যবস্থা আরম্ভ করলেন।

বিকালে সাধুদের জমায়েত আরম্ভ হল। সাধুদের বাক্যালাপ কি হয় শুনবার জন্য উৎসাহী হলাম। আগন্তুক সাধুরা রোতক জেলার অনেক স্থান পরিভ্রমণ করে এসেছেন। কেহ বললেন, হনুমানজীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন; কেহ বললেন, অশ্বথামার দর্শন মিলেছিল এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করার সাধুর সংখ্যাই বেশি। গঞ্জিকার কল্কি হাতে হাতে ঘুরতে থাকল। অনেকক্ষণ পরে রান্না অর্থাৎ রুটি আর ডাল রান্না করে ভোজনপর্ব সমাপ্ত করা গেল।

এরূপ জীবনকেই ভবঘুরে জীবন বলা যেতে পারে। চিন্তা-ভাবনা মোটেই নাই; শুধু খাওয়া, ঘুমানো আর ভিক্ষা করা। সাধুদের সঙ্গে রাত আরামেই কেটে গেল! পরের দিন সকালে পাণিপথের দিকে রওয়ানা হবার পূর্বে সাধু আমাকে আশীর্বাদ করতে এলেন। তাঁর আশীর্বাদ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "এসব বুজরুকি অন্যের সঙ্গে করবেন, এই নিন্ দু'আনা পয়সা।"

সাধু দু'আনা পয়সা নিয়ে সন্তুষ্ট হলেন। কবি মুকুন্দদাস বলেছিলেন, "আশীর্বাদ মানেই 'আশীর্বাদং শিরচ্ছেদং বংশনাশং দিনে দিনে'!"

পাণিপথ

সেদিনই বিকালে পাণিপথে পৌঁছে একটি ধরমশালাতে আশ্রয় নিলাম। ধরমশালা জৈনদের এবং সেখানে তিন রাত থাকতে দেওয়া হয়। দ্বারওয়ান চারপাইএর উপর জাজিম বিছিয়ে দিল। তার ধারণা, আমি দারোগা সাহেব। আমিও নিজের পরিচয় দেওয়া ভাল মনে করলাম না। আমার সঙ্গে চাদর থাকত। জাজিমের উপর চাদর বিছিয়ে বিশ্রাম করতে বসেছি এমনি সময় স্থানীয় টেক্‌নিকেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধরমশালায় এলেন।

তিনি জাতে বাঙ্গালী। আমার পরিচয় পেয়ে বললেন, "চলুন আমার বাসায়।" তাঁর বাসায় যেতে সম্মত হলাম কিন্তু রাত কাটাব না জানালাম। রাত্রে তাঁর ঘরেই খেলাম এবং পরের দিনও যেন থাকি অনুরোধ করলেন, সেই সঙ্গে বললেন এখানে অনেক কিছু দেখার আছে।

ধরমশালাতে ফিরে আসামাত্র কয়েকটা দৃশ্য দেখে মনে হল স্থান ভাল নয়, তবুও থাকতেই হবে। রুমে যেয়ে এত গরমের মধ্যেও দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে রইলাম। পাণিপথ কামনার স্থান। কত রাজা, সম্রাট, বাদশা নিজের কামনা পূর্ণ করবার জন্য এইখানেই নিজেদের রক্ত দিয়েছেন! কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধও এখানেই হয়েছিল। সেই যুদ্ধভূমিতে কামান্ধ মানুষের সমাবেশ যদি হয় তবে দুঃখের কোনও কারণ নাই।

পরের দিন দশটার সময় একটি ছাত্র এল। সে বলল, তার মাষ্টার মহাশয় আমাকে নেবার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন। সাইকেল নিয়ে বের হাত যাব এমন সময় ছাত্রটি বললে, "হেঁটে যাবেন, আমি সাইকেল নিয়ে আসিনি।"

রুমের মধ্যে সাইকেল রেখে তালা বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রের

সঙ্গে রওয়ানা হলাম। ছাত্র আমাকে নিয়ে চলল পেছনের গলি দিয়ে। প্রতিবাদ করাতে সে বলল, "এটা শর্টকাট্ রোড দিয়ে চললাম।"

প্রায় বাড়ির পেছন দরজাতেই পাঠান দ্বারওয়ান। দুর্গন্ধময় পথে চলতে মোটেই ইচ্ছা হল না। অবশেষে ছাত্রটিকে বললাম, "বড় পথ দিয়ে চল। একটু বেশি হাঁটব তাতে ক্ষতি কি?" ছাত্র সম্মত হল, আমরা বড় পথ ধরে বিদ্যালয়ে গেলাম।

মুখার্জি মহাশয়কে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে?" তিনি বললেন, "তেমন কিছু হয়নি। বিকালের চা খাওয়া আমার ঘরে হবে না, আপনাকে এই ছাত্রটিই চা খেতে নিয়ে যাবে।"

আমার ধারণা হল, তিনি বোধহয় পাণিপথ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শুনে খুশী হননি। কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতা আর কি হতে পারে?

দ্বিপ্রহরে তাঁর বাড়িতে খেয়ে বেলা তিনটার সময় একটি চায়ের দোকানে গেলাম। দোকানের সামনেই লেখা রয়েছে "গোমাংসের কাবাব এখানে বিক্রি হয়।" উর্দূ আমি জানি না, ছাত্রটি জানত। দোকানের সামনে এসেই বলল, "এই দোকানে গোমাংসের কাবাব বিক্রি হয়, ঐ দেখুন লেখা রয়েছে।"

"তুমি জান আমি গোমাংস খাই না; তবে কেন এখানে নিয়ে এলে?" ছাত্রকে বললাম।

"মাষ্টার সাহেবের আদেশ, চলুন ভেতরে যাই।" ছাত্রটি আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল।

দেখলাম, যারা খাচ্ছে সবাই লালা শ্রেণীর লোকের ছেলে এবং বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে যাচ্ছে। তখন বুঝতে পারলাম ব্যাপার কি এবং কেন মুখার্জি মহাশয় আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

ছাত্রকে বললাম, "তুমি এখন যেতে পার, আমি এখানে চা

খেয়ে সোজা ধরমশালাতে যাব। হেড্মাষ্টার মহাশয়কে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।"

ছাত্রটি চলে গেল। অনেকক্ষণ বসে চা খেলাম এবং হিন্দু ছেলেদের তৃপ্তির সহিত গোমাংসের চপ্-কাটলেট এবং কাবাব খেতে দেখে তার কারণ নির্ণয় করে নিলাম। মুখার্জিকে বলেছিলাম, নৃতত্ত্ব অবগত আছি। সেই নৃতত্ত্বে কতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তারই পরীক্ষা নেবার জন্য সন্ধ্যার পূর্বেই মুখার্জি এলেন। সর্বপ্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কেমন আছি, মনের অবস্থা কিরূপ এবং আগামীকল্য এখান থেকে রওয়ানা হব কি না।

উত্তরে বললাম, "আগামীকল্য সকালে নিশ্চয়ই রওয়ানা হব এবং যা দেখলাম তাতে মনে হয়, এটা নৃতত্ত্ব নয়, অন্য কিছু। নৃতত্ত্বের সঙ্গে রক্তের বিশ্লেষণের সম্বন্ধ রয়েছে, এটা যে খাদ্য নিয়ে কথা!"

মুখার্জি বললেন, "এটা আরও কঠিন সমস্যা, সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত নয়। আজ আপনি ভাত খাচ্ছেন না, এক বৎসর কিম্বা দশ বৎসর নাও খেতে পারেন; কিন্তু ভাতের প্রতি আপনার আগ্রহ থাকবেই। মাংসও তদ্রূপ সংস্কারের বহির্ভূত, রক্তের প্রভাবের সঙ্গে সংযুক্ত।"

আমি বললাম, "না মহাশয়, এটা নিতান্ত বাজে কথা, রক্তের প্রভাব শুধু শরীরেই দেখা যায়। সংস্কারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই, এর একটি চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দেখেছি। একটি তামিল শিশুকে একজন চীনা মহিলা ছোটবেলা হতে প্রতিপালন করেন। সে চীনা ভাষা বলত; চীনা খাদ্য খেত। তামিল খাদ্য যদি কেউ তাকে দিত তবে বেশি খেতে পারত না।

এই ক্ষেত্রে রক্তের প্রভাব নাই, রয়েছে সংস্কার মাত্র। ছেলেবেলা হতে যে ভাষায় এবং যে খাদ্যে অভ্যস্ত হওয়া যায়, সেই ভাষা এবং সেই খাদ্যই দেহ সহ্য করে নেয় ও বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর

হয়; কিন্তু তামিল ছেলে কোনো মতেই তার শরীরের রং চীনাদের শরীরের রংএর মত করতে পারবে না। এতগুলি কুদৃশ্য দেখিয়ে আপনার মতবাদ কোনো মতেই সফল হল না; তবু যা দেখিয়েছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

এটা পাণিপথ এলাকা, এখানে ব্যভিচার, বীভৎসতা হবেই। এই জায়গা যুগ-যুগান্তরের লালসা-তৃপ্তির স্থান। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হতে আরম্ভ করে তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধ পর্যন্ত ছোট-বড় সকলেই এই মহান্ ক্ষেত্রে আত্মবলিদান করে নিজের ভোগ বাসনার উপকরণ সংগ্রহ করতে চেয়েছিল। বর্তমানে এখানে যারা বসবাস করছে, তারা কেন আত্মচরিতার্থ হতে বা যাবে?"

অধ্যাপক মুখার্জি বাঙ্গালী, আমিও বাঙ্গালী। মুখার্জি ব পড়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, আর আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি চোখে দেখে। পার্থক্য এখানেই। তিব্বতী দেবতাগুলির ছবি যখ চীনের অভ্যন্তরে দেখতে পেয়েছিলাম, তিব্বতী এবং ককনরে লামাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখন থেকে, তন্ত্র এ তান্ত্রিকদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

হ্যাঁ, স্বীকার করি মন্ত্রের প্রভাব আছে কিন্তু অপরের উপর সে প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। নিজেকে বোবা করে রাখা চলে, তাতে নিজের ক্ষতি হয়, অপরের ক্ষতি হয় না। উপরন্তু সব কিছু মধ্যেই যে অধ্যাত্মবাদ আত্মগোপন করে আছে, আমার তা মনে হয় না। তাই যদি হত, তবে অতি সহজে মালয়, শ্যাম এব ইন্দোনেশিয়া হতে শৈবইজম্ লোপ পেত না। মানুষ বুজরুকী ভালবাসে যতক্ষণ প্রাচুর্য থাকে। প্রাচুর্যের অভাবে বুজরুকী লোপ পায়, মনের দুঃখে মুখার্জিকে একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। কুশিক্ষার মধ্যে প্রাচুর্য কুপথে নিয়ে যাবেই।

পাণিপথ পর্যন্ত হিন্দী ভাষার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়

তারপর থেকে আটক নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত পাঞ্জাবী ভাষা প্রচলিত। পাঞ্জাবী ভাষা শুধু শিখরাই গুরুমুখী অক্ষরে লিখে; যারা দেবনাগরী এবং ফারসী অক্ষর ব্যবহার করে, তাদের কথ্য ভাষাই শুধু পাঞ্জাবী, লিখবার সময় হিন্দী এবং পারসী অক্ষরে উর্দুই লেখা হয়। দুঃখের বিষয়, পাঞ্জাবীরা তাদের মাতৃভাষা নিজের অক্ষরে লিখে না। বর্তমানে শিখরা যে অক্ষরে গুরুমুখী লিখে, সেই অক্ষরের অন্য সংস্করণই হল দেবনাগরী।

মুসলমানেরা পাঞ্জাবী অক্ষর ব্যবহার করে না, শিখদের প্রতি তাদের আক্রোশ আছে সেইজন্য। তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পাঞ্জাবী অক্ষর ব্যবহার করে না, শিখদের প্রতি তাদের সহানুভূতি না-থাকার জন্য। শেষ কথা হল, বৃটিশ সরকারও পাঞ্জাবী অক্ষর স্বীকার না করে পাঞ্জাবে পারসী অক্ষরই স্বীকার করেছিল। প্রকৃত পক্ষে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান এবং সিন্ধে পুরাতন পুস্তিকাগুলি দেখলেই পাঞ্জাবী অক্ষরের হদিশ পাওয়া যায়।

পাণিপথ ছাড়বার পরই পাঞ্জাবী ভাষাভাষীদের দেশে পৌঁছে গেলাম এবং নূতন আচার-ব্যবহারের দেখা পেলাম, একথা আমাকে সর্বপ্রথমই স্বীকার করতে হবে।

জলন্ধরে পৌঁছে যে ধরমশালাতে স্থান নিয়েছিলাম সেই ধরমশালা রেল-স্টেশনের সন্নিকটে এবং জি. টি. রোডের উপরে অবস্থিত থাকায় নানারকম লোকের দর্শন পাওয়া যায়।

তখনও বেলা একটা হয়নি, ধরমশালাতে প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম, একজন লোক অবিকল বাঙ্গালী প্রথায় চালকলার নৈবেদ্য সাজিয়ে কোনও দেবতার নামে উৎসর্গ করে চলে গেল। চালকলার উপর লক্ষ লক্ষ মাছি বসে মুহূর্তের মধ্যে থালাটাকে কালো করে ফেলল। কতক্ষণ পর লোকটা পুনরায় এল এবং বেশ করে চালকলা মেখে তাই খেয়ে নিলে। কত রোগের বীজ যে তাতে ছিল, নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

এই চালকলা-মাখা খেয়ে লোকটার কি অবস্থা হয়েছিল বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ; কারণ, পরের দিন সকালে এমন এক গ্রামে বাস করতে গিয়েছিলাম যে গ্রামে কোনও ধরমশালা ছিল না। একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বাড়িতেই থাকতে হয়েছিল, তিনি আসলে আর্যসমাজী। গ্রামে হিন্দু, শিখ এবং মুসলমান বাস করে। এদের নিয়ম হল, প্রত্যেকেই নিজ নিজ জমিতে মলমূত্র ত্যাগ করে। স্ত্রীলোকেরাও এই নিয়ম পালন করেন।

নিজের সাক্ষাৎ কাকাকে নাম ধরে ডাকা এবং পিতা-পুত্রে একই হুঁকোয় পালাক্রমে তামাক খাওয়া হিন্দুদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। যারা নিজের বাবার সাক্ষাৎ ভাইকে নাম ধরে ডাকতে পারে, তারা নিজের বড় ভাইকে নাম ধরে ডাকবে তাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকতে পারে ?

মুসলমানরা কিন্তু কাকাকে অথবা বড় ভাইকে নাম ধরে ডাকে না, তারা আমাদের নিয়মই মেনে চলে। বর্তমানে আমরা এবং

ভারতীয় মুসলমানেরা যেভাবে কাকা, বড় ভাই অথবা গ্রাম-সম্পর্কিত আত্মীয়দের ডাকি, সেই নিয়ম প্রথমতঃ ইরাণে ফার্সদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় পার্শিদের পূর্বপুরুষেরা ফার্স নামে দক্ষিণ পারস্যে পরিচিত ছিলেন। উত্তর পারস্যের লোক ফার্সদের পরাজিত করেন এবং তাঁদের দেশ জয় করেন। এটাই ইতিহাস, সেই ইতিহাসের ক্ষয়িষ্ণু প্রতিভা এখনও সুদূর উত্তর ভারতবাসীরা মেনে চলেছে। মহাভারতে কিন্তু কাকা এবং বড় ভাইকে নাম ধরে ডাকতেই দেখা যায় অবশ্য কাশীরাম দাসের মহাভারত এক্ষেত্রে অব্যবহার্য!

ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বড় ভাইয়ের সামনে চলাফেরা করতে, কথা বলতে, ঝগড়া করতে এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেও দেখেছি, এই নিয়ম শিখ এবং হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। ছোট বড় ভাইকে ভাইয়ের স্ত্রীকে মা সম্বোধন করতে দেখা যায় না, তবে সম্মান-সূচক বিশেষণ যথা 'তুমি' ব্যবহার করতে শোনা যায়।

মহারাষ্ট্র, গুজরাত, সৌরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারতে একই নিয়ম। আমরা ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে 'মা' সম্বোধন করি, এই যে নিয়ম, সে নিয়ম আমাদের নিজস্ব কি বিদেশাগত, নৃতত্ত্ববিদ্ তা নির্ধারণ করবেন।

অমৃতসহর

জলন্ধর হতে সোজা চলে যাই অমৃতসহর। এই শহরের ঐতিহ্য যদিও আধুনিক তবুও দেখবার এবং শোনবার মত অনেক কিছু রয়েছে। সর্বপ্রথমই হল জালিওয়ানওয়ালা বাগ। বাগ বলতে বাগিচা বোঝায় কিন্তু যথাস্থানে গিয়ে দেখলাম, একটিও বৃক্ষ নাই ; পূর্বে হয়ত ছিল এবং জায়গাটাও বিশেষ বড় নয়।

এই বাগে প্রায় তিন সহস্র লোক প্রাণ দিয়েছিল। জেনারেল ও'ডায়ার এখানেই নরহত্যা করে ভারতবাসীদের বুঝিয়ে দিয়েছিল স্বাধীনতা পাওয়া অতি সোজা নয়। আবার উধম সিং-ও এই এলাকারই লোক। তিনিও দেখিয়ে দিয়েছিলেন নরহত্যা করে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকা যায় না। অবশ্য সেজন্য বৃটিশ ডিমোক্রেসীকে ধন্যবাদ দিতে হবে। ও'ডায়ার যদি আমাদের দেশে থাকতেন তবে তাঁকে উধম সিং-এর পক্ষে হত্যা করা সম্ভব হত কি না, বলা বড়ই শক্ত। ইংলণ্ডে ছিলেন বলেই উধম সিং তাঁকে হত্যা করতে পেরেছিলেন।

জালিওয়ানওয়ালা বাগ দেখতে যাচ্ছি শুনে কতকগুলি লোক আমার পেছন নিয়েছিল। কিন্তু যখন আমি স্বর্ণ-মন্দির দেখতে রওয়ানা হলাম, কেউ আমার পেছন নেয়নি। একটা মস্ত বড় পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি একতালা বাড়ী, তার ছাদের ঠিক মধ্যস্থলে মস্‌জিদের ধরণে গম্বুজ রয়েছে। সেই গম্বুজ সোনার পাত দিয়ে মোড়া। মহারাজা রঞ্জিৎ সিং এই কাজ করে অমর হয়ে রয়েছেন।

এই বাড়ীকে মন্দির বলা হয়। Sikh Temple হতেই বোধহয় শিখ-মন্দির শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। শিখরা কিন্তু মন্দির বলে না। তারা যে কি বলে, তাও জানবার চেষ্টা করিনি। সর্বসাধারণ লোককে গুরুদ্বার অথবা গুরুদোয়ারা বলতে শুনেছি।

শিখ-মন্দিরের অনুকরণে এখানে আর একটি মন্দির তৈরী হয়েছে যার নাম তুর্গীয়ানা। সবই শিখ স্বর্ণ-মন্দিরের মত কিন্তু পুকুরে জল এবং ঘরটার উপর স্বর্ণপাতের আবরণ না থাকায় শিখ 'গোল্ডেন টেম্পেলে'র সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি।

তুর্গাবাড়ীর অন্য শব্দই বোধহয় তুর্গীয়ানা। এখানে সন্ধ্যার পরই লোক-সমাগম হয় এবং যারা গাঁজা এবং ভাঙ্গ খায়, তাদের সংখ্যাই বেশি। নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে বেসুরো গান গাইতে প্রায়ই দেখা যায়। তুর্গীয়ানা মন্দির স্থাপন করেছেন কয়েকজন সনাতনী ব্রাহ্মণ।

এদিকে ব্রাহ্মণের প্রভাব খুবই কম শোনা যায় ; কারণ, ফতে সিং এবং জরওয়ার সিং নামক তুইজন শিখ গুরুপুত্রকে কোনও এক ব্রাহ্মণ সে যুগে মোগল শাসকের হাতে দিয়েছিল। মোগল শাসক তাদের উভয়কে দেওয়ালে প্রোথিত করেছিলেন। তার ফলে আজও যদি কেউ ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়, তাহলে লোকেরা অমনি মুখ ফিরিয়ে বলে 'বিশ্বাসঘাতকের জাত !'

তুর্গীয়ানার অন্য নাম বিশ্বাসঘাতকদের মন্দির। মন্দিরের ইত্যাকার বদ্‌নাম শোনার পরও আরও তুইবার সেখানে গিয়েছিলাম ; কারণ, শুনেছিলাম এখানে দোয়ারার লোক সমবেত হয় বিপ্লবী গান গাইবার জন্য।

অমৃতসহরের পাশেই আর একটি ধর্মস্থান রয়েছে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের গুরু সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোক প্রায়ই ইংরেজী শিক্ষিত এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি জাতক্রোধ। সেজন্য, মুসলমান, হিন্দু এবং শিখ সকলকেই এরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। তাদের নিজেদের অবতার আছেন।

শোনা যায়, সেই অবতারকে কাবুলীরা কাবুলে অর্ধেক শরীর মাটিতে প্রোথিত করে অবিরত পাথরের ঢিল ছুঁড়ে হত্যা

করেছিল। স্যর জাফরউল্লা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের লোক নিজের সম্প্রদায়ের লোককে যথাসর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করে, এটাই এদের বিশেষত্ব। এই সম্প্রদায়ে অনেক হিন্দু যোগ দিয়েছে শোনা যায়।

অমৃতসহর এবং লাহোরের মধ্যস্থলে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের উল্টো পিঠ দেখতে পাওয়া যায়। সেই সম্প্রদায়কে বলা হয় 'রাধেশ্যাম সম্প্রদায়'। এই সম্প্রদায়কে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছি। এদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, যে কোন অবতারবাদী সেই সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারে। এরা কালো এবং সাদার উপাসক। কালো হলেন শ্রীকৃষ্ণ, আর সাদা হলেন শ্রীরাধা।

যদিও তারা রাধাকৃষ্ণের উপাসক তবুও তাদের আধ্যাত্মিক (অন্তরের কথা) তত্ত্ব হল কালো-ধলায় সমন্বয় করা। একজন হরিজন যদি সেই সম্প্রদায়ে যোগ দেয়, তাহলে আর সে হরিজন থাকে না, একেবারে রাধেশ্যামী হয়ে মালদার অর্থাৎ বিত্তশালীতে পরিণত হতে পারে। এরা নূতন কন্‌ভার্টের আর্থিক দুর্গতি যাতে অপসরণ হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে বাধ্য।

অমৃতসহরে আসার পর এই কয়টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রকমে মিশতে পেরেছিলাম। যে সকল সম্প্রদায়ের কথা এখানে হয়েছে, সেই সম্প্রদায়গুলি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় জন্মগ্রহণ করেনি। আপনা হতেই এদের জন্ম হয়েছিল ; কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগে হত্যাকাণ্ড হবার পর এদের বেশ উন্নতি হতে থাকে। যখন কোনও মহান্ বিষয় অধঃপাতে যেতে থাকে তখন ক্ষুদ্র এবং স্বতন্ত্রবাদীরা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এবং সমাজে বড় রকমের অনিষ্ট করে থাকে। এই ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির মাধ্যমে বৃটিশ বিদ্বেষ অনেকটা দূর হয়েছিল।

অমৃতসহর হতে লাহোর মাত্র বত্রিশ মাইল কিন্তু তাপমান-

যন্ত্রে সেদিন একশত আট ডিগ্রী উত্তাপ থাকায় পথ চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝে 'লু' বাতাস নাকে-মুখে লাগছিল; তার ফলে বুঝতে পারছিলাম পাঞ্জাবের লোক কেন পাগড়ী ব্যবহার করে! মাথায় হ্যাট্ ছিল কিন্তু যখনই হ্যাটের ছিদ্রপথে 'লু' বাতাস প্রবেশ করে মাথায় লাগছিল তখনই মনে হচ্ছিল, মাথার চামড়া যেন জ্বলে যাচ্ছে! দেরী না করে সঙ্গের খদ্দরের চাদরখানা বের করে আরবী-ধরণে মাথা এবং নাক-মুখ জড়িয়ে তার উপর হ্যাট্ চড়িয়ে পথ চলতে আরম্ভ করি।

এত প্রশস্ত এবং প্রসিদ্ধ রাজপথে নয়টার পর আর মানুষের দেখা না পেয়ে মনে করেছিলাম, এর পর থেকে রাত্রে ভ্রমণই ভাল হবে। তখনও এগারটা বাজেনি, রাজপথের পাশেই একজন প্রৌঢ়কে বট গাছের নীচে বসে থাকতে দেখে তার কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কি লু বাতাসে কোনও ক্ষতি হয় না?" তিনি এক কথায় উত্তর দিলেন, "না।"

আমরা ভারতবাসী, এক কথায় উত্তর দেবার লোক আমরা নই। শিক্ষিত পাঞ্জাবীরাও উচ্চস্বরে কথা বলে, কিন্তু এই স্বল্পভাষী ভদ্রলোক যে কণ্ঠে 'না' কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল এঁর বিশেষত্ব আছে।

এই পথে পূর্বেও ভ্রমণ করেছিলাম কিন্তু বাইসাইকেলে নয়, ট্রেনে করে। এবার বাইসাইকেলে উত্তাপের মধ্যে ভ্রমণ করায় জাকোবাবাদের উত্তাপ কিরূপ, কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। শরীরে বেশ শক্তি ছিল, বারটার পূর্বেই লাহোরের হীরামণ্ডিতে আমাদের কালীবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি।

লাহোর

লাহোর পৌঁছে হীরামণ্ডির কালীবাড়িতে ওঠাই আমার সঙ্গত মনে হয়েছিল। কারণ, কালীবাড়ির ঠাকুর মহাশয় আমার পরিচিত ছিলেন; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, বেলুচিস্থান এবং পারস্যে পল্টনী কাজ করার সময় তাঁর বাড়িতেই উঠতাম।

ঠাকুর মহাশয় আমাকে দেখেই কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, তাঁর বড় ছেলেটি সাধু হয়ে কোথায় চলে গেছে। কি করে সান্ত্বনা দিতে হয় জানতাম না, সেজন্য নির্বাক থেকে কতক্ষণ পর বলেছিলাম, "দুঃখু করে কি আর হবে? যা' হবার হয়েছে।"

রাত্রে অনেক বাঙ্গালী কালীবাড়ির আঙ্গিনাতে ঘুমোতেন। সেদিন রাত্রেও অনেক ভদ্রলোক এসেছিলেন। গরমের কথাই বলা-কওয়া হচ্ছিল। একজন ভদ্রলোক বলছিলেন, " 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' বড়ই বাজে সংবাদ দেয়; আজকের টেম্পারেচার কমের পক্ষে একশত পনের হবে। আগামীকাল কাগজ খুলে দেখবেন, সেই একশত আট ডিগ্রীর বেশি একটি কথাও লেখেনি।"

আর এক ভদ্রলোক পাঞ্জাবী ভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন, "গরম আর ঠাণ্ডা এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই; আগামী কাল বোধহয় শিখ আর মুসলমানে একচোট হবে।"

সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, "বিষয়টা কি বলুন!"

ভদ্রলোক একটু রসিক, তিনি চুপ করে থাকলেন। তাঁকে চুপ করতে দেখে অনেকেই হতাশ হলেন। একজন ভদ্রলোক আর শুয়ে থাকতে পারলেন না, চারপাইএর উপর বসে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "ও মিত্তির, মরে গেলে না কি? শিখরা কি করেছে?"

মিত্তির মশায় বললেন, "গুরু নানকের আমলের কি কি হাবিজাবি জিনিস এক মসজিদের পাশে মাটি খোঁড়ার সময় পাওয়া গেছে। শিখরা দাবী করেছে এই মসজিদ্ শিখদের। যা' হবার তাই হয়েছে।"

"আরে ও মিত্তির, এতে তোমার হাত কতটুকু ছিল ?"

"বাজে কথা বলো না কাশীনাথ! যা' বলেছি এর বেশি আর কিছু বলার নেই।"

আমার পাশেই ঘাটালের এক চট্টোপাধ্যায় শুয়েছিল। বয়স কুড়ি-পঁচিশ হবে, ক্যানভাসারের কাজ করে। চট্টোপাধ্যায় আমাকে একটা খোঁচা দিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, আমি বাঁ-হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে দিয়ে কিছু না-বলতে ইঙ্গিত করে যেমন শুয়েছিলাম তেমনি শুয়ে রইলাম।

মিত্তির এবং কাশীনাথ-সংবাদ এই পর্যন্ত শোনার পর আর কিছু শুনতে পেলাম না। ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠতেই চট্টোপাধ্যায় বললে, "গত রাতে মিত্তির-কাশীনাথ সমালোচনা শুনেছেন নিশ্চয়ই, এর কি প্রতিকার বলুন ?"

আমি বললাম, "কোথায় বঙ্গদেশ আর কোথায় লাহোর! এখানে এসেও বাঙ্গালী চাতুরীর পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, এর বেশি আমারও কিছু বলার নেই। তোমার বাড়ী ঘাটাল বলেছ অর্থাৎ মেদিনীপুর। দক্ষিণ মেদিনীপুরে চট্টোপাধ্যায় আছে কি না সন্দেহ! তুমি যে আমার পেছন নেওনি, তারও কি অনিশ্চয়তা আছে ? অতএব বন্ধু, যার-যার পথ দেখা চাই। আমাদের জাতের মধ্যেই মীরজাফর, মীরমদন ইত্যাদি হয়েছিলেন, অতএব মিত্তির-কাশীনাথ-সংবাদ আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হয় না।"

চাটার্জি প্রতিবাদ করে বললে, "মীরজাফর, মীরমদন ইত্যাদি বাঙ্গালী ছিল না; কেউ ছিল পাঠান আর কেউ ছিল আপ্-কান্‌ট্রি হিন্দু।"

উত্তরে আমি বললাম, "চাটার্জি, মুখার্জিও আপ্-কান্ট্রির হিন্দু ছিলেন। যাহোক্, এই ধরণের বিতর্কের মূল্য নাই। মীরজাফর না হয় পাঠান ছিলেন কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ কোথায় বাস করতেন তিনি জানতেন কি? বাংলা ভাষা যারা বলে, বাংলার খাদ্য যারা খায়, এবং বঙ্গদেশে যারা স্থায়ীভাবে বাস করে, তারাই বাঙ্গালী, আপ্-ডাউন বিচার করে লাভ হবে না।"

কালীবাড়িতে খেতে হলে প্রত্যেক দিনের জন্য এক টাকা করে দিতে হয় এবং এটাই ছিল নিয়ম। আমিও ঠাকুর মহাশয়ের হাতে সাত টাকা দিয়ে বাইরে চলে গেলাম। পরিচিত অনেকে ছিলেন; 'মিলাপ' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'ট্রিবিউন' পত্রিকার মালিকের সঙ্গে সকালেই দেখা করে, আমার আসার সংবাদ দিয়ে আসবার পথে আর্যসমাজীদের এক পণ্ডিতের বাড়িতে গিয়ে শুনতে পেলাম, তিনি লাহোর হতে অমৃতসহরে গেছেন, সত্বরই আসবেন। সেখান থেকে সোজা মুসলীম লীগ অফিসে হাজির হয়ে সকলকেই আমার পরিচয়-পত্র দিয়ে জম্‌কিয়ে বস্‌লাম। উদ্দেশ্য, কিছু অবগত হওয়া। দ্বিতীয় কথা হল, প্রত্যেকটা বিষয় সাহসের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করা।

বসে রয়েছি দেখে একজন ভদ্রলোক বললেন, "আমরা আপনার কাছ থেকে কিছুই শুনব না, কারণ, আপনি হিন্দু।"

পরিষ্কার ভাষায় পরিষ্কার কথা!

আমি বললাম, "আপনারা আমার দেশবাসী, সেকথা কি ভুলে গেলেন? প্রফেটইজম্ কথা বড় নয়, দেশাত্মবোধ সবচেয়ে বড়।"

সেখানে একজন স্কুল-মাষ্টার ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁরই পরিচালিত বিদ্যালয়ে কিছু বলতে বললেন। এখানেই মুসলিম লীগের অফিসের কাজ শেষ হয়ে গেল। চলার পথে হেড্‌মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি প্রফেটইজম্ মানেন না?"

"না সার, যুগে যুগে প্রফেটইজম্ মানুষের মনে বিপ্লব এনে দিয়েছে ; কিন্তু আমাদের দেশে বিপ্লবের পরিবর্তে বিপত্তির সৃষ্টি করেছে মাত্র, সেজন্যই আমি প্রফেটইজম্ হতে দূরে থাকি।"

হেড্মাষ্টার আমাকে ছাড়লেন না, তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একই সঙ্গে আমাকে আহার করালেন। এরপর তাঁর সঙ্গে বিদ্যালয়ে যেয়ে দেখতে পেলাম, ছাত্রেরা প্রার্থনা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

হেড্মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি প্রার্থনা করেন না ?"

"না সার, প্রার্থনা ব্যক্তিগত বিষয়। প্রফেটইজমের দৌলতে আজ আমরা ঈশ্বর এবং আল্লাতে এমন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসটাকে একটা মনে না করে দু'টো মনে করতে আরম্ভ করেছি। এর চেয়ে পতন আর কি হতে পারে ?"

"এটা হতে মুক্ত হবার উপায় কিছু বলতে পারেন ?" শিক্ষক মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমার উত্তর সহজ এবং সরল। বললাম, "বিপ্লবই একমাত্র উপায়।"

কথা শুনে শিক্ষক মহাশয় সন্তুষ্ট কি বিরূপ হয়েছিলেন বলতে পারি না। ইন্সপেক্টর মহাশয় আসতেই সব যেন পণ্ড হতে চলেছিল বলেই মনে হচ্ছিল! কিন্তু ইন্সপেক্টর নিজেই আদেশ করলেন, "ক্লাস এইট্ পর্যন্ত রেখে আর সবকে ছেড়ে দিয়ে লেকচারের বন্দোবস্ত করা হউক।"

তাই হয়েছিল। বেলা সাড়ে এগারটা থেকে বলতে আরম্ভ করি এবং শেষ করি তিনটার সময়। সবই বলেছিলাম কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তার আশেপাশেও যাইনি।

একটি লেকচার দেবার পর লাহোরে লেকচার দেবার জন্য অনেক আমন্ত্রণ হল, বিশেষ করে ওয়াই. এম্. সি. হলে। আমারও লক্ষ্যবস্তু ছিল ওয়াই. এম্. সি. হল্। হিন্দু-মুসলমান এবং

শিখদের মিলনক্ষেত্রে যেয়ে যদি কিছু জানা যায়, তবে ক্ষতি কি ?

ওয়াই. এম্. সি. হলে এক জায়গায় লেখা ছিল, বক্তৃতাকারী সভাস্থল পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত যেন কেহ বেরিয়ে না যান! এর মানে আর কিছুই নয়, এখানে যাঁরা লেকচার দিতে আসেন, তাঁদের কথা শুনতে সকলে ইচ্ছুক নন।

বলতে আরম্ভ করার পর একজন লোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছুঁয়ে দিলে জাত যায় এরূপ দৃষ্টান্ত আপনি পৃথিবীর কোথাও দেখেছেন কি ?"

বুঝতে বাকি থাকল না, আঘাত কোথায় ? সোজা কথায় বলে দিলাম, "এক ভারতীয় হিন্দু ছাড়া আর কারো মাঝে ছুৎ-ছুৎ রোগ নাই—পূর্বদেশের কোথাও নাই।"

"যারা ছুৎমার্গ দৈনন্দিন কাজের বিশেষ কাজরূপে গণ্য করে, তাদের মধ্যে থাকা কি সম্ভবপর ?"

"এই শ্রেণীর লোক থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

"ভারতের হিন্দুদের মধ্যে এই রোগ আছে, আপনার মধ্যেও আছে। অতএব আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করা কি ভাল হবে না ?"

"এই রোগ হতে আমি মুক্ত এবং আমার বিশ্বাস, এই রোগ অতি সহজে লোপ করা যেতে পারে।"

"কি রকমে ?"

"আইন করে। আমাদের দেশের নেতারা যদি একটু সাহায্য করেন তবেই এই আইনের উপযুক্ত ফল দেখা যেতে পারে।"

"আপনাদের দেশের নেতারাও যে সেইরূপই।"

একটু উগ্র হয়ে বললাম, "আপনি কি আমার দেশবাসী নন্ ? 'আপনাদের দেশের নেতা' বলবেন না ; বলবেন, 'আমাদের দেশের নেতা'।"

প্রশ্নকারী পরিষ্কার ভাষায় বললেন, "আমরা আপনাদের সঙ্গে বসবাস করতে চাই না। আমরা চাই পৃথক রাজ্য। যাদের মধ্যে অনেক রকমের ব্যাধি, তাদের সঙ্গে কি করে একত্রে থাকা চলে ?"

বললাম, "রোগগ্রস্ত লোকের রোগ সারাবার ব্যবস্থা আপনাদের হাতে। বর্তমানে বৃটিশ রোগ সারাতে দেবে না। আপনারা অগ্রণী হয়ে দেশের মুক্তি আনয়ন করুন, রোগীর রোগ সারান, তারপর প্রভুত্ব করুন। দেখবেন, সকলেই আপনাদের কাছে মাথা নত করবে। এত বড় কর্মস্থল পরিত্যাগ করে কাপুরুষের মত পলায়ন করা শোভা পায় না।"

আবার বলতে আরম্ভ করি। কতক্ষণ বলার পরই একজন পাতলা, ছিপছিপে লোক উঠে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "কেনেডাতে মিঃ যোশীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?"

"দেখা হয়েছিল নিশ্চয়ই" বলাতে সেই পাতলা লোকটি বলতে আরম্ভ করলেন, "এখানে এসে ভালই করেছেন, এটা বাস্তবিকই মিলন-মন্দির। এখানেই ভূয়া গদর তৈরী হয়, যারা যায় সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, ইয়াকোহামা এবং কালিফর্ণিয়া !"

এই লোকটির কথা মোটেই বিশ্বাস হয়নি কিন্তু পরে যখন কালিফর্ণিয়াতে গিয়েছিলাম তখন বুঝতে পেরেছিলাম, লাহোরের পাতলা লোকটি যা বলেছিলেন, সবই সত্য।

ওয়াই. এম. সি.-তে মুসলিম ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলাম তার প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম বার লাইব্রেরীতে; প্রায় সবই হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। একজন ভদ্রলোক ছিলেন ভকিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি কেহ আপনার কাছে বসে খায়, তবে আপনি খেতে পারবেন কি ?"

সেই ভদ্রলোক যখন শুনলেন আমি সর্বভুক্ তখন 'মার্ মার্' আর কি !

বার লাইব্রেরীতে কিছুই বলা হয়নি, চলে আসতে হয়েছিল।

বুঝতে পেরেছিলাম নিরামিষ ভক্ষণ এদের মজ্জাগত হয়েছে বটে কিন্তু খাদ্যবণ্টন যদি কণ্ট্রোল করে সমান ভাগে সকলকে দেওয়া হয় তবে এদের যা অভক্ষ্য তাও এদের ভাগ্যে এক আউন্স পড়বে কিনা সন্দেহ। "Gold Rush" সিনেমাতে যেমন করে নিজের বন্ধুকে মোরগ স্বপ্ন দেখেছিল, এদেরও সেই অবস্থা হবে।

কিন্তু এদের সেই অবস্থা হবে না; কারণ, আমাদের দেশের লোক এখনও মনে করে দারিদ্র্য ভাগ্যের হের-ফের। যে মুহূর্তে এই কুসংস্কার মানুষের মন হতে অপসারিত হবে, সেই মুহূর্তে ঘি খাওয়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

লাহোরে অনেক দেখবার ছিল, অনেক জানবার ছিল; কিন্তু বার লাইব্রেরীর অবস্থা দেখে সেখানকার বুদ্ধিজীবী মহাশয়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পেশোয়ারের পথ ধরলাম।

লাহোর থেকে রওয়ানা হবার পরই মনে হচ্ছিল যেন লোক-শূন্য অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হয়েছি। লাহোর থেকে কয়েক মাইল যাবার পরই পরিশ্রান্ত মনে হল। এর কারণ কি? এতদিন বিশ্রাম করলাম তবুও পরিশ্রান্ত, এটা হতে পারে না, বোধহয় এটা অনেক বিশ্রামেরই ফল।

একটা গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করছিলাম, ঠিক সেই সময় একজন ইউরোপীয়ান এলেন। সাহেব যেন ঔরংজেবের প্রথম পুত্র! "কিয়া করতাহে, কিথে যায়গা" ইত্যাদি প্রশ্ন গাড়িতে বসেই জিজ্ঞাসা করছিলেন। লোকটার প্রশ্ন মোটেই ভাল লাগছিল না। নিজের ভাষাতেই বললাম, "এসব জেনে তোমার কি লাভ? নিজের পথ দেখতে পার।"

আর কি রক্ষা আছে? গাড়ি হতে লোকটা নেমে এল কাছে এবং তেড়ে কথা বলতে আরম্ভ করল। কখনো হিন্দুস্থানী, কখনো ইংলিশ আর কখনো পাঞ্জাবী। আমি হাসলাম, তারপর নিজের ভাষায় বললাম, "ভেউ ভেউ করে কোনও লাভ হবে না, তুমি কে?"

হঠাৎ লোকটা বললে, সে পুলিশ, ঘটনাবশতঃ এইদিকে যাচ্ছে। আমাকে দেখে তার সন্দেহ হওয়াতে পথে দাঁড়িয়ে কিছু না জিজ্ঞাসা করে এগিয়ে যেতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সে যাবে গুজরানওয়ালা। বেশ ভালই হয়েছে, বললাম, "সন্দেহের অনেক কারণ আছে এবং থাকবেও, আমি বাঙ্গালী আর তুমি বৃটন। তোমার জাত শাসক আর আমার জাত শাসিত। চল, তোমার সঙ্গে গুজরানওয়ালা যাব।"

লোকটা রাজি হল এবং বলল, "সাইকেলটা কেরিয়ারে উঠিয়ে বেঁধে ফেল।"

তাই করলাম, সে আর প্রশ্ন করল না, একেবারে হু-হু করে গাড়ি চালাতে আরম্ভ করল।

বেলা তখন আড়াইটা হবে, সাহেব আমাকে নিয়ে হাজির করল গুজরানওয়ালার কোতোয়ালিতে। সে বললে, "এটা কোতোয়ালি।"

আমি বললাম, "এটা কোতোয়ালি নয়, এটা পুলিশ-স্টেশন।"

লোকটা পাগল হয়ে গেল, একেবারে চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করল, "এটা কোতোয়ালি নিশ্চয়ই, হাজারো বার কোতোয়ালি।"

আমি বললাম, "তোমার জন্যে হতে পারে কোতোয়ালি, আমার জন্য পুলিশ-স্টেশন, যেখানে লোক থাকে মানুষেরই ভালমন্দ দেখার জন্য।"

লোকটার চিৎকারে এবং আমার বেপরোয়া কথার জন্য কয়েকজন পাঞ্জাবী কনষ্টেবল বেরিয়ে এল। এদের দেখতে পেয়ে ইউরোপীয়ান বললে, "চা নিয়ে আসতে বল, আমার কামরাতে।"

আবার প্রতিবাদ করে বললাম, "বল আমার অফিসে।"

আর জবাব দিল না লোকটা, ভদ্র ভাষায় বললে, "এবার দয়া করে আস্থন চা খেয়ে বিদায় নিন। আমি বাঙ্গালীও নই, আর বৃটিশ সেপাইও নই, মামুলি এস্. পি. মাত্র।"

উভয়ে অফিসে গেলাম, চা খাওয়া হল, তারপর বললাম, "ধন্যবাদ, এখন যাই।"

এস্. পি. বললেন, "এখন যেদিকে ইচ্ছা যেতে পারেন।"

বাইরে এসে সাইকেলটা খুলে নিয়ে নিজের অন্যান্য জিনিস সাইকেলে বেঁধে রওয়ানা হলাম শহরের দিকে। শহরে প্রবেশ করার পথেই পেলাম এক হিন্দু হোটেল। থাকবার জায়গা অপরিষ্কার কিন্তু খাদ্যের ব্যবস্থা বেশ ভাল। গুজরানওয়ালা

শহরে এসেই মনে হল শহরটা যেন লাহোর হতে অনেক উঁচু। অথচ চলার পথে একটুও উঁচু মনে হচ্ছিল না।

কতক্ষণ বিশ্রাম করে, স্নান করে নিলাম; তারপর ভোজন। হিন্দু হোটেলে আমিষ ভোজন এই প্রথম, মাংস ছিল। এদিকে মাংস সর্বত্র পাওয়া যায় না; কারণ, কোনও হিন্দু হোটেলে জবাই-করা জীবের মাংস বিক্রি হয় না।

এখানে শিখদের পাঁঠা কাটবার দোকান আছে। হিন্দুদের সংখ্যা কম, মুসলমানের সংখ্যা বেশি, গুজরানওয়ালাতে এলেই তা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। কিন্তু এদিকের হিন্দুরা বড়ই অপরিষ্কার; দেখলেই মনে হয়, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের চেয়ে নিকৃষ্ট। হিন্দুদের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভাব পশ্চিম পাঞ্জাবের কোথাও অনুভূত হয় না।

বিকালে শহরে বেড়াতে বের হলাম। পুলিশ-স্টেশনে গেলাম না, আর সর্বত্রই বেড়ালাম। শহর বেশি বড় নয়, সাইকেলে করে সবটা শহর দেখতে দেড় ঘণ্টারও বেশি লাগে নি। শহরের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশি কিন্তু এদিকের গ্রামাঞ্চলে হিন্দু নাই বললেই চলে, আছে কয়েক ঘর শিখ। হিন্দুমাত্রেই ধনী, অর্থের অভাব নাই। শিখরা পরিশ্রমী তবে হিন্দুদের অনুকরণে সুদ খাওয়া শিখে গেছে।

এখানে দেখবার এবং শোনবার কিছুই ছিল না। কাজেই পরদিন সকালে ওয়াজিরাবাদ রওয়ানা হলাম।

ওয়াজিরাবাদ

ওয়াজিরাবাদ পৌঁছার পূর্বেই শরীর বেশ দুর্বল অনুভব করেছিলাম। সেখানে পৌঁছে একটি ধরমশালাতে আশ্রম নিলাম। অপূর্ব সেই ধরমশালা! অর্থের বিনিময়ে এখানে সবই করা যায়। বিকালে এক স্থানীয় হিন্দুর বাড়িতে যেয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, এরা নিঃস্ব হয়েছে।

এখানে মাত্র একখানা হিন্দুর দোকান দেখতে পেয়ে মনে হয়েছিল এটা কি আফগানিস্থান না অন্য কোনও দেশ? পথে একটি লোক ফল বিক্রি করছিল। তার কাছ থেকে ফল কেনার সময় সে বলেছিল, গুজরানওয়ালাতে হিন্দু আছে কিন্তু ভয়ানক দাম্ভিক। তার নিজের পরিচয় সে নিজেই দিয়েছিল এবং বলেছিল সে একজন খৃষ্টান।

ওয়াজিরাবাদে রাত কাটিয়ে সকালে রওয়ানা হয়েছিলাম গুজরাতের দিকে। সকালেই শরীর দুর্বল মনে হচ্ছিল কিন্তু সেই দুর্বলতার দিকে না তাকিয়ে পথ চলছিলাম।

গুজরাত, ঝিলাম

গুজরাত শহরে পৌঁছার পর হঠাৎ মনে হল সামনের পুলিশটা যেন ঘুরছে! তারপর সাইকেল হতে পড়ে যাই। সেই সঙ্গে যেন তন্দ্রার ভাব!

তন্দ্রা যখন ভাঙ্গল তখন দেখলাম, আমাকে নিকটস্থ একটা বালিকা-বিদ্যালয়ে বিছানাতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। লজ্জা হল। বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

বিকালে হোটেলে যেয়ে দই দিয়ে ভাত খেয়ে আবার শুয়ে রইলাম। বুঝলাম, শরীরে দুর্বলতা ঢুকেছে; দুর্বলতা সারাতে হবে। দুর্বলতা সারাবার অনেক ঔষধ আছে। আমি ঔষধের পক্ষপাতী ছিলাম না, ঘোল আর ভাত অথবা দই আর ভাত ঐ দুটো খেলেই আমার দুর্বলতা সারত।

গুজরাতে তিনদিন কাটিয়ে লালামুসা হয়ে ঝিলাম পৌঁছলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় নেই। ঝিলাম নদীতে মাছ আছে প্রচুর কিন্তু সে মাছ মুসলমানরাই খায়, হিন্দুরা মাছ খায় না। আমার আশ্রয়দাতা ভদ্রলোক বেহারী, দেখতে এবং কথা বলার ভঙ্গিতে বাঙ্গালী বলেই মনে হত। মাছ কেনা, মাছ রান্না করা উভয়ে মিলেই করতাম। তবে বিহারের যুবক রান্নায় বেশ ওস্তাদ ছিলেন। মাছ রান্না হবার পর আরও কয়েকজন বেহারী এলেন, সকলেই নিমন্ত্রিত। খাওয়া হল বেশ আরামে। তারপরই রাজনীতি-চর্চা।

বেহারী নামে পরিচয় দিয়ে কয়েকজন বাঙ্গালীও খেলেন। রাজনীতি আলোচনা না করলে বাঙ্গালীর যেন বাঙ্গালীত্ব থাকে না! আরম্ভ হল রাজনীতি-চর্চা। চর্চা করার মত কিছুই ছিল না। ক্রান্তি-যুগ আর কতকাল চলবে? নন্-কো-অপারেশন কি

আজীবন চালিয়ে যেতে হবে? আমাদের ভবিষ্যৎ কি পরাধীন জীবনেই শেষ হবে?—এই রকম কথার মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না।

বেহারী এবং বাঙ্গালী বাবুরা যেন হয়রান হয়েছিলেন! কি করতে হবে তাঁরা যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না! এখানে আমিও আমার আত্ম-পরিচয় দিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। এঁরা তো পুলিশের লোকও হতে পারেন! রাত বারটার সময় সভা ভঙ্গ হবার পর মন দমে গেল, ভাবছিলাম, এই কি আমাদের ভবিষ্যৎ?

রাত কাটল। পরের দিন ঝিলাম শহরের এক ধনীর বাড়িতে গেলাম। তিনি নাকি সেখানকার রাজার মত লোক! ভদ্রলোক বাস্তবিকই রাজা ছাড়া আর কি হতে পারেন? বেশি কথা হল না, ফিরে গেলাম থাকবার জায়গায়। খাওয়া শেষ করে ঝিলাম নদীর তীরে যেয়ে বসলাম।

বেশ ভাল লাগল সেখানে বসতে। সাধারণ লোকও সেখানে কম ছিল না। তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবন-কথা বলে যাচ্ছিল। রাজনীতি, ধর্মনীতি কিছুরই বালাই ছিল না। এরা সবাই মুসলমান। নৌকো চালায়—এই একমাত্র পেশা। ভাষা কিন্তু পাঞ্জাবী বলছিল না। পাঞ্জাবী ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে আর কি একটা ভাষা বলছিল!

আমি চেয়ে ছিলাম এদের শরীর-গঠনের দিকে। সবগুলি লোকই সুপুরুষ, একজনও কালো ছিল না। একজন উপরে আসার পর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে কোন্ জাতের লোক? সে বলেছিল, সে কাশ্মীরী। আমার ধারণা ভুল। কাশ্মীরীকে পাঞ্জাবী মনে করেছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে পাঞ্জাবী এবং কাশ্মীরীতে অনেক প্রভেদ। ভাষা, খাদ্য, বস্ত্র, সব রকমেই পৃথক।

মাঝিরা সকলেই পুঞ্চ গ্রামের বাসিন্দা। সেখানে তাদের একজন রাজা আছেন। রাজা নাকি খুবই উদার! ধর্মের

পার্থক্য তাঁর রাজ্যে নাই। যত গণ্ডগোলের কারণ পাঞ্জাবী। পাঞ্জাব দেশে পুঞ্চদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়, নতুবা এখানে এরা আসতই না। এই রকমের মন্তব্য করে মাঝি নৌকোয় চলে গেল। আমিও নদীতীর হতে শহরে চলে গেলাম।

এখানে দেখলাম আমাদের দেশের মতো এখানেও সত্যিকারের জাতিভেদ রয়েছে। পুঞ্চ থেকে যারা ব্যবসা করতে এসেছে তারাও মুসলিম, ঝিলামে যারা বাস করে এবং শহরের বাইরে যারা থাকে তারাও প্রায়ই মুসলিম ; কিন্তু এদের সঙ্গে অন্যের অবতারবাদ ছাড়া সকল রকমের পার্থক্য ছিল।

শহরে এসেই আমার নূতন আবিষ্কৃত তথ্য তথাকথিত বেহারীদের বললাম। আমার নূতন কথা শুনে সকলেই অবাক হল। অবতারবাদের উপর ভিত্তি করে জিন্না পাকিস্থান করতে চাইছেন অথচ জাত গড়ে ওঠে শ্রেণীগত ভাবে। পাহাড়ীরা সমতলে এলে যেমন অস্বস্তিবোধ করে তেমনি সমতলবাসীরাও পাহাড়ে থাকতে চায় না।

পরের দিন সকালেই ঝিন্দ ছেড়ে চললাম আরও পশ্চিমের দিকে। এটাও পাঞ্জাব, এখানকার লোকও পাঞ্জাবী বলে কিন্তু লোকের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার কিছুটা পৃথক অনুভব করেছিলাম। এদিকের লোক বেপরোয়া ; তাদের ছুৎমার্গ নাই, বেশ সরল প্রকৃতির, বৃটিশ শাসনই যেন এদের শেষ দিন পর্যন্ত চলবে! ইংলিশ বলা, লেখা এবং স্যুট্ পরাই যেন এদের একমাত্র কাম্য ! তবে মাথার পাগড়ীটা ছাড়তে যেন ইচ্ছুক নয়! গলায় নেক্‌টাই ঝুলিয়ে মাথায় পাগড়ী অথবা ফেজ্ টুপি লাগিয়ে পথ চলা যেন বড়ই আরামের! তবে এটা ঠিক, এদিকের লোক ধুতি ব্যবহার করে না।

রাত্রে থাকতে হল আর একটা বেখাপ্পা জায়গায়। বাঁ-দিক দিয়ে রেল-লাইনটা চলে গেছে, আর ডানদিকে দি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। মাঝখানে একটি গ্রাম।

গ্রামের বাসিন্দা সবাই পাঞ্জাবী। কেহ সাদা, কেহ কালো, তবে লোকগুলি অমায়িক। গ্রামে কয়েক ঘর মেথরও থাকে কিন্তু মেথরের কাজ করে না। হরিজনের সংখ্যা খুবই কম। গ্রামের রাজপুত দুই ভাগে বিভক্ত, ইসলামবাদী আর হিন্দুবাদী। অনেক হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের রক্তের সংযোগ রয়েছে।

গ্রামের ধরমশালাতে রইলাম। ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত ছাড়া এই ধরমশালাতে আর কেউ থাকতে পারে না। বড়ই আরামের স্থান। এটাকে ধরমশালা বলা চলে না, বলতে হবে ডাক-বাংলো। বাঙ্গালী আবার কি জাত হয়, এদের জানা ছিল না। মেথরই জল এনে দিল। চা এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এনে দিল মুসলমান বাড়ি হতে। বিকালে কয়েকজন মুসলমান ধরমশালাতে এসে কেমন আছি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেই বিদায় নিলেন। বিশেষ আদর-আপ্যায়ন করা কারো যেন মনেই হল না!

রাত কাটানো নিয়ে কথা, রাত কাটিয়ে পরের দিন পথে বের হতে যাচ্ছি, এমনি সময় পথে দেখা হল একটি লোকের সঙ্গে।

তিনি ডাক্তার, পূর্বে পল্টনে ছিলেন, বর্তমানে সিভিল প্র্যাক্‌টিস করেন। দেখা হওয়া মাত্রই তিনি বললেন, "আপনি কি মিঃ বিশ্বাস নন?"

"হাঁ ডাক্তার ফতে মিয়া, আপনি কি এখানে থাকেন?"

এই পর্যন্ত বলার পর তিনি মোটর-বাইক হতে নেমে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন।

তাঁকে বললাম, "এখানকার ধরমশালা বেশ ভাল, গত রাত্রে সেখানেই ছিলাম। সেখানে গেলেই ভাল হবে।"

ফতে মিয়া কি চিন্তা করে বললেন, "আচ্ছা থাকুন সেখানে। আমি একজন লোককে আপনার খাদ্যের আয়োজন করতে বলে যাব। সে সবই করবে, বারটার পর উভয়ে খাব, কেমন?"

"আচ্ছা, তাই হবে," বলেই আমি আবার ধরমশালাতে গেলাম। ফতে মিয়া কোথায় গেলেন তাই নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না।

আজকাল পাঞ্জাবী মুসলমানরা সবাই মিয়া লিখতে আরম্ভ করেছে, পূর্বে তা পারত না। যারাই রাজপুত হতে মুসলমান হত, তারাই শুধু মিয়া লিখতে পারত। পূর্বে কোনও মিয়াই গোমাংস খেতেন না, বর্তমানে কি করেন আমি জানি না। খাঁ অথবা খাঁন যাঁরা, তাঁরা মিয়াদের সমকক্ষ কখনও ছিলেন না ; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে যেয়ে মিয়াদের সংখ্যা অল্পই দেখেছিলাম, খাঁনের সংখ্যাই বেশি। খাঁনরা না কি অসুরদের একই বংশের লোক, মিয়ারা একেবারে আদি এবং অকৃত্রিম দেবতাদের বংশধর এটাই এদিকের লোক দাবী করে।

বেলা এগারটার পূর্বেই মিয়া ফতে আহম্মদ এলেন এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি হিন্দু এবং মুসলমানের আগমন হল। লোকগুলি সকলেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এবং যদিও এদের চোখের তারা নীল নয় তবুও অনেকটা কটা।

কোন সময়ে যে এরা শ্বেতকায় ছিল, তার সমূহ প্রমাণ রয়েছে দেখতে পেয়ে ফতে মিয়াকে বললাম, "ডাক্তার সাহেব, আপনাদের শরীরের গঠন ইত্যাদি দেখে মনে হচ্ছে আপনাদের পূর্বপুরুষ শ্বেতকায় ছিলেন।"

মিয়া ফতে আহম্মদ স্পষ্ট করেই বললেন, "আমাদের পূর্ব-পুরুষকে ডুবিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, আমরা এখন তাই বুঝতে পেরেছি ; সেজন্য আমাদের মধ্যে নূতন এক আচার-ব্যবহারের সৃষ্টি হয়েছে। জানি না সেই নূতন আচার-ব্যবহারে আমরা ফিরে যেতে পারব কি না ? পর্দা আমাদের মধ্যে নাই, বিবাহ-প্রথাও ভিন্ন রকমের।"

মিয়া ফতে আহম্মদ এরপর যা' বলেছিলেন, তাই ছিল

ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাইনি ; কারণ, আমি জানতাম, মিয়া ফতে আহম্মদ অথবা তাঁদের সম্প্রদায় ভবিষ্যতে টিঁকে থাকতে পারবেন না, হয় হিন্দু নয় মুসলমানের সঙ্গে তাঁদের যোগ দিতে হবে।

পরের দিন পুনরায় রওয়ানা হয়ে গুজরখাঁনে পৌঁছি। এই গুজরখাঁন যিনি নাম দিয়েছিলেন তিনি মুসলিম ছিলেন না, ছিলেন হিন্দু; তবে তিনি ছিলেন মুসলমান নবাবের অধীনে একজন কর্মচারী, এই কথাই সকলে বলেছিল। গুজরখাঁনে হিন্দুর সংখ্যা খুবই কম; সে জন্য যে কয়টি হিন্দু এবং শিখ পরিবার এখানে বাস করছিল, তারা একে অন্যের উপর সব সময়ই নির্ভর করত।

গুজরখাঁন হতে একদিনেই রাওলপিণ্ডি পৌঁছি। আশ্রয় নিলুম একটি ধরমশালাতে। শহরের ঠিক মধ্যস্থলে ধরমশালা। রাওলপিণ্ডিতে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ছিলাম, পরেও এসেছিলাম, অতএব এখানে নূতনত্ব বলে আমার চোখে যেন কিছুই ভাসছিল না। তবুও পর্যটকরূপে একস্থানে এলেই নূতন কিছু দেখতে হয়।

এখানকার মল্ রোড, ক্যাণ্টনমেণ্ট, কালীবাড়ী, সবই আমার দেখা এবং জানা। ১৯১৯ খৃঃ অঃ পর্যন্ত ক্যাণ্টনমেণ্টে আমি ছিলাম। পাঞ্জাবী চরিত্র আমার বেশ জানা ছিল কিন্তু এবার এখানে আসার পর কিছুটা নূতন করেই শহরটা দেখতে আরম্ভ করলাম।

ছিলাম আর্যসমাজীদের ধরমশালায়। হিন্দু ধর্মের প্রচার এবং বিস্তার ছিল এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। জন্মান্তরবাদ এরা গ্রহণ করেছিল। আমি জন্মান্তরবাদ মানতাম না। ঈশ্বর সম্বন্ধেও একটা নূতন ধারণা হয়েছিল; কিন্তু ভয় সব সময় লেগে থাকত কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এসব কথা শুধু আমিই মানতাম, কারো কাছে কিছুই বলতাম না।

ধরমশালাতে স্থান নেবার পর হঠাৎ মনে হল টাকার কথা। টাকা আমার প্রায় শেষ হয়েছিল, পেশোয়ার পৌঁছুতে আরও

পঞ্চাশ টাকা লাগতে পারে, কিন্তু সেই টাকা কোথায়? রাত্রে বিষয়টা চিন্তা করে পরের দিন মল্ রোডে গেলাম। আমার প্রতি কেউ একটুও আগ্রহ দেখাল না। ফেরবার পথে এক লালা যুবকের সঙ্গে দেখা হয়। যুবক শুধু বললে, আগামীকল্য সকালে সে আমার সঙ্গে দেখা করবে, ধরমশালা ছেড়ে যেন কোথাও না যাই!

হাঁ, যৌবন তার চোখে-নাকে-মুখে ফেটে পড়ছিল! আমার একটি কুধারণা ছিল, এদিকের হিন্দু যুবকদের চরিত্র বলতে কিছুই নাই। চরিত্রহীনের কথা রক্ষা করা চলবে কি না, তাই ভাবতে ভাবতে ধরমশালায় চলে আসি।

ধরমশালায় কয়েকজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। কেউ ছাত্র আর কেহ শিক্ষক। সন্ধ্যার পর সকলেরই যেন কি খেয়াল হল আমার সঙ্গে কথা বলবেন! ঈশ্বর আর অবতারবাদ যাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়, মরলে স্বর্গ হবে যাদের বাসস্থান, তারা পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কি সম্পর্ক রাখতে পারে? তবুও গেলাম ওদের সঙ্গে কথা বলতে।

এদের সংখ্যা ছয় কি সাত। গুরুকুল বিদ্যালয় হতে কয়েকজন ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন বটে কিন্তু সন্ন্যাস ধর্মে বিশ্বাসী নন। তাঁদের মুখের কথাই শুনতে হল প্রথম। ইংলিশ, সংস্কৃত, পালি যাঁদের কণ্ঠে বিরাজ করে, তাঁদের সামনে আমি নগণ্য। তাঁদের কথাই অনেকক্ষণ শুনতে হল। আমাকে উপলক্ষ করেই এই ধরণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা হচ্ছিল। এদের কথা শেষ হলে আমাকে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁদের কথা এবং পাণ্ডিত্য বুঝতে পেরেছি কি না?

উত্তরে বললাম, "এসব হল চায়ের দোকানে বসে যে সকল কথা বলা হয়, তারই সমান। কার পূর্বপুরুষ কিরূপ ছিলেন, এর বেশি কিছু বলেননি। আপনাদের কথার মধ্যে গঠনের কিছুই

নাই, আছে বিভাগ ও বিচ্ছেদ। আপনাদের বিশ্বাস, একমাত্র আপনারাই স্বর্গের অধিকারী—কাজেই স্বর্গে গেলে দেখতে পাবেন মুসলমান খৃষ্টান সকলেই নরকে গেছে, আর আপনারাই শুধু স্বর্গে মজা লুটছেন!"

জানিনা এই ত্রিকালজ্ঞগণ আজ পূর্ব-পাঞ্জাবের কোথায় আছেন! তাঁদের গুরুকুল আছে নিশ্চয়ই।

চলে আসার পর বয় বলছিল, "আপনাকে এখানে সাতদিনের বেশি থাকতে দেওয়া হবে না শুনে এসেছি।"

বয়কে বললাম, "সাতদিন ত থাকতে দাও, তারপর অন্য ব্যবস্থা করব।"

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ কড়া-নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলে দিলাম। ঘরে ঢুকল সেই লালা যুবক। যুবক বসল এবং বলল, "তুমি এখনও ঘুমোচ্ছ। পৃথিবী ভ্রমণ কর কখন?"

জবাব না দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এলাম, তারপর যুবককে বললাম, "চা খাবে?"

যুবক বললে, "এখন চা খাওয়ার সময় নেই। ইচ্ছা রয়েছে তোমাকে পঞ্চাশটা টাকা পাইয়ে দেই, কিন্তু সেই টাকা যোগাড় করতে হবে। তাড়াতাড়ি করে চল।"

বের হলাম যুবকের সঙ্গে। দশটার পূর্বেই পঁচিশজন লোকের সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে গেলাম। যুবক যাবে কাজ করতে। সে কাজে চলে গেল। যাবার পূর্বে বলে গেল, সন্ধ্যার পূর্বে সে আসবে এবং আমাকে তার বাড়িতে ভোজনার্থ নিয়ে যাবে। ব্যস্ এই পর্যন্ত!

আমারও অসুখ করেছিল। ঘরে এসেই একজন ডাক্তারের কাছে গেলাম; তিনি বললেন, প্রচুর পরিমাণে ঘোল খেতে এবং তাতেই রোগ সারবে। আমাশয় রোগের জন্য কয়েক পূরিয়া ঔষধ দিলেন, দাম নিলেন না।

ডাক্তার পাঞ্জাবী এবং একটু অন্য ধরণের লোক। পরমাত্মা অথবা খোদা শব্দ যা সাধারণত শোনা যায়, তাঁর মুখ থেকে সেরূপ একটি কথাও বের হল না।

সন্ধ্যার পর লালার বাড়িতে গেলাম। অন্য একটি যুবক এসেছিল আমাকে নেবার জন্য। দেখতে হিন্দু কি মুসলমান, বুঝতে পারিনি। কথা-প্রসঙ্গে সে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলল। তার শেষ কথার জবাবে বললাম, "এটা হল অবতারবাদ, ধর্ম নয়। ধর্ম গতিশীল। অবতারবাদ অগতিশীল। আমরা চলেছি, চলব—যখন চলতে পারব না, বৃদ্ধ হব, আমরা তখন ধর্ম হতে বিচ্যুত হব।"

যখন সাইকেল হতে নামলাম তখন সে আমার করমর্দন করল। আমি কিছুই বললাম না।

লালার বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম, অনেকগুলি যুবক বসে আছে ; তারাও খাবে। আমি লালাকে বলেছিলাম রুটি খাব না, ভাত খাব এবং সেই সঙ্গে থাকবে প্রচুর ঘোল। লালা তা করেনি, সে মোরগের মাংস, পোলাও ও আরও কিছু করেছিল। লালার বোন সবাইকে খাদ্য পরিবেশন করল। দেখলাম, কেউ কিছু বলছে না, সকলেই খেতে আরম্ভ করেছে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সকলের সঙ্গে পরিচিত হলাম। দেখলাম বেশির ভাগই মুসলমান। যে ছেলেটি আমাকে নিতে এসেছিল, সেও একজন মুসলিম যুবক।

এরা কে ? চিন্তার বিষয় নয় কি ? কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। লালা জিজ্ঞাসা করল, আমি কবে যাব ? বললাম, "তোমার বাড়িতে যা খেয়েছি তাই আগে হজম করি, তারপর যাওয়ার কথা ! আমার আমাশয় হয়েছে।"

"তা আমরা জানি, ওষুধ এনেছ ; ডাক্তার ভাল ওষুধ দিয়েছে। দেখবে তোমার আমাশয় আর হবে না।"

লালাকে বললাম, "দুটো দিন অপেক্ষা করে দেখব আমাশয় আমাকে ছাড়ল, কি আমি আমাশয়কে ছাড়লাম! তারপর রওয়ানা হব।"

লালা আর কিছুই বললে না, তার কাজ যেন শেষ হয়েছে! সে মহা আনন্দে আমাকে বিদায় দিল। কিন্তু মুসলমাম ছেলেরা বিদায় দিল না, বললে, তাদের বাড়িতে খেতে হবে। রাজী হলাম বটে কিন্তু একটি শর্ত—দুদিন পর খেতে যাব।

মুসলমান যুবকেরা তাতেই আনন্দিত হল। বুঝতে পারলাম না এদের আনন্দিত হবার কারণ কি? হিন্দু-মুসলমান-ধর্ম-ঈশ্বর এই চারটি শব্দ আমাকে এত উত্যক্ত করেছিল যে, নিজের দেশ ছাড়তে পারলেই যেন মহা আনন্দ! তখনও মনে চীনের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, সেজন্যই বোধহয় এত উদ্বেগ!

ধরমশালাতে ফিরে এসে শুয়ে রইলাম এবং ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ আর এক মাত্রা খেয়ে অনেকটা শান্তি পেলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারলাম শরীরে যেন কোনও রোগ নাই, দুর্বলতা লোপ পেয়েছে। শরীর ভাল থাকলে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় না, তাই সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম; দেখলাম, একদল বৃটিশ সেপাই মাতাল হয়ে পাঞ্জাবী পোশাক পরে মাতলামি করছে।

এখানে বলে রাখা ভাল, ভারতীয় মাতলামি আর অন্যান্য দেশের মাতলামি ভিন্ন রকমের। বৃটিশ হাজারো মাতাল হউক, তাদের নিজের প্রকৃতি পরিত্যাগ করতে পারে না। মাতাল হয়েও বৃটিশ সেপাই অথবা বৃটন স্বদেশে অথবা বিদেশে উন্মত্ত হয়ে বকে না। এদের মাতলামি অনেকক্ষণ দেখে ভাবলাম, যখন তোমাদের দেশে যাব তখন দেখব তোমরা কিরূপ মাতাল!

বেশিক্ষণ বেড়াতে হল না, একজন পাঞ্জাবী শিখ আমাকে পাকড়াও করল। সে যাবে পৃথিবী ভ্রমণ করতে, কি করে

পাসপোর্ট পেতে হয় বলে দিতে হবে। পাসপোর্টের কথা বলা হয়ে গেলে সে বলল, "সব সফা হোগিয়া, হাম যায়েগা।"

এরপর লোকটা চলে গেল। •

তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমেরিকায়। সে তখন আর শিখ ছিল না। মাথার চুল, দাড়ি এবং গোঁফ কামিয়ে সে ভদ্রলোক হয়েছিল, সে তার নামও পরিবর্তন করেছিল। তখন তার নূতন নাম হয়েছিল কিড্।

পরবর্তী কালে কিড্ নরঘাতক হয়েছিল। ভারতবাসীকে হত্যা করতে পারলে সে আনন্দিত হত। কিড্ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেছিল, "অনেক ভারতবাসীকে খুন করেছি, আর খুন করব না, বিশ্রাম করছি। আমেরিকার বাসিন্দা হয়েছি, বল তোমার জন্য আমি কি করতে পারি ?"

উত্তর দিতে পারিনি, কি আর চাইব তার কাছে ? চলে আসার সময় সে তার ডায়রী আমাকে দিয়েছিল। টাইপ করা সেই ডায়রী। সারারাত পড়েছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম, এখনও আমেরিকায় আছি, অতএব কিডের ডায়রী আগামী কল্যের মধ্যে শেষ করে তাকে ফেরত দিতে হবে।

তার ডায়রী শেষ করে ফেরত দিতে যেয়ে দেখি, সে ঘরে নাই। কতকক্ষণ বসার পর ফিরে এল কিড্। তারপর বলল, "পারবে তুমি বই লিখতে—এর উপর ভিত্তি করে ?"

আমি বললাম, "পারব না কেন কিড্ ? তবে ভ্রমণ লিখে শেষ করে তোমার ডায়রীর কথা লিখতে আরম্ভ করব, তখন তুমি কোথায় থাকবে কে জানে ? দেখতে পাচ্ছ না যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, আমিও দেশে যাব। যদি আমি বেঁচে থাকি তবে তোমার এড্ভেনচার-পূর্ণ ঘটনাবলীকে উপন্যাসে পরিণত করে তাই প্রকাশ করব মনে করেছি।"

সেই রাওলপিণ্ডি, আর আমেরিকার কালিফর্ণিয়া! শিখ

যুবকের কাছে বিদায় নিয়ে ধরমশালাতে ফিরে এসে শরীর যাতে ভাল থাকে, তারই চেষ্টা করছিলাম। তারপর নির্ধারিত দিনে মুসলমানদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম।

ডাল, ভাত, মাংস, দই, ক্ষীর ইত্যাদি ভোজন করে মনে হয়েছিল যেন কোনও বাঙ্গালীর বাড়িতে খাওয়া হয়েছে! সন্দেহ হল, এরা বাঙ্গালী নয় তো? কিন্তু তারা কথা বলছিল পাঞ্জাবী। ভোজনান্তে নানা কথাই হল তাদের সঙ্গে। কথায় বিষয়বস্তু ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

সর্বত্র যেন কি একটা অবিশ্বাসের কালো ছায়া দেখা যাচ্ছিল! যখনই এরূপ কালো ছায়ার আবির্ভাব হয় তখনই চারিদিকে অবিশ্বাসের ছায়া ফুটে বেরোয়।

১৯৩৭ সালে আবার যখন রাওলপিণ্ডিতে গিয়েছিলাম তখন জানতে পেরেছিলাম লালা নামক যুবকটি আর নেই—তার মৃত্যু হয়েছে এবং তার বন্ধুরা সকলেই বিদেশে চলে গিয়েছে।

রাওলপিণ্ডির অভিজ্ঞতার অধ্যায় এখানেই শেষ করা গেল।

ডাক্তার পাঞ্জাবী এবং একটু অন্য ধরণের লোক। পরমাত্মা অথবা খোদা শব্দ যা সাধারণত শোনা যায়, তাঁর মুখ থেকে সেরূপ একটি কথাও বের হল না।

সন্ধ্যার পর লালার বাড়িতে গেলাম। অন্য একটি যুবক এসেছিল আমাকে নেবার জন্য। দেখতে হিন্দু কি মুসলমান, বুঝতে পারিনি। কথা-প্রসঙ্গে সে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলল। তার শেষ কথার জবাবে বললাম, "এটা হল অবতারবাদ, ধর্ম নয়। ধর্ম গতিশীল। অবতারবাদ অগতিশীল। আমরা চলেছি, চলব—যখন চলতে পারব না, বৃদ্ধ হব, আমরা তখন ধর্ম হতে বিচ্যুত হব।"

যখন সাইকেল হতে নামলাম তখন সে আমার করমর্দন করল। আমি কিছুই বললাম না।

লালার বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম, অনেকগুলি যুবক বসে আছে; তারাও খাবে। আমি লালাকে বলেছিলাম রুটি খাব না, ভাত খাব এবং সেই সঙ্গে থাকবে প্রচুর ঘোল। লালা তা করেনি, সে মোরগের মাংস, পোলাও ও আরও কিছু করেছিল। লালার বোন সবাইকে খাদ্য পরিবেশন করল। দেখলাম, কেউ কিছু বলছে না, সকলেই খেতে আরম্ভ করেছে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সকলের সঙ্গে পরিচিত হলাম। দেখলাম বেশির ভাগই মুসলমান। যে ছেলেটি আমাকে নিতে এসেছিল, সেও একজন মুসলিম যুবক।

এরা কে? চিন্তার বিষয় নয় কি? কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। লালা জিজ্ঞাসা করল, আমি কবে যাব? বললাম, "তোমার বাড়িতে যা খেয়েছি তাই আগে হজম করি, তারপর যাওয়ার কথা! আমার আমাশয় হয়েছে।"

"তা আমরা জানি, ওষুধ এনেছ; ডাক্তার ভাল ওষুধ দিয়েছে। দেখবে তোমার আমাশয় আর হবে না।"

লালাকে বললাম, "তুটো দিন অপেক্ষা করে দেখব আমাশয় আমাকে ছাড়ল, কি আমি আমাশয়কে ছাড়লাম! তারপর রওয়ানা হব।"

লালা আর কিছুই বললে না, তার কাজ যেন শেষ হয়েছে! সে মহা আনন্দে আমাকে বিদায় দিল। কিন্তু মুসলমাম ছেলেরা বিদায় দিল না, বললে, তাদের বাড়িতে খেতে হবে। রাজী হলাম বটে কিন্তু একটি শর্ত—তুদিন পর খেতে যাব।

মুসলমান যুবকেরা তাতেই আনন্দিত হল। বুঝতে পারলাম না এদের আনন্দিত হবার কারণ কি? হিন্দু-মুসলমান-ধর্ম-ঈশ্বর এই চারটি শব্দ আমাকে এত উত্যক্ত করেছিল যে, নিজের দেশ ছাড়তে পারলেই যেন মহা আনন্দ! তখনও মনে চীনের প্রভাব বিত্তমান ছিল, সেজন্যই বোধহয় এত উদ্বেগ!

ধরমশালাতে ফিরে এসে শুয়ে রইলাম এবং ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ আর এক মাত্রা খেয়ে অনেকটা শান্তি পেলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারলাম শরীরে যেন কোনও রোগ নাই, তুর্বলতা লোপ পেয়েছে। শরীর ভাল থাকলে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় না, তাই সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম; দেখলাম, একদল বৃটিশ সেপাই মাতাল হয়ে পাঞ্জাবী পোশাক পরে মাতলামি করছে।

এখানে বলে রাখা ভাল, ভারতীয় মাতলামি আর অন্যান্য দেশের মাতলামি ভিন্ন রকমের। বৃটিশ হাজারো মাতাল হউক, তাদের নিজের প্রকৃতি পরিত্যাগ করতে পারে না। মাতাল হয়েও বৃটিশ সেপাই অথবা বৃটন স্বদেশে অথবা বিদেশে উন্মত্ত হয়ে বকে না। এদের মাতলামি অনেকক্ষণ দেখে ভাবলাম, যখন তোমাদের দেশে যাব তখন দেখব তোমরা কিরূপ মাতাল!

বেশিক্ষণ বেড়াতে হল না, একজন পাঞ্জাবী শিখ আমাকে পাকড়াও করল। সে যাবে পৃথিবী ভ্রমণ করতে, কি করে

তক্ষশীলা ও নিকটবর্তী স্থান

রাওলপিণ্ডি হতে যাত্রা করে টেক্‌শীলা, মানে—তক্ষশীলার দিকে রওয়ানা হই। বাঁয়ে বড় পথটা ছেড়ে দিয়ে ডানদিকে উত্তরে কয়েক মাইল যাবার পরই তক্ষশীলা।

সেখানে অনেক কিছু দেখবার রয়েছে। কেহ বলেন, দেবতাদের আদিবাস তক্ষশীলা কিন্তু বর্তমান ভারতবাসীরা সে কথাটা সহ্য করতে পারবে না। যে দেবতা মানুষের বহু উর্ধ্বে স্বর্গে বাস করেন, তাঁদের বাড়ি এখানে কেমন করে হতে পারে? কোনও বিষয় কোনও অশিক্ষিত সম্প্রদায় মানুক আর না মানুক, তাতে কিছুই আসে যায় না।

তক্ষশীলা কতক্ষণ ভ্রমণ করে দেখার পর মনে হল, দেবতাদের আবাসভূমিতে একজন দেবতারও দর্শন পাওয়া গেল না! এঁদের বংশধর গেল কোথায়?

ঠিক্ এমনি মনের ভাব সেদিনও হয়েছিল যেদিন দেখেছিলাম বাবিলন্। বাবিলনে যারা বাস করত, তাদের বংশধর আছে; এখন এখানে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের বংশধর নাই। সকলেই মানুষ। চারিদিকে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই মুসলমান। দেবতাদের বংশধর যদি মুসলমান হয়ে থাকে তবে হিন্দুদের বুকে লাগে।

লাগবার কথাই, অবতারবাদকে আমরা বড় করে নিয়েছি। এখন কষ্ট পেতে হবেই। পাথরের শালগ্রামকে ঘরে এনে পূজা করলেই মাহাত্ম্য বেড়ে যায় কিন্তু এই শালগ্রাম যদি নদীতে অথবা পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকে, তবে ঢিলরূপেও তার ব্যবহার হয় না।

এখানে আসবার পরই এক ভদ্রলোক বললেন, "চলুন আপনাকে ভীমের পদচিহ্ন দেখিয়ে আনি।"

এরূপ পদচিহ্ন দেখায় আমি অভ্যস্ত। চীনারা যখন অভিনয় করে তখন ছোট্ট একটা মানুষ মস্ত বড় এক জোড়া জুতো পায়ে দিয়ে বেশ ভাল করেই অভিনয় করতে সমর্থ হয়। এখানে পাথরের গায়ে যদি কেহ পদচিহ্ন খোদাই করে, তবে আমরা তাকেই বলব এটাই ভীমের পদচিহ্ন। বৌদ্ধযুগে এরূপ অনেক-কিছু তৈরী করেছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা, ভিক্ষুদের তৈরী অনেক-কিছু জিনিস পরবর্তী যুগে হিন্দুরা নিজস্ব করে নিয়েছে, অনেক স্থানেই তা দেখেছি।

তক্ষশীলা, হরপ্পা এবং অন্যান্য স্থানে যে পৌরাণিক দৃশ্য দেখা যায় তা বাস্তবিকই অনুধাবনের যোগ্য। সেই সঙ্গে বাবিলন যোগ করলে আরও ভাল হবে—চোখ খুলে যাবে। যাঁরা একটু উন্নত হয়েছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন আমরা ছিলাম এই, আর হয়েছি এই পর্যন্ত! কাজেই আরও এগিয়ে যেতে হবে, সভ্যতার স্তর আরও উন্নত করতে হবে।

এটাই হল মীমাংসার একমাত্র উপায়। তক্ষশীলা, মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা এবং বাবিলন দেখলে বাস্তবিকই আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। তখনকার সময়েও পাথর খোদাই করার মত অস্ত্র ছিল, আত্মরক্ষা করার মত ধনুর্বিদ্যা জানা ছিল, অথচ লোক ছিল একেবারে আনাড়ী, যাকে বলা হয় অশিক্ষিত।

তক্ষশীলা দেখার পর মনটা হতাশায় ভরে গেল। সেই সঙ্গে আশা হল মানুষ বেশ তাড়াতাড়ি উন্নতি করে যাচ্ছে এবং অদূরভবিষ্যতে এমন উন্নতি করবে যা আমরা কল্পনা করি বটে কিন্তু কার্যকরী এখনও হয়নি।

হরাপ্পা। হরাপ্পার ডাক-বাংলোতে থাকতে ইচ্ছা হল না। কারণ, বৃটিশ-শাসন তখন পূর্ণ উদ্যমে চলছিল এবং এদিকের ডাক-বাংলোগুলি বৃটিশ এবং অন্যান্য শ্বেতকায় বিদেশীরা দখল করে রেখেছিল। এটা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম

যে এখানে কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারলে অবশ্যি ভাল হত; কিন্তু থাকার সেরূপ ব্যবস্থা না থাকায় চলে আসতে বাধ্য হলাম।

হাসান আব্দেল, আটক। ঠিক সন্ধ্যার সময় হাসান আব্দেল পৌঁছি এবং সেখানে একটি শিখের হোটেলে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে আটকের দিকে রওয়ানা হই। আমার জানা ছিল না যে, আটক পর্যন্ত পাঞ্জাবী ভাষাভাষীদের বাসস্থান। বিকালে একজন পাঞ্জাবী মুসলমানের বাড়িতে আশ্রয় পাই।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বলেছিলেন, "এখানেই হিন্দুস্থানের শেষ, আগামী কল্য সকালেই আটক পার হলে পাঠানীস্থানে পৌঁছতে পারবেন। মনে রাখবেন, পাঠানরা আমাদের মত নয়, তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন রকম। হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করাই তাদের কাজ।"

আটক যাবার পথে অনেক প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং কয়েকটা দুর্গ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম এটাই চীন এবং মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত-বিশেষ। ভয়ের কোনও কারণ নাই, নৌসেরাতে পৌঁছে পাঠানের বাড়িতেই থাকা হবে।

নৌসেরা। সকালে যাত্রা করে বেলা ছয়টার সময় নৌসেরা পৌঁছি। এখানে হিন্দু, শিখ এবং মুসলমানের হোটেল রয়েছে। স্থানটাও বেশ সুন্দর। আমাকে একটি শিখ হোটেলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় অন্যত্র না যেয়ে সেইখানেই রাত কাটিয়ে পরের দিন নৌসেরা শহর ও গ্রাম দেখতে বের হলাম। এখানে পাঠানের সংখ্যাই বেশি। প্রায় লোকের কাছেই বন্দুক দেখতে পাওয়া যায়। কথা বললে সকলেই তার জবাব দেয়। কিন্তু কোনও রূপ তর্ক এরা করে না, দরকার হলে হাতের অস্ত্র ব্যবহার করে। সারা দুনিয়ার প্রতি এদের একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই। জানবার আগ্রহ নেই বলেই সম্ভবত এরূপ হয়।

এখানকার পাঠানদের চোখের তারা অনেকেরই নীল এবং মুখাকৃতি নরডিক্। স্ত্রীলোকের মধ্যে পর্দা-প্রথা থাকায় কেহই বাইরে আসেন না। যাঁদের ছেলেরা নরডিক্, তাদের মায়েরা নিশ্চয়ই নরডিক্ হবেন তাতে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে?

দিনটা কাটল ভালই। পরের দিন সকালেই রওয়ানা হবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু জাতে বাঙ্গালী হলে তখনকার দিনে কষ্টের অন্ত ছিল না। তিনজন নূতন লোক এলেন এবং বললেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে যাবেন।

আপত্তি করলাম না কিন্তু তিনি দেরী করলেন অনেকক্ষণ। রওয়ানা হয়ে আর কোথাও দাঁড়ালাম না। টেনে চলতে আরম্ভ করলাম।

সাথীদের এতে কষ্ট হচ্ছিল বটে কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই পৌঁছুব মনস্থ করে এগিয়ে চলছিলাম এবং বিকালেই পেশোয়ারে পৌঁছুতে পেরেছিলাম। এর পরে যা ঘটেছিল, আফগানিস্থান ভ্রমণে বর্ণিত থাকায় তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

সমাপ্ত

• ওরিয়েন্টের জীবন-চরিত ও আত্ম-চরিত মালা •

গান্ধীজি—অনাথনাথ বসু	২.০০
ম্যাকসিমগর্কি—অমল দাশগুপ্ত	১.০০
ডারউইন—অশোক ঘোষ	১.০০
ভক্ত কবির—উপেন্দ্রকুমার দাস	৫.০০
সেক্সপীয়র—ঋষি দাস	৮.০০
বার্ণার্ড শ'—ঋষি দাস	৬.০০
গান্ধী-চরিত—ঋষি দাস	৬.০০
আবুল কালাম আজাদ—ঋষি দাস	৩.০০
ছোটদের নজরুল—ঋষিদাস	১.২৫
লোকমান্য তিলক—ঋষি দাস	২.০০
ছোটদের গিরীশচন্দ্র—ঋষি দাস	২.০০
মেঘনাদ সাহা—কমলেশ রায়	১.০০
ছোটদের বিদ্যাসাগর—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়	০.৬২
ছোটদের শরৎচন্দ্র—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়	০.৭৫
মহাবিজ্ঞানী নিউটন—ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	১.২৫
যাঁদেরলেখা তোমরাপড়—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	২.০০
মাদাম ক্যুরী—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১.০০
মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর—চন্দ্রকান্ত দত্তসরস্বতী	১.২৫
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—চন্দ্রকান্ত দত্তসরস্বতী	১.২৫
মহাকবি মাইকেল—চন্দ্রকান্ত দত্তসরস্বতী	১.২৫
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র—চন্দ্রকান্ত দত্তসরস্বতী	১.২৫
মহারাজ নন্দকুমার—চন্দ্রকান্ত দত্তসরস্বতী	১.২৫
প্রিয়দর্শী অশোক—ধীরেন্দ্রলাল ধর	১.০০
আমাদের গান্ধীজি—ধীরেন্দ্রলাল ধর	১২.০০
গল্পহলেও সত্যি—ধীরেন্দ্রলাল ধর	২.৫০
এই দেশেরই মেয়ে—ধীরেন্দ্রলাল ধর	২.০০
বন্দী-জীবন—ধীরেন্দ্রলাল ধর	২.০০
আমার দেশের মানুষ—ধীরেন্দ্রলাল ধর	২.৭৫
রামমোহন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১.০০
রাষ্ট্রনায়ক চার্চিল—নিখিলরঞ্জন রায়	২.৫০
মানুষের মহিমা—নীলাপদ ভট্টাচার্য	১.৫০

● ওরিয়েণ্টের জীবন-চরিত ও আত্ম-চরিত মালা ●

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক—নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ	২·৫০
নেতাজীর জীবনী ও বাণী—নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ	২·৫০
অঘোর-প্রকাশ—প্রকাশচন্দ্র রায়	৫·০০
জওহরলালের গল্প—প্রভাত বসু	১·২৫
আত্মচরিত—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১২·০০
শ্রীঅরবিন্দের জীবন কথা ও জীবন দর্শন—প্রমদারঞ্জন ঘোষ	১২·০০
দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	১·২৫
শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-বিবেকানন্দ—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	৩·০০
শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	৮·০০
আমাদের জওহরলাল—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	২·৫০
বাংলার প্রতিভা—বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য	১·২৫
সান-ইয়াৎ-সেন—বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১·০০
মহামানব বিবেকানন্দ—ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য	৬·০০
লীলাময় রামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য	৬·০০
শ্রীমা সারদামণি—ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য	৬·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—মনোরঞ্জন গুপ্ত	২·০০
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—মনোরঞ্জন গুপ্ত	২·০০
মহামতি বিদুর—ম. ম. যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ	৩·০০
মৃত্যুকে যে করলো জয়—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
বাংলা সাহিত্যে মনিষা—রণজিৎকুমার সেন	৮·০০
আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু	৫·০০
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ	৬·০০
বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ	৬·০০
মহাত্মা গান্ধী—রোমাঁ রোলাঁ	৩·০০
বিদ্যাসাগর—শঙ্খ ঘোষ	১·০০
কর্মযোগী বিধানচন্দ্র—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী	২·০০
ছোটদের বিবেকানন্দ—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী	২·০০
ছোটদের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সরলানন্দ সেন	১·২৫
ছোটদের সুরেন্দ্রনাথ—সরলানন্দ সেন	১·২৫
ছোটদের রামমোহন—সরলানন্দ সেন	১·২৫
সীমান্ত গান্ধী—সুকুমার রায়	১·২৫